[illegible]

কবিতা

বার্ষিক সূচিপত্র

বর্ষ ২৩ : আশ্বিন, ১৩৬৫—আষাঢ়, ১৩৬৬

কবিতা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
- শিশিরকুমার ভাদুড়ী ... ২৭৫

অমিয় চক্রবর্তী
- বৈরাগ্য বেকার ... ২১
- পৃথিবীতে ... ১৩৯

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়
- প্রতিভাসের মুক্তি ... ১৪৪

অর্চন দাশগুপ্ত
- একটি কবিতা ... ১৪৯
- তবুও কখনো যদি ... ২৭২

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত
- এক-জানালা রাত্রি আমার ... ৫৫
- ডাকটিকিটে বিপিন পালের মুখ ১১৪
- কুয়োতলায় ... ২৩৬
- একটি কথার মৃত্যুবার্ষিকীতে ২৩৭
- মাতৃভূমি ... ২৩৭

আলোক সরকার
- অনিকেত ... ২৩৯
- মন্দার ... ২৩৯
- দেয়াল-ঘড়ি ... ২৪০

কবিতা সিংহ
- না ... ২৪৪

কমলেশ চক্রবর্তী
- নীরব আকাশ ... ২৭১

কিরণশংকর সেনগুপ্ত
- তুই যে অধীর হলি ... ২৫

গোপাল ভৌমিক
- যদি ... ২৩
- একচক্ষু ... ২৬৬

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়
- দোপাটি ... ২৬
- রেখাচিত্র ... ১৪৮

জ্যোতির্ময় দত্ত
- জলের পুরাণ ... ৬১
- একজন ইঁদুরের কাহিনী ... ১৪১

তরুণ সান্যাল
- প্রতিহারীর বিলাপ ... ১২১
- অশ্রু ... ১২২

তারাপদ রায়
- সাইকেল, গাধা ও ধোপার কাহিনী ... ১১৫
- গোরস্থান ... ১১৫
- ঈশ্বরের নিকট নিবেদন ... ২৪৫
- শোকসংবাদ ... ২৪৫

দীপক মজুমদার
- সংসারী বৌদ্ধ ... ১৩৮

নবনীতা দেব
- আদি-অন্ত ... ৬৪
- আরোগ্য ... ৬৪
- পূর্ণিমা ... ১৮১

পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য
- তোমার বাতাস ... ৫৬
- একটি আবিষ্কার ... ৫৬
- কোনো ভীরুর ভাবনা ... ২৫৯
- দুপুরে ... ২৬০

প্রণব চট্টোপাধ্যায়
- শববাহী ... ২৬৩

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত
- একটি ভবিষ্যৎবাণী ... ৩২

রূপক ... ৩২
কোনো দার্শনিক কবিকে ... ১১৬
সম্পর্ক ... ১১৬
অপেক্ষা ... ১১৭
পনেরো বছর পরের জন্য ... ১৫৩
একটি স্বপ্নের জন্য ... ২৪৯
ঘরে ফেরার পর: একটি স্বপ্ন ২৫০

প্রভাকর সেন
সংশয় ... ৮৯

বংশীধারী দাস
সরল বৃত্তে ... ১৭০
মোমবাতি ... ১৭০

বিকাশ দাশ
দিল্লির উপকণ্ঠের একটি দুপুর ২৪৭

বিষ্ণু দে
এ আর ও ... ৭৫

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত
এখন দুপুরবেলা ... ১৭২
স্মৃতির আলোয় ... ১৭৪
বিপুল ধ্বংসের দিকে ... ১৭৬

মণিভূষণ ভট্টাচার্য
উদ্ভাসিত জন্ম: অনিন্দিত মৃত্যু ৫৯
নায়িকা-কে ... ১৬৭
দ্বৈতভাষণ ... ২৫২
অসামাজিক ... ২৫৩

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
পেঁচিয়ে, ধোঁয়ার মতো ... ৩৪
স্বপ্নেরও ভিতরে ... ১৩৭
'O my luve's like a red, red rose !' ... ১৭৮
তাহ'লে, দয়ার ছলে ... ১৭৮
আদি দ্বন্দ্ব ... ১৭৯
সারা রাত তুমি ... ১৮০

মোহিত চট্টোপাধ্যায়
প্রেম, পুনর্বার ... ৮৮
শায়িত বিষাদ ... ২৬৮
নীল পাখি ... ২৬৮
মুখের বর্ণনা ... ২৬৯

রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী
নগরী ... ৬৬
অস্থির ... ১৬৪
রোমান্টিক ... ১৬৫
সূর্যাস্ত ... ২৫৫
স্বাতী তারা ... ২৫৫
ফিরে আসি ... ২৫৬

শক্তি চট্টোপাধ্যায়
অন্তর্পঞ্জী ... ৩১
আলেখ্য ... ১৫০
প্রভাত ... ১৫০
দেবদূত ... ১৫১

শান্তিকুমার ঘোষ
পাখি ডালে বসলে প্রথম ... ৩৫
ছায়া ... ১৪৩

শামসুর রহমান
সেই ঘোড়াটা ... ২৮
পিতা ... ২৫৭

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
শিল্পী ... ৯০
ওরা ... ২৫৮

সলিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
কয়েকটি ট্রিওলেট ... ১৬৮

সুভাষকুমার মিত্র
বিরহ ... ৩০

অনুবাদ-কবিতা

আর্তুর র‍্যাঁবো
(অনুবাদ: শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়)
১. ভোর ... ২৪২
২. রাজেন্দ্রাণী ... ২৪২
৩. বিদায় ... ২৪৩
৪. অধস্তন ... ২৪৩

বরিস পাস্টেরনাক
(অনুবাদ: বুদ্ধদেব বসু)
১. শাদা রাত্রি ... ৪
২. জবাবদিহি ... ৬
৩. প্রত্যুষ ... ৮
৪. বিচ্ছেদ ... ১০
৫. মিলন ... ১২
৬. হেমন্ত ... ১৪
৭. একটি রূপকথা ... ১৫

পোল এলুয়ার
(অনুবাদ: গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়)
১. দৃষ্টান্ত ... ২৬১
২. শান্তির বৃত্ত ... ২৬১
৩. দেহ ... ২৬২

সফোক্লেসের আন্তিগোনে ৩৮-৪৪, ৯১-১১৩
(অনুবাদ: অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত)

স্তেফান মালার্মে
(অনুবাদ: প্রণব চট্টোপাধ্যায়)
১. তোমার গল্পে প্রবেশাধিকার পাওয়া ... ১১৯
২. সে এক অলকগুচ্ছ ... ১২০

প্রবন্ধ

বুদ্ধদেব বসু
শার্ল বোদলেয়ার ও আধুনিক কবিতা ১৮২, ২১১
শিশিরকুমার ভাদুড়ী ... ২৭৬

নরেশ গুহ
আধুনিক বাংলা কবিতা ... ৭৭

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত
উনগারেত্তির কবিতা ... ১২৩

চিঠিপত্র

অমিয় চক্রবর্তী
পাস্টেরনাক-এর প্রসঙ্গে ১২৯, ২১৯

বুদ্ধদেব বসু
পাস্টেরনাক প্রসঙ্গে ... ২২৩

সমালোচনা

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
বাংলা সনেট ('সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ') ... ৬৭

রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী
'যে-আঁধার আলোর অধিক' ... ১৫৫

কবিতা

আশ্বিন ১৩৬৫

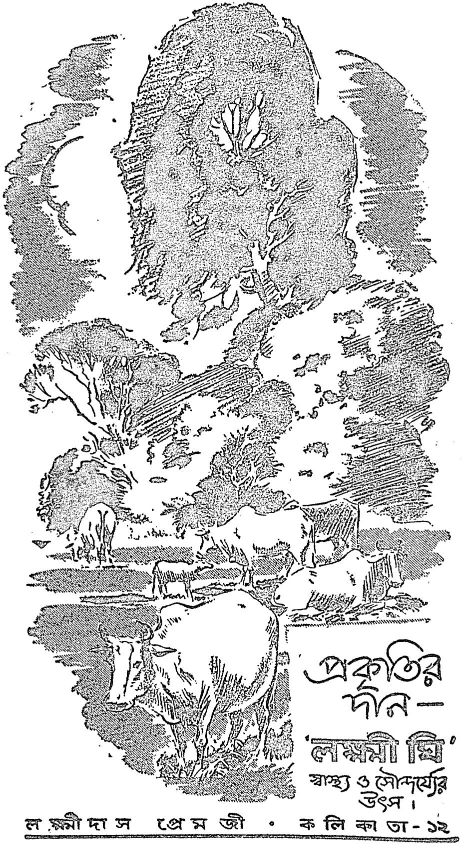

কবিতা

আশ্বিন, ১৩৬৫

— এই সংখ্যায় —

বরিস পাস্‌টেরনাক-এর
সাতটি কবিতা
অনুবাদ করেছেন
বুদ্ধদেব বসু

—

সফোক্লেসের আন্তিগোনে
অনুবাদ : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

—

অমিয় চক্রবর্তী, গোপাল ভৌমিক, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, শামসুর রাহমান, সুভাষকুমার মিত্র, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিকুমার ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, পূর্ণেন্দু-বিকাশ ভট্টাচার্য, মণিভূষণ ভট্টাচার্য, জ্যোতির্ময় দত্ত, নবনীতা দেব, রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী

—

সমালোচনা

বাংলা সনেট — মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কয়েকখানি দরকারী বই

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
(সংক্ষিপ্তসার) দাম এক টাকা

দ্বিতীয় বার্ষিক পরিকল্পনা
(সংক্ষিপ্ত বিবরণী) দাম ছয় আনা

॥ ছোটদের জন্য ॥

দেশ-বিদেশের উপকথা
মনোজিৎ বসু
দাম : এক টাকা

যারা দেখাল নতুন আলো
॥ হরিপ্রসাদ সেনগুপ্ত ॥

গুঞ্জন
॥ দীপ্তি সেনগুপ্তা ॥

ছুটির দিনের কবিতা
॥ দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

তেল-নুন-কড়ি
॥ শ্যামাপ্রসাদ আচার্য ॥

চলার পথে
॥ বাদলরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ॥

ভারত আমার
॥ সতীকুমার নাগ ॥

প্রতিটি বই সচিত্র এবং দাম চার আনা

আমাদের পতাকা
দাম : পঞ্চাশ নয়া পয়সা

পাব্‌লিকেশনস্‌ সেলস্‌ অফিস, নিউ সেক্রেটারিয়েট
১, হেষ্টিংস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

বুদ্ধদেব বসুর নতুন কাব্যগ্রন্থ

যে-আঁধার আলোর অধিক

আধুনিক বাংলা কবিতার রাজ্যে বুদ্ধদেব বসু নিঃসংশয়ে বিচিত্র ঐশ্বর্যের অধিকারী। সীমাধর্মে দীক্ষিত নন ব'লেই তিনি জীবনের নতুন দিক্‌দর্শনে ও নতুনতর সম্ভাবনার আলোকে আস্থাবান। 'যে-আঁধার আলোর অধিক' তাঁর সাম্প্রতিকতম কবিতাসমূহের মনোজ্ঞ সংকলন। দাম—২'৫০ টাকা

বিষ্ণু দে-র নতুন কাব্যগ্রন্থ

আলেখ্য

বিষ্ণু দে ঐতিহ্য ও আধুনিক জীবনের সংকটমুক্তির সূত্রসন্ধানী কবি। কখনো সূক্ষ্ম পরীক্ষানিরীক্ষায়, কখনো বা সাবলীল শিল্পকৌশলের বিচিত্র প্রয়োগ-পদ্ধতিতে তাঁর কবিকর্ম এক আশ্চর্য সংহতি লাভ করেছে—সদ্যপ্রকাশিত 'আলেখ্য' কাব্যগ্রন্থখানি তার উজ্জ্বল নিদর্শন। দাম—২'৫০ টাকা

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট : কলিকাতা : ১২

কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র
অনূদিত

হুইটম্যানের শ্রেষ্ঠ কবিতা

গদ্য-কবিতার প্রবর্তক ও আধুনিক কাব্যের ত্রাণকর্তা মহাকবি হুইট-ম্যানের শ্রেষ্ঠ কবিতার অনুবাদ করেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র।
সামনের ছবি সত্যজিৎ রায়ের।

দীপায়ন
প্রকাশনা ভবন
২৮/সি মহিম হালদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-২৬

প্রকাশিত হল

বহু অপ্রকাশিত রবীন্দ্রসংগীত-স্বরলিপির সংকলন

স্বরবিতান

৫৬তম খণ্ড

মূল্য ৩'০০ টাকা

॥ এই খণ্ডে মুদ্রিত ॥

আনন্দগান উঠুক তবে বাজি
আমি তারেই জানি
এখনো কেন সময় নাহি হল
এবার বুঝি ভোলার বেলা হল
এসো এসো ওগো শ্যামছায়াঘন
ওগো জলের রানী
ওগো, তোমার চক্ষু দিয়ে মেলে
কত কাল রবে বল
কমলবনের মধুপরাজি
কী জানি কী ভেবেছ মনে
চলেছে ছুটিয়া পলাতকা হিয়া
তুমি খুশি থাক আমার পানে
তোরা যে যা বলিস ভাই
দিনের বেলায় বাঁশি তোমার
নয়ন ছেড়ে গেলে চলে
পথের শেষ কোথায়
পাছে চেয়ে বসে আমার মন
বড়ো থাকি কাছাকাছি
ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা
ভালোবেসে সখী, নিভৃতে যতনে
মনোমন্দির সুন্দরী
রাজরাজেন্দ্র জয়তু জয় হে
স্বর্গে তোমায় নিয়ে যাবে উড়িয়ে
স্বপনপারের ডাক শুনেছি
হে আকাশবিহারী নীরদবাহন জল
হে মহাদুঃখ, হে রুদ্র ইত্যাদি

এ পর্যন্ত মোট ৫৬টি খণ্ড প্রকাশিত।
একত্রে মূল্য ১৭৩'৫০ নয়া পয়সা।
পত্র লিখিলে পূর্ণ বিবরণ পাঠানো হয়।

বিশ্বভারতী
৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

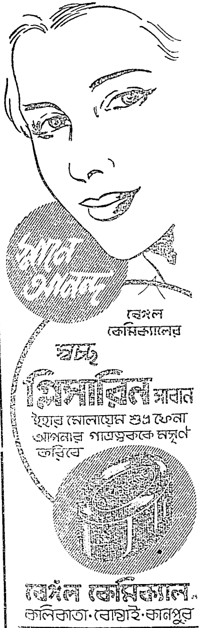

Books on Art :

INDIAN TEMPLE SCULPTURE
With an Introduction
by
Jawaharlal Nehru,
Text by
K. M. Munshi
140 Plates.
Rs. 36.00 net.

—

THE ART OF THE CHANDELAS
Text with Descriptions
by
O. C. Gangoly
60 Plates
Rs. 32.00 net.

—

THE ART OF THE PALLAVAS
Text and Descriptive Notes
by
O. C. Gangoly
46 Plates.
Rs. 32.00 net.

—

RUPA & CO.
15, Bankim Chatterjee St., Calcutta-12.

107, South Malaka, Allahabad-1
11, Oak Lane, Fort, Bombay-1

কবিতা

বর্ষ ২১

ও

বর্ষ ২২-এর

সম্পূর্ণ সেট

পাওয়া যাচ্ছে।

বহু মূল্যবান কবিতা

অনুবাদ-কবিতা

ও

প্রবন্ধের সঞ্চয়ন।

প্রতি সেট পাঁচ টাকা

মাশুল স্বতন্ত্র

কবিতা

ত্রৈমাসিক পত্র

আশ্বিন, পৌষ, চৈত্র ও আষাঢ়ে প্রকাশিত। * আশ্বিনে বর্ষারম্ভ, বৎসরের প্রথম সংখ্যা থেকে গ্রাহক হ'তে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যা এক টাকা, বার্ষিক চার টাকা, রেজিস্টার্ড ডাকে ছয় টাকা, ভি. পি. স্বতন্ত্র। * ষাণ্মাসিক গ্রাহক করা হয় না। * চিঠিপত্রে গ্রাহক-নম্বরের উল্লেখ আবশ্যিক। * ঠিকানা-পরিবর্তনের খবর দয়া ক'রে সঙ্গে-সঙ্গে জানাবেন, নয়তো অপ্রাপ্ত সংখ্যা পুনরায় পাঠাতে আমরা বাধ্য থাকবো না। অল্প সময়ের জন্য হ'লে স্থানীয় ডাকঘরে ব্যবস্থা করাই বাঞ্ছনীয়। * অমনোনীত রচনা ফেরৎ পেতে হ'লে যথাযোগ্য স্ট্যাম্পসমেত ঠিকানা-লেখা খাম পাঠাতে হয়। প্রেরিত রচনার প্রতিলিপি নিজের কাছে সর্বদা রাখবেন, পাণ্ডুলিপি ডাকে কিংবা দৈবাৎ হারিয়ে গেলে আমরা দায়ী থাকবো না। * সমস্ত চিঠিপত্রাদি পাঠাবার ঠিকানা:

কবিতাভবন
২০২ রাসবিহারী এভিনিউ
কলকাতা ২৯

কবিতা

আশ্বিন, ১৩৬৫
বর্ষ ২৩, সংখ্যা ১
ক্রমিক সংখ্যা ৯৫

জিভাগোর কবিতা

বরিস পাস্‌টেরনাক

[চ'লে আসছি, এমন সময় দোকানি বললেন, ' "ডক্টর জিভাগো" এসেছে; নেবেন একখানা?' আর তখন আমার মনে পড়লো যে এই বইখানার জন্যেই আজ বেরিয়েছিলুম।

বাড়ি এসে প্রথমেই কবিতাগুলো পড়লাম, তিনটি বা চারটি, অন্যগুলোর উপর দৃষ্টিপাত করলাম, তারপর আর পড়লাম না। যথেষ্ট; একবারের মতো এই যথেষ্ট, এ-ক'টিই যথেষ্ট। একসঙ্গে বেশি নেয়া যায় না, মনের উপর কবিতা যে-কাজ করবে তার জন্য সময় দিতে হয়।

আমার মনে কথা জাগলো: 'আশ্চর্য!' 'কী চাপা আর কী গভীর!' 'কোথাও-কোথাও রিলকের মতো নয় কি?' 'যেন চীনে কবিতার আদল আসে।'—তাহ'লে এক নতুন কবির সংস্পর্শ, আবার, কতকাল পরে। তাহ'লে আবার য়োরোপ থেকে কবিতা এলো।

হাল আমলের পশ্চিমী কবিতা আধুনিক হবার চেষ্টায় কবিতা হ'তে পারছে না। অন্তত, তার অধিকাংশই এই রকম। সাঁ-জন পের্স বা খিমানেৎ-এর মতো প্রবীণ ও প্রখ্যাত নামগুলির সামনে আমি শিক্ষার্থীর মতো দাঁড়াতে পেরেছি, কিন্তু তাঁদের মধ্যে বিগলিত হ'তে পারিনি। ফ্রান্স, ইংলণ্ড বা আমেরিকা থেকে আর যা পাওয়া যাচ্ছে, তার সবচেয়ে উঁচুতে আছে অডেনের নৈপুণ্য, আর তলার দিকে কলে-ছাঁটাই দোকানের-জানলার ঝকঝকানি। এর আগে পাস্টেরনাকের অন্য যে-ক'টি কবিতা পড়েছিলাম তা থেকে তাঁকে মনে হয়েছিলো আধুনিকতার লক্ষণসম্পন্ন একজন 'ভালো' কবি, অন্য যে-কোনো

একজন 'ভালো' কবিরই মতো; কিন্তু 'ডক্টর জিভাগোর কবিতাগুচ্ছে' তিনি প্রমাণ করেছেন যে তিনি আমাদের হৃৎস্পন্দনে এমন বেগ আনতে পারেন যাতে আমরা 'প্রশংসা' করতে ভুলে যাই; যে তিনি তাঁদেরই একজন, যাঁদের আমরা আমাদের মনের অকথ্য গোপনতার অংশ দিতে প্রস্তুত। প্রমাণ করেছেন যে তার বাঁচা সার্থক হয়েছে, সার্থক হয়েছে তাঁর দুঃখ পাওয়া আর প্রায় সত্তর বছর বয়স।

আশ্চর্য এই কবিতাগুলির সরলতা, যা, বুঝতে আমাদের একটুও দেরি হয় না, অনেক ত্যাগ ও তপস্যার দ্বারা তিনি অর্জন করেছেন। আধুনিক কবিতার চরিত্রই এই যে সে যেটুকু বলে তার চেয়ে অনেক বেশি তার বলবার থাকে। সেইজন্যই তা ঘন ও তীব্র হ'তে পেরেছে, আর সেইজন্যই তাকে দুর্বোধ হ'তে হ'লো। এই বাদ দেবার জেদেই উনগারেত্তির কবিতা এক পংক্তিতে সমাপ্ত হয়, একজন এলিয়ট আশা করেন যে পাঠকমাত্রেই পণ্ডিত হবে। কিন্তু কখনো-কখনো আমরা কে না আকাঙ্ক্ষা করেছি এমন কবিতা যাতে যথাসম্ভব সবই বাদ গেছে, অথচ যাকে পাবার জন্য পণ্ডিত হ'তে হয় না, জানতে হয় না নৃতত্ত্ব ও বৌদ্ধধর্ম, বা কবির ব্যক্তিগত জীবনী? কী দুরূহ এই সমন্বয় তা আমরা তখনই বুঝি, যখন দেখতে পাই আধুনিক কবিতায় তার উদাহরণ কত বিরল। জিভাগোর কবিতায়, আমি বলতে চাই, পাস্টেরনাক এই অসাধ্যসাধন করেছেন।

এই যে কথাগুলো লিখছি, এগুলো এক 'সরল' পাঠকের অভিজ্ঞতার বিবরণ। পাস্টেরনাক-এর জীবনী বিষয়ে অল্পই জানি আমি। তাঁর পূর্ব-রচনাও বেশি পড়িনি। প্রথম যখন বোদলেয়ার বা রিলকে পড়েছিলাম তাঁদের বিষয়েও অজ্ঞ ছিলুম। কিন্তু কবিতাগুলো যেন কাগজ থেকে লাফিয়ে উঠে মুখের উপর মারলে আমাকে। এবারেও তা-ই হ'লো। জানি, আনুষঙ্গিক তথ্য জানলে পরতে-পরতে আরো অর্থ বেরিয়ে আসবে, কিন্তু এই প্রথম অভিঘাতটাই আসল। কবিতার বিষয়েই কথা হচ্ছে এখানে, কবির নয়। কবির জাতি, দেশ, ধর্ম, এমনকি তাঁর নাম পর্যন্ত যদি নাও জানি, তাতে কি

কবিতার কিছু এসে যায়? এমনকি, উল্টোটাও সম্ভব হ'তে পারে; 'নাইটিঙ্গেল' ও 'গ্রীশিয়ান আর্ন'-এর আরক্ত ও আতুর রসভার থেকে কোনো পাঠক হয়তো অনুমান করতে পারবেন যে লেখক একজন প্রেমে-পড়া প্রতিভাবান যুবা, যার মৃত্যু আসন্ন। তেমনি, জিভাগোর কবিতা যিনি লিখেছেন তিনি যে একজন মহাভক্ত ও মহাপ্রেমিক, আর অনেক বয়স অবধি বেঁচে থেকে তিনি যে অনেক দুঃখ পেয়েছেন, তা আর কাউকে ব'লে দিতে হয় না।

আর-একটি বিস্ময় এই যে পঁচিশটি কবিতার মধ্যে অন্তত সাতটি আছে সরাসরি প্রেমের কবিতা, যা বর্তমান শতকে ইএটস ছাড়া আর-কোনো পাশ্চাত্য কবি লেখেননি। স্ত্রী-পুরুষের পার্থিব ভালোবাসা, যার উচ্চারণ উনিশ শতকে বোদলেয়ার পর্যন্ত অকুণ্ঠিত, আধুনিক কাব্যে তা সাধারণত পটভূমিকার কাজ করে; সেটা আর প্রধান নেই, সমগ্রভাবে জীবন তাকে ছাপিয়ে উঠেছে। উত্তরজীবনে ইএটসকেও ঋজুকথন ত্যাগ করতে হ'লো। এর ফলে কবিতা সমৃদ্ধ হয়েছে সন্দেহ নেই, আর আমরা তিন দশক ধ'রে এতেই অভ্যস্ত হয়েছিলাম। প্রায় ধ'রেই নিয়েছিলাম যে এই আত্মসচেতন যুগে চাতুরী ভিন্ন প্রেমের কথা বলা যাবে না। পাস্টেরনাক আমাদের সেই ভুলও ভাঙালেন। অন্য কবিরা জীবনের অন্যান্য অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রেমকে বুনে দেন, পাস্টেরনাক প্রেমের সূত্রেই অন্য সব অভিজ্ঞতাকে গেঁথেছেন। বরফ-চিবোনো আধ-পাগলা মেয়ে, আঙুলে-ফুটে-যাওয়া শেলাইয়ের ছুঁচ, পিটার্স-বার্গের জানলা থেকে দেখা শাদা রাত্রি—এই সব সহজ ও বাস্তব তথ্যের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত সহজে তিনি আমাদের শুনিয়ে দিলেন নক্ষত্রের গান, দেবদূতের বন্দনা। নারীর 'পিঠ, কাঁধ, গ্রীবা'কে চিরন্তন ভক্তির পাত্র ক'রে তুলে মানুষের মর্যাদা ফিরিয়ে দিলেন। এই বৃদ্ধের হাত থেকে, কয়েক মুহূর্তের জন্য, আমাদের হারানো যৌবন আমরা ফিরে পেলাম।

ছয়টি প্রেমের কবিতা অনুবাদ করেছি, আর একটি পরাক্রান্ত 'রূপকথা'। রূপকথাটি ছন্দে মিলে সম্পূর্ণ, অন্যগুলি গদ্য অনুবাদ। আমি যতদূর জানি, পাস্টেরনাক ছন্দে ভিন্ন লেখেন না, তাঁর মিলের অসামান্যতার খ্যাতিও শুনেছি।

কিন্তু সামনে পেয়েছি ইংরেজি অনুবাদ, তাতে ('রূপকথা'টিতে ছাড়া) ছন্দ মিল কিছুই নেই; মিলের বিন্যাস বিষয়েও ইংরেজি অনুবাদক কোনো ইঙ্গিত দেননি। রুশ ভাষা এক বর্ণ জানি না, মূলের ধ্বনি বা শব্দের দ্যোতনা বিষয়ে কিছুই ধারণা নেই। তবু, আমি যেমন মোটামুটি ইংরেজি অনুবাদ থেকেও অনেক-কিছু পেয়েছি, তেমনি কোনো-কোনো সংবেদনশীল পাঠক হয়তো এই চলনসই বাংলা থেকেও পাবেন। কবিতায় সারবস্তু যত বেশি থাকে, ততই অনুবাদ তাকে কম জখম করতে পারে।—বু. ব.]

শাদা রাত্রি

দেখছি দূর অতীত
পিটার্সবার্গে নদীর ধারে একটি বাড়ি।
স্টেপির এক তালুকদারের কন্যা
তোমাকে আসতে হ'লো কুর্স্ক্ থেকে ছাত্রী হ'তে।

সুন্দরী ছিলে, যুবকদের প্রিয়
সেই শাদা রাত্রি ভ'রে আমরা দু-জন
ব'সে ছিলুম তোমার জানলার পাটাতনে
স্কাইস্ক্রেপারের চুড়ো থেকে তাকিয়ে-তাকিয়ে।

গ্যাসের প্রজাপতির মতো রাস্তার বাতিগুলো
উষায় স্পৃষ্ট, কেঁপে উঠলো।
ঐ ঘুমন্ত দূরের মতো মৃদু
আমার কথা, তোমাকে।

আর আমরা, ভীরু নিষ্ঠায়,
বাঁধা ছিলুম এক রহস্যে,
তীরহীন নেভা ছাড়িয়ে বিস্তীর্ণ
পিটার্সবার্গ শহরটার মতো।

বাইরে, বহু দূরে, ঘন অরণ্যে,
বসন্তের সেই শাদা রাত্রিটিতে
নাইটিঙ্গেলেরা পূর্ণ ক'রে দিলো কানন
তাদের বন্দনার বজ্রনাদে।

পাগল তান গড়িয়ে চলে অবিরাম,
ছোটো, নগণ্য সেই পাখির কণ্ঠ
জাগিয়ে দিলে পুলকের চঞ্চলতা
মন্ত্রমুগ্ধ অরণ্যের গভীরে।

গুড়ি মেরে সেখানে এলো রাত্রি,
খোলা-পায়ের বাউণ্ডুলের মতো জড়িয়ে ধরলো বেড়াগুলোকে,
তার পিছনে, জানলার পাটাতন থেকে,
ঝুলে রইলো ধোঁয়ার মতো আমাদের কথাবার্তা।

প্রতিধ্বনির নাগালের মধ্যে
বেড়া-দেয়া বাগানে
আপেলের ডাল, চেরিগাছের ডাল
সাজ প'রে নিলো শুভ্র মঞ্জরী।

আর প্রেতের মতো শাদা, গাছগুলি
ভিড় ক'রে রইলো রাস্তায়
যেন হাত নেড়ে বিদায় দিচ্ছে
সেই শাদা রাত্রিকে, যে বড্ড বেশি দেখে ফেলেছিলো।

জবাবদিহি

যেমন একদিন অদ্ভুতভাবে বাধা পেয়েছিলো
তেমনি অকারণে ফিরে এলো জীবন।
আমি আছি সেই পুরোনো চালের রাস্তাতেই,
যেমন ছিলুম সেই গ্রীষ্মের দিনে, সেই মুহূর্তে।

একই লোকেরা, একই দুশ্চিন্তা।
সেই যেদিন মরণসন্ধ্যা ব্যস্ত হ'য়ে
সূর্যাস্তকে পেরেক ঠুকে ঝুলিয়ে দিলে পার্কের* দেয়ালে
তার পর থেকে সূর্যাস্তের তাপও তো জুড়োলো না।

শস্তা ডোরা-কাটা সুতির কাপড়ে
মেয়েরা এখনো জুতো ক্ষইয়ে ফ্যালে রাত্রে,
চিলেকোঠায়, লোহার ছাতের উপর
ক্রুশবিদ্ধ হয় তেমনি।

* Manege Square: বিপ্লবকালে খণ্ড যুদ্ধের ঘটনাস্থল।

এখানে একজন ক্লান্ত পা ফ্যালে
চৌকাঠে, বাইরে ;
আস্তে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসে
তয়খানা থেকে, উঠোন পেরিয়ে।

আবার আমি ছুতোনাতা তৈরি রাখি
আবার উদাসীন হ'য়ে যাই সব-কিছুতে।
আরো একবার আমাদের প্রতিবেশিনী
রাস্তায় ঘুরে, একা থাকতে দেয় আমাদের।

*　　　*

কেঁদো না, ফোলা ঠোঁট দুটি উল্টিয়ে
গুটিয়ে নিয়ো না ভাঁজ ফেলে ;
জানো না, বসন্তের জ্বর জন্ম দিয়েছে এই শুষ্কতাকে,
তুমি কাঁদলে তা ফেটে যাবে।

হাত সরিয়ে নাও আমার বুক থেকে।
আমরা যে অতিবৈদ্যুতিক তার।
সাবধান, নয়তো আচমকা
আবার দু-জনে জড়িয়ে যাবো একসঙ্গে।

কাটবে বছরের পর বছর, তুমি বিয়ে করবে।
ভুলে যাবে এই অস্থির অবস্থা।
নারী হওয়া মস্ত বড়ো ব্যাপার,
অন্যদের পাগল ক'রে দেয়ার নামই বীরত্ব।

আর আমি—আমার জন্য রইলো
শ্রদ্ধা, এক আজীবন সেবকের ভক্তি,
যার লক্ষ্য সেই মহাবিস্ময়, নারীর হাত দু-খানি,
তার পিঠ, কাঁধ, গ্রীবা।

এই রাত্রি আমাকে এঁটে দিক
যত না দুঃখের বলয়ের পর বলয়ে,
উল্টো দিকের টান আরো জোরালো
ভেঙে বেরোবার ইচ্ছেটাই আসল।

প্রত্যুষ

আমার নিয়তির সর্বস্ব ছিলে তুমি।
তারপর এলো যুদ্ধ, সর্বনাশ।
অনেক, অনেক দিন হ'য়ে গেলো
কোনো চিহ্ন নেই, খবর নেই তোমার।

এতকাল পরে
আবার তোমার কণ্ঠস্বরে আমি চঞ্চল।
সারা রাত ধ'রে পড়েছি আমি তোমাকে।
এ যেন এক মূর্চ্ছা থেকে জেগে ওঠা।

লোকজনের সংসর্গ চাই আমি,
যেতে চাই ভিড়ের মধ্যে, সকালের ব্যস্ততায়।
মনে হয়, টুকরো ক'রে ভেঙে দিতে পারি সব-কিছু,
পারি ওদের ক্ষমা চাওয়াতে।

দৌড়ে নামি সিঁড়ি দিয়ে
এই যেন প্রথম
বেরোচ্ছি তুষারে ঢাকা রাস্তায়
যার দুই দিকে ফুটপাত জনশূন্য।

চারদিকে আলো, গার্হস্থ্য, লোকেরা উঠে পড়ছে,
চা খাচ্ছে, ছুটছে ট্র্যাম ধরতে।
কয়েকটি মিনিটের ব্যবধানে
শহরকে আর চেনা যায় না।

ফটকে ঘন হ'য়ে তুষার জমলো
আর তার উপর ব্লিজার্ড বুনে চলেছে জাল।
ওদের সবারই তাড়াহুড়ো সময়মতো পৌঁছবে ব'লে,
অর্ধেক খাবার রইলো প'ড়ে, চা শেষ হ'লো না।

ওদের প্রত্যেকের জন্য আমার দরদ
যেন ওদের চামড়া আমারও,
গলমান বরফের সঙ্গে আমিও গ'লে যাই,
ভোরের সঙ্গে কুঁচকে তুলি ভুরু।

আছে আমার মধ্যে নামহীন লোকেরা,
শিশুরা, কুনোরা, গাছপালা।
ওরা সবাই জয় ক'রে নিয়েছে আমাকে,
আর এই আমার একমাত্র বিজয়।

বিচ্ছেদ

চৌকাঠ থেকে সে উঁকি দিলে ভিতরে,
চিনতে পারলে না নিজের বাড়ি।
সেই মেয়েটির বিদায় ছিলো উড়ে যাওয়ার মতো।
চারদিকে ধ্বংসের চিহ্ন ছড়ানো।

সব ঘর লণ্ডভণ্ড;
চোখের জল আর মাথা ধরায় মিলে
তাকে দেখতে দেয় না
নিজের সর্বনাশের পরিমাণ।

সকাল থেকে একটা গর্জন চলেছে তার কানের মধ্যে।
জেগে আছে? না, স্বপ্ন দেখছে?
কেন বার-বার সমুদ্র
ঠেলে চ'লে আসে তার মনের ভাবনায়?

মেয়েটি তার প্রিয় ছিলো, আপন ছিলো
অঙ্গে-অঙ্গে
যেমন তটরেখা সমুদ্রের ঘনিষ্ঠ
তরঙ্গে-তরঙ্গে।

যেমন ঝড়ের পরে
ঢেউ উঠে প্লাবিত করে বেণুবন
তেমনি তার হৃদয়ে
মগ্ন সেই নারীর প্রতিমা।

সংকটময় কালে
জীবন যখন অচিন্ত্য,
সমুদ্রের তলদেশ থেকে নিয়তির জোয়ারে
ভেসে এসেছিলো তার কাছে এই নারী।

অসংখ্য ছিলো বাধা।
কিন্তু, জোয়ারের টানে
কোনোমতে ফাঁড়া কাটিয়ে
সে তীরে এসে ঠেকেছিলো।

এখন সে চ'লে গেছে;
হয়তো যেতে চায়নি।
এই বিচ্ছেদ গ্রাস ক'রে নেবে তাদের,
কষ্ট কুরে-কুরে খাবে, হাড়গোড়সুদ্ধ।

লোকটি তাকালো তার চারদিকে।
যাবার মুখে
সব উল্টেপাল্টে দিয়েছিলো সে,
দেরাজ টেনে ছুঁড়ে ফেলেছিলো সব।

সন্ধ্যা অবধি ঘুরে-ঘুরে
দেরাজগুলোয় তুলে রাখে
ছিটিয়ে-পড়া কাটা কাপড়
আর ছিটের নকশা;

তারপর, এক টুকরো শেলাইয়ে বেঁধা ছুঁচে
তার আঙুল যখন ফুটে গেলো,
হঠাৎ তাকে দেখতে পেয়ে
নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলো।

মিলন

যখন ভারি হ'য়ে তুষার পড়ে ছাতের উপর
আর রাস্তাগুলিকে ঢেকে দেয়,
আমি বেরিয়ে পড়ি পা দুটোকে টান করতে, আর তোমাকে
একবার দেখবো ব'লে।

দরজার ধারে দাঁড়িয়ে আছো, একা,
গায়ে পাৎলা কোট, টুপি নেই, রবারের জুতোটাও নেই,
চিবোচ্ছো এক মুঠো তুষার
শান্ত হবার চেষ্টায়।

গাছগুলি, বেড়াগুলি
মিলিয়ে যায় অন্ধকার দূরে।
বরফের বৃষ্টির মধ্যে, একা,
তুমি এক কোণে দাঁড়িয়ে আছো।

মাথার রুমাল থেকে জল নেমে আসে,'
চুঁইয়ে পড়ে জামার হাতায়,
চিকচিক করে তোমার চুলে
শিশিরের মতো।

একটি উজ্জ্বল অলকে
আলো হ'য়ে ওঠে
তোমার মুখ, মাথার রুমাল,
তোমার ছেঁড়া কোট আর তোমার দেহের গড়ন।

চোখের পলক বরফে ভিজে গেলো,
আছে দুঃখ তোমার দৃষ্টিতে।
অ্যাসিডে ডোবানো ছেনিতে
তুমি আছো আমার হৃদয়ে ক্ষোদিত।

আর তোমার মুখশ্রীর অদ্ভুত বিনয়
রইবে আমার হৃদয়ে চিরকাল,
এই পৃথিবীর হৃদয়হীনতায়
আর আমার এসে যায় না।

আর এইজন্যেই তুষারময় রাত্রি
মিলিয়ে দিলো নিজের দুই প্রান্ত,
তোমার আর আমার মধ্যে সীমান্তরেখা
আমি টানতে পারি না।

কিন্তু আমরা কে? কোথা থেকে এলাম?
—দেখছো না, এই সব বছরগুলির
বাকি আছে শুধু বাজে গুজব,
আর আমরা এই পৃথিবীর কোনোখানেই নেই।

হেমন্ত

আমার স্ত্রীপুত্রকে ছড়িয়ে যেতে দিয়েছি আমি,
প্রিয়জন সব বিচ্ছিন্ন।
এক জীবনব্যাপী নিঃসঙ্গতায়
ভ'রে আছে প্রকৃতি আর আমার হৃদয়।

আর এখানে আমি তোমার সঙ্গে, ছোট্ট কুঠুরিতে
বাইরে, মরুর মতো জনহীন অরণ্য।
যেমন সেই গানে, তেমনি সব রাস্তাঘাট
আগাছায় প্রায় ছেয়ে গেলো।

দেয়ালের তক্তাগুলি বিষণ্ণ
আমাদের দু-জনকে ছাড়া আর-কিছু দেখতে পায় না ব'লে।
কিন্তু আমরা তো কখনো ভাবিনি যে টপকে যাবো বাধা।
সাধু হবে আমাদের মৃত্যু।

একটায় টেবিলে খেতে বসবো দু-জনে, উঠবো তিনটে বাজলে,
আমার হাতে বই, তুমি তুলে নেবে শেলাই।
ভোরবেলা মনে আনতে পারবে না
কখন আমরা চুমো খাওয়া থামিয়েছিলুম।

পল্লব, তোলো মর্মরধ্বনি, ছিটিয়ে দাও নিজেদের
আরো, আরো বেপরোয়া, আরো, আরো উজ্জ্বল,
গত কালের তিক্ত পেয়ালা ভ'রে দাও
আরো, আরো ভ'রে দাও আজকের বেদনায়।

বাসনা, আনন্দ, ভক্তি,
ছড়িয়ে পড়ুক সেপ্টেম্বরের কলরোলে :
আর তুমি, যাও, এই ফাটা গলার হেমন্তের মধ্যে লুকিয়ে থাকো,
হয় উন্মাদ হ'য়ে যাও, নয় শান্ত।

বন যেমন পাতাগুলিকে
তেমনি তুমি ছুঁড়ে ফ্যালো তোমার জামা-কাপড়।
রেশমি ফিতেওলা ড্রেসিংগাউন জড়িয়ে
তুমি ঝ'রে পড়ো আমার বাহুবন্ধে।

জীবন যখন রোগের চেয়েও বমি-পাওয়া
আর সৌন্দর্যের শিকড় শুধু সাহস,
তখন ধ্বংসের পথে তোমাকে পেয়েছি এক ভালো উপহার।
এই আমাদের পরস্পরের টান।

একটি রূপকথা

একদা রূপকথার দেশে
ঘোড়সওয়ার
টগবগিয়ে মাড়িয়ে চলে
স্টেপির পাড়।

সামনে তার যুদ্ধ। দূরে
আঁধার এক অরণ্য
ঝাপসা ধুলোর পর্দা ছিঁড়ে
আসন্ন।

হৃদয়ে অস্বস্তি, বলে
আঁচড় কেটে :
'জলের ধারে শঙ্কা, নাও
কোমর এঁটে।'

শুনলে না সে। মানলে শুধু
নিজের মন,
গাছে নিবিড় পাহাড় বেয়ে
চললো ছুটে জোর কদম ;

পাহাড় পার, মস্ত মাঠ
রইলো পিছে,
শুকিয়ে-যাওয়া ঝর্নারেখার
চিহ্ন ধ'রে নামলো নিচে।

উপত্যকায় পায়ের ছাপে
জানতে
পেলো এ-পথ গেছে জলের
প্রান্তে।

সাবধানের শব্দ ওঠে
বারে-বারে ;
বধির, নিলো চালিয়ে তার
অশ্বটিকে জলের ধারে।

ঝর্না যেথায়
আঁকাবাঁকা অল্প জলে,
গুহার মুখে
গন্ধকের আগুন জলে।

উগ্র লাল ধোঁয়ায় চোখ
মেঘলা হ'লো। অকস্মাৎ
অরণ্যেরে দীর্ণ ক'রে
উঠলো দূর আর্তনাদ।

চমকে ওঠে অশ্বারোহী :
'আমায় ডাকে!'
জবাব দিতে কঠিন হাতে
আঁকড়ে ধরে বর্শাটাকে ;

মিটিমিটি চক্ষে পড়ে
এবার তার
মুণ্ড, ধড়, লম্বা ল্যাজ
জন্তুটার।

একটি মেয়ে
বন্দী হ'য়ে প'ড়ে আছে
শঙ্কময় বপুর তিন-
ফেরতা প্যাঁচে।

হাঁ-থেকে লাল ফুলকি ওড়ে ;
দুলছে গলা,
যেন মেয়ের কাঁধের উপর
চাবুক তোলা।

রূপসীকে, রাজ্যে এক
নিয়ম আছে,
বলি দিতে হবে বিকট
আরণ্যক পশুর কাছে।

প্রজারা এই অর্ঘ্য দেয়
অজগরে,
বিনিময়ে দখল রাখে
বস্তিঘরে।

অবাধ সাপ বন্য সাধ
মিটিয়ে নিতে
রূপবতীর কণ্ঠ, বাহু
বাঁধে কঠিন কুণ্ডলীতে।

অশ্বারোহী প্রার্থনায়
পাঠালে চোখ ঊর্ধ্বে ;
বর্শা উঁচু করো এবার
যুদ্ধে।

*   *

রুদ্ধ চোখ।
পাহাড়। মেঘ। জলের স্বর।
পাথর। নদী।
বছর। যুগ। যুগান্তর।

রক্তমাখা ; লোহার টুপি
লুটোয় দূরে ;
থেঁৎলে যায় সর্প, তার
ঘোড়ার খুরে।

ছড়িয়ে আছে বর্শা আর
অশ্ব, নাগ, বালুর 'পরে ;
মূর্ছিত সে ; সংজ্ঞাহীন
কন্যা প'ড়ে।

স্নিগ্ধ নীল ঝামরে নামে,
দুপুর ভ'রে গুনগুনানি।
এই মেয়ে কে ? কিষানী ? রাজ-
কন্যা ? রানী ?

কখনো ঘোর পুলকে নামে
বিরামহীন অশ্রুধারা,
কখনো তারা মরণঘুমে
আত্মহারা।

কখনো তার স্বাস্থ্য ফেরে,
তাকায় চোখ একবার ;
কখনো ফের রক্তপাতে
নিঃসাড়।

কিন্তু হৃৎপিণ্ড বাজে।
কন্যা, বীর, জাগবে ব'লে
বারেক কেঁপে, নিদ্রাবেশে
আবার ঢলে।

রুদ্ধ চোখ।
পাহাড়। মেঘ। জলের স্বর।
পাথর। নদী।
বছর। যুগ। যুগান্তর।

অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু

বৈরাগ্য বেকার

অমিয় চক্রবর্তী

যে-রাস্তাই দেখি, শেষে নেমে গেছে একই শূন্যে
গোলক ধরার—
চৌমাথায় ব'সে আছি তাই।
যদি যাই ভাঙা দেউলে, ছায়া পাব, তলে শোব
নাইব দিঘিতে, দৈবে সন্ন্যাসীর কৃপা ঝরবে বেলা-
ছুটোয় ছুমুঠো চালে, সিধের কলায় ;
সাধু বাবু কোনো নেমে গাড়ি থেকে, পয়সা ছুঁড়ে দেবে।
কতদিন সে-মেয়াদ, পবিত্র আরাম অকর্মার
ভাগ্যে তা কে জানে,
নিশ্চিত নিচুর দিকে নিরুদ্দেশ॥

হাজারের অন্য রাস্তা এই ভিড়ে মুক্তি হু'চোখের,
দোকানে সাবান বিড়ি সন্দেশ নস্যির ডিবে, ডাব
মুদির বাতাসা মুড়ি, রঙিন লম্বা বিজ্ঞাপনে
নিরর্থক মস্ত হাসি, পা-দানিতে বাস্-এর সোয়ারি
নেমে দেখি যেই চোখ পুরো খুলে
এমন সময় ধাক্কা পুলিশের, স'রে যাও, বাকি
শস্তা চা-পান সেও কণ্ঠাগত শুধু
মাটির খুরির ভাঙা স্বপ্নের তেষ্টায়।
শেষে পুণ্য দেহ খুশি সরকারের কৃপা-বেঞ্চে শুয়ে
ভাঙা কাঠে, মাঠের চীৎকারে।
মরীয়া তেজের জোরে জেলে গেলে দুষ্কর্ম প্রতাপে

লৌহ দৃষ্টির তলে শুকনো ভোজ হত স্বল্প সুখ,
চৌকো দেয়ালে কিংবা দৈবাতের যে-কোনো সিঁড়িতে
সদিচ্ছা মুক্তির বেগে—গায়ে ছাঁটা বাস—
ওঠা নামা দুই হত দ্রুত সাংঘাতিক,
পলায়ন শূন্যে কেন, সাক্ষাৎ পাতালে ॥

তৃতীয় পন্থায়, সিদ্ধি সেবনের পরে
কিছুই না জানা আর উধাও কৌশলে
জুতো জামা বেচে দেশান্তর,
—ভবিষ্য অতল রাস্তা তারো।
বাকি পথ আবিষ্কার আছে কি আরেকটু অপেক্ষায় ?
নাটকের দৃশ্য দেখি ইতিমধ্যে, পায়রা ওড়ে মেঘে—
মায়ের নয়ন মনে পড়া, প্রাণে হাঁটা
মনের ফিরতি পথে, শোনা
ঝমঝম বাদ্য দশমীর—
রাস্তা যেন ওরই মধ্যে ছিল, আছে, বাহিরে ভিড়েও ;
মেলাতে কি পারব আর, শূন্য থলি বুড়ো
চাষী, ধোবা, শেষে কুলি, আরো শেষে চরম বেকার।
চৌমাথায় রহস্যের গ্রন্থি হাতে বসি, ভাগ্য রসি
দোলে রাঙা সূর্যাস্তের মহা-ভালে
পুড়ন্ত শূন্যের বেলা ॥

যদি

গোপাল ভৌমিক

চলিষ্ণু মন। পথে যেতে-যেতে
হঠাৎ থমকে পড়ি ;
মনে হয় গায়ে জড়িয়ে মেঘের
অনেক নীলাম্বরী
হয়ে গেছি আমি দূরের পাহাড় যেন
স্থাণু ও নির্বিকার।
পথ-চলা ওই তরুণীর বেণী
ছড়াতে পারে না আর
কোনো মোহ এই দুষ্প্রবেশ্য মনে ;
এখানে আলোক যদি
বন্ধ এখন, দেয়ালে-দেয়ালে
জল ঝরে নিরবধি।

মৃত পাথরের স্তূপে যে-কান্না
প্রতিনিয়তই বাজে
শুনেও আমরা শুনতে পাই না
যেহেতু ব্যস্ত কাজে
চলাফেরা করি, হাঁটি বসি উঠি ;
থমকে দাঁড়িয়ে পথে
দেখি না চলেছে মিছিল কেমন,
জল ঝরে পর্বতে।
চুপ ক'রে যারা ফুটপাতে ব'সে
গোনে সব খড়ি পেতে

তারা কি পেয়েছে প্রাণের স্পর্শ
পাহাড়ে নদীতে যেতে ?

চলিষ্ণু মন। তাই যেতে-যেতে
হঠাৎ থমকে পড়ে ;
পাহাড়ের মতো স্থবির হবার
ভয়ে সে কুঁকড়ে মরে।
পাহাড় হ'তেও আপত্তি নেই
যদি সে চলতে পারে
ঘাটে মাঠে পথে আকাশে সাগরে
জীবনের অভিসারে।
পরতে আদৌ গররাজি নই
মেঘের নীলাম্বরী,
সহানুভূতির জল গ'লে যদি
হই আলোকের তরী।

তুই যে অধীর হলি

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

তুই যে অধীর হলি, ভয়াবহ তার পরিণাম।
বিচিত্র যৌবন তোর বহুবর্ণে মহিমামণ্ডিত
কী অপূর্ব যোগাযোগে, তার গুপ্ত ভাষা
অন্তর্লীন ও-রম্য শরীরে। ক্ষুব্ধ আর্তির সংগ্রাম
দুর্বিষহ। অথচ আসেনি সে-ও যার অবারিত
সুনিবিড় সংকর্ষণ সঞ্চারিত ক'রে দেবে আশা।

ব্যাকুল বসন্তবিদ্ধ স্বেচ্ছাবন্দী স্নায়ুর জগতে
বন্যতার ঢেউ তুলে, বকুলের সুগন্ধি জড়িয়ে।

কিন্তু কী আশ্চর্য ভ্রান্তি, যথাকালে সে এলো না দেখে
সহসা অধীর হলি। তার কাছে গেলি কোনোমতে
যে কেবল বেঁচে আছে। সর্বদাই যে তোকে এড়িয়ে
প্রৌঢ়তার ম্লান ছবি মুখে নিয়ে শেষ পাঠ শেখে।

অতিক্রান্ত শেষ লগ্ন। আজ তুই তার কাছে এসে
কেবল বিনষ্ট হলি সংকীর্ণ সংগমে। তোর নাম
ফুলের জগৎ থেকে অবলুপ্ত হ'লো অবশেষে ;
তুই যে অধীর হলি ভয়াবহ তার পরিণাম॥

দোপাটি

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

বলেছিলুম, আমাকে ছুঁয়ো না তুমি। তোমার দেহ বেয়ে উঠেছে
ফাল্গুনী হাওয়ার
উল্লাস ; চুলে চৈতালি ঝড় ; তোমার কেশগন্ধে আমি হবো হাওয়ার হরিণ।
তোমার চোখের নীল আগুনে দাবানলের আভা ; আমি জ্ব'লে উঠে তোমার
অরণ্যের প্রতিটি সবুজ পল্লবকে লেহন করবো তৃষ্ণার্ত রসনায়।
তোমার বাহুর প্রবালপ্রাচীরে বেষ্টিত আমি হারিয়ে যাবো সমুদ্রের
ফেনিল তরঙ্গচূড়ায়, নীল জলের আঁচলে, বেণীতে, দেহসন্ধিতে।

আমার মিনতি রাখোনি তুমি। মনে নেই কখন আমার
মনের উন্মত্ত কৃষ্ণসার তোমার উদ্দাম হাওয়ার মুখে ছুটে গেছে ;
ভুলে গেছি কখন তোমার প্রতিটি উন্মুখ কিশলয়ের আভায় উজ্জ্বল, আতপ্ত
সতেজ, সুন্দর হ'য়ে উঠেছে আমার ওষ্ঠাধর ; আর ভুলে গেছি কখন
নীলকান্তমণির মতো তরঙ্গের ফেনিল বুকে, আঁচলে,
কবরীতে, কটির বেষ্টনীতে বিলগ্ন হ'য়ে স্তিমিত হয়েছে আমার দেহ।

ঝড়-থেমে-যাওয়া সমুদ্রের মতো এখন আমার গভীর, তন্ময়
অনুভূতিতে দেখি আমাদের দুটি পৃথক অস্তিত্ব সুবাসিত ধূপ
হ'য়ে পুড়ে-পুড়ে যুগল ধোঁয়ার কুণ্ডলী এঁকে গেছে যেন।
দ্যাখো, সদ্যবৃষ্টিস্নাত ছাদের টবে এইমাত্র বিকশিত এই
আশ্চর্য দোপাটির মতো আমরা। আমাদের দুর্মর যুগল সত্তা
উজ্জ্বল, প্রশান্ত আলোর বৃত্তে একটিমাত্র বৃন্তে বিধৃত।

মেঘ কেটে গেছে। মাথার ওপরে জ্বলছে মুক্তোর মতন টল
চাঁদ। পৃথিবী আর আকাশ একটি ঝিনুকের দুটি খোলা যেন,
একটি দোপাটির দুটি পাপড়ি যেন, আমাদের ঘিরে আছে। আমরা
নিরাবরণ হৃদয়ের সহজ সত্যে সমাহিত। এই মুহূর্তটি এক আলোক-বৎসর।
দোপাটির শূন্যের বৃন্তটির নিরুত্তাপ অন্ধকার, ঝিনুকটির উল্টো
পিঠের অপরিণত ছায়া, আমাদের মনে নেই এই উচ্ছল আলোর উপকূলে।

সেই ঘোড়াটা

শামসুর রাহমান

আস্তাবলে ফিকে অন্ধকার, ঝুলছে নিষ্কম্প স্তব্ধতা,
আর সেই বেতো ঘোড়াটা অনেকক্ষণ থেকে ঝিমোচ্ছে
নিঃশব্দে কোনো আফিমখোরের মতো, মাঝে-মাঝে শুধু
ফোলা পা নাড়ছে ঘাড় ঝাঁকিয়ে।

আস্তাবলের ধারে নোংরা নর্দমা, তার পিছল জলে
একটা থেঁৎলানো ইঁদুর ক্রমাগত ধুয়ে-ধুয়ে
রূপান্তরিত : বিলীয়মান সনাতন স্বপ্ন-স্মৃতি যেন
মুঞ্জরিত ওর বিকল্প অস্তিত্বে।

বিশাল আকাশে ফুটেছে পারিজাতের মতো চাঁদ,
হলদে খড়ের শয্যায় বুড়ো সহিস ঘুমিয়ে আছে সেখানে
ক্লান্ত দেহে, নিঃসন্তান, বিপত্নীক—নিদ্রিত
কাঠের নক্সা যেন অবিকল।

ঘোড়াটাও ঝিমোচ্ছে, কিন্তু তার ক্ষত-নিঃসৃত মদিরা
মাতালের মতো অধীর আগ্রহে বুঁদ হয়ে পান করছে তিনজন মাছি;
এক কোণে নিস্তেজ কুপিটা কোনো প্রেমিকের বিলুপ্ত প্রেমের মতো
জ্বলছে এক বিষণ্ণ আচ্ছন্নতায়।

এই তো এখানে নর্দমার ধারে কিছুক্ষণ আগে কয়েকজন প্রৌঢ়
মাটির ভাঁড়ে ঢকঢক শব্দ ক'রে গিলেছে তাড়ি,
সব অনুতাপ হাওয়ায় উড়িয়ে জ্যোৎস্নায় ভেজা ঠোঁটে
পান করেছে পূর্বপুরুষের স্মৃতিবিষ।

আর রাত্রির তারাময় আঁধারে তারা হাতের মুঠোয়
কামনা করেছে অপ্সরীর স্তন, তারপর বিষাক্ত কোনো বাষ্পে
স্ফীত হ'য়ে ট'লে-ট'লে চ'লে গেছে যে যার গণিকার ঘরে।
এখন এখানে শূন্যতার ভার।

আস্তাবলের সেই বেতো ঘোড়াটা নিমেষে
তন্দ্রার ঘোর কাটিয়ে উঠলো, আশ্চর্য এক ফুল হ'য়ে
জন্ম নিলো তার ইচ্ছা, শিরায়-শিরায়
সঞ্চারিত হলো সে-ফুলের সৌরভ।

চকিতে নোংরা নর্দমা হ'য়ে ওঠে অপরূপ সরোবর
খড়কুটো, ছেঁড়া ন্যাকড়া, থেঁৎলানো ইঁদুর, ফুলের তোড়া, মণিরত্ন হ'য়ে
ঝলসে ওঠে ওর চোখে, আর সে নিজে উড়ে গেলো
মেঘপুঞ্জে নক্ষত্রগুচ্ছে শূন্যের নীলিমায়।

মুহূর্তে মুছে গেলো সময়ের সব ব্যবধান,
মেঘের বৈভবে সে ফিরে পেলো অবলুপ্ত কান্তি
আর ভেসে চললো আকাশ থেকে আকাশে অক্লান্ত গতিতে
কবির মতো নিঃশঙ্ক, সহজ, একা।

বিরহ

সুভাষকুমার মিত্র

ঐ বুনো ওলের চারা,
ঐ নিটোল খুশির আমেজ-ছড়ানো
ভোরবেলাকার কোমল চঞ্চলতাকে গায়ে মেখে-থাকা
কালো পিঁপড়ে।

কী অবাক লাগে ;
নিঃসঙ্গতার প্রতীক খুঁজে-খুঁজে
সেখানে আমি ছিলাম আজ নেই।
একদিন যারা সত্য ছিল
তারা আজ স্মৃতি ব'য়ে আনছে
তাদেরই প্রবাসী আত্মার হাতে।

এই জীবনটা তো গ'ড়ে উঠেছে
কত বিরহ থেকে বিরহান্তরের মালায়
সেখানে আমরা প্রতি ফুলে
মৌমাছির মতো খুঁজে ফিরি
মিলনের স্তব্ধতা ॥

অন্তর্পঞ্জী

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

বৃষ্টি নেই হাওয়া নেই আপাতত পৃথিবী নীরব।
জানালায় শঙ্খমালা সমুদ্রের গ্রীবা,
দেয়ালে বিরস নীল গলিত গন্ধের স্রোত ; শব
ছুঁয়ে আছে চন্দ্রমল্লী, পৃথিবীর অমর বিধবা।

আর কেউ পাশে নেই, বৃষ্টি নেই হাওয়া নেই ঘরে,
ভালোবাসা নেই তার, সমুদ্রগ্রীবার থেকে মালা ঝ'রে ঝ'রে
উজ্জ্বল পাখিরা সব একদিন উড়ে গেলে পরে
বৃষ্টি এলো হাওয়া এলো পৃথিবীর মূঢ় গৃহান্তরে।

*

বৃষ্টি এলো হাওয়া এলো পৃথিবীর মূঢ় গৃহান্তরে।
দেয়াল সাজায়ে ছিল শোলার নকল ফুল, নীল কাকাতুয়া ;
যে-পাখিরা মালা হ'য়ে ঝ'রে গিয়েছিল, তারা
মালা হ'য়ে ফেরেনি তখনও ;
স্পন্দনের একটি ছুটি শান্ত পাখি ফিরেছিল বুকে।
কথা ছিল তারা সব মালা হবে, জ্যোৎস্না হবে, সর্পাহত টিলা
জীবনের বিভাজিকা হ'য়ে র'বে মূর্ছিত শৈশব।
এক পারে মূঢ় ভয়, অন্য পারে মূঢ়তম তৃষা।
আচ্ছন্ন প্রভাত যারে নিয়ে এলো সে তো শুনি প্রেম।
তবে চারিধারে তার ম্লান শব্দ ওঠে···
খয়েরি রঙের ম্লান শব্দ, ঝরে পিতলের ভাষা ;
জলচক্র ঘুরে-ঘুরে হয় মেঘ হয় জল হয় মেঘ হয় জল···
হে বিরহী গ্রীবা, তুমি আমায় শেখাও সেই মোহহীন গভীর জীবন।

দুটি কবিতা

প্রণবেন্দু দাশগু

একটি ভবিষ্যৎ-বাণী

প্রচণ্ড ব্যথায় তার মুখ ফুলে যাবে—
গণক, ডাক্তার এসে হদিশ পাবে না,
হয়তো মৃত্যু হবে, বৌকে হারাবে,
পাঁচটা লোকের মতো শুধবে না দেনা।

‘সেলাম ঈশ্বর’ ব’লে হাঁক দিয়ে গেলে
চুন, কি সিমেণ্ট খসে সীলিং কাঁপিয়ে।
মূর্খ! কোথাও তাঁকে এইভাবে মেলে—
তেমন কর্তার নাম চিরদিন হ’য়ে।

কোথায় পাঠিয়ে দেবে নিজের বোঝাকে—
দু’চোখে ব্যস্ত কীট, বুকভরা ক্রিমি,…
মেঘের নক্সা, হায়, ডেকেছিলো যাকে,
তাকেই দাওয়াই দেবে ঘুমের হাকিমি॥

রূপক

স্বাস্থ্য, সুখ হঠাৎ গেল ভেসে—
জলের দরে বিকিয়ে দিলো বাড়ি,
কারণ শুধু অলীক পায়াভারি
সময়মতো নাচেনি রায়বেঁশে।

টাঙানো মাঠ, ধোঁয়ার মতো বাসা:
নিজেই রাখে ছবিটা উলটিয়ে,
শব্দ হ’লে, কানে আঙুল দিয়ে
ভুলতে চায় ভাষা;

উপায় নেই, তেমন পেটা-ঘড়ি
অনেক থাকে, চমকটুকু দিতে—
লোকটা তবু হিসেব বুঝে নিতে
তোমার কাছে যাবে না, সুন্দরী!

পেঁচিয়ে, ধোঁয়ার মতো

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পেঁচিয়ে, ধোঁয়ার মতো, নকল স্মৃতিরা সকৌতুকে
বানায় ক্ষণিক স্বর্গ, সিন্ধুতীরে বালির প্রাসাদ,
ঐন্দ্রজালিক হাওয়া শূন্য ঘরে ভিখারি চিবুকে
ছদ্মবেশী মুখ রাখে, তারপর যেই ভাঙে বাঁধ
অমোঘ নিষাদ হেসে মৃত্যু হানে অধীন পশুকে।

যা দিয়েছিলাম তবু, সে কি গান? কেবল রক্তের শিহরণ?
না কি কোনো অলৌকিক অলীক হলুদ জনপদে
যাবো ব'লে, বেরিয়ে, তোমাকে দেখে, সব ভুলে, আদিম বারুদে
আত্মঘাতী তাপ দিয়ে মত্তপায়ী চণ্ড বিস্ফোরণ
ঘটিয়ে, বিশাল শূন্যে—সে তো স্বপ্ন—স্বপ্নের সম্পদে
বানিয়েছি বাস্তভিটা, যার হিংস্র হিরন্ময় দ্বার
প্রতিশোধ নেবে ব'লে উদাসীন কপাট খোলে না।

খোলে না, অথচ বলে—তোর লোভনীয় উদ্ধার
কপাট খুললে পাবি, যার চাবি কোথাও পাবি না
যদি-না এখনো যাস ভুলে-যাওয়া সেই জনপদে
যেখানে যাবার কথা ভেবে তুই করেছিলি একদিন পণ॥

পাখি ডালে বসলে প্রথম

(Erika Schindler-কে)

শান্তিকুমার ঘোষ

পাখি ডালে বসলে প্রথম অন্য পাখিদের
খানিক বন্ধুর ভাব খানিক শত্রুতা,
অবশেষে সঙ্গে নিয়ে ভিন্ন গাছে ওড়ার অবাধ যৌথ চঞ্চলতা।

*

কফির আসরে চেনা:
তুই নির্জনতা মুখোমুখি
সংঘর্ষে যেমন সত্তার শিকড় কাঁপে
কাঁপে ভবিষ্য-অতীত—
বিস্ময়বেদনা তত সেই পরিচয়ে।

প্রথম পাহাড় দেখার আনন্দ তার চোখে,
নৌকার দাঁড়ের ছন্দে বাঁধা বাহু
রক্তিম পাৎলা ঠোঁটে তারুণ্যের উৎস।

সে জানে কী ক'রে সোনালি গোলাপ তিনটি সন্ধ্যায় বেদনালোহিত হয়;
কুঁকড়ে কেমন অল্প স্থান অধিকার করে প্রেমিকেরা;
আর সমস্ত আকার শুধু সমতলের উপর চাপ
অথবা শক্তির বেগ।

তাকে ছুঁয়ে গেছি আমি কৈশোরের ঘাটপথে,
ভোরের বাগানে :

সহচর-সহচরী অবিকল মুখ সব
শিশিরের চূর্ণ বিন্দু চোখের ঝালরে ;
এক ঝাঁক চেনা স্বর : গানের ঝরোকা খোলা আলতো আঙুলে।

*

বোঝাই ফুলের ভারে লাল-নীল নৌকাগুলো খাল বেয়ে চলে—
বিস্মৃতির সেতু দিয়ে প্রবাহিত জল স্থির শব্দহীন রূপ :
সাঁকোর তলার শান্তি, সুদূরের তৃষ্ণা কোন—গোপন বিরহ।
আমার বেদনা সব পুষ্পপাত্র ভেসে যায় বিপরীত স্রোতে।

*

ভাসে পরিস্রুত অন্ধকারে তন্ত্রীছেঁড়া তান :
একাকার করতালি, বাহুর খিলানে দেখা মুখ—ভুরুর বঙ্কিমা ;
নাচে পায়ের ঘূর্ণিতে নিচে স'রে যায় পৃথিবী ;
অনুভব করে প্রৌঢ় ঠোঁটে আবার দম্পতি চুম্বনের বেগ :
এবং মানে না বাধা কামনায় তৃপ্তি খোঁজে প্রচণ্ড মুঠিতে।

তবুও বসন্তে দেখা মেলে না তুলনাহীনার—না রিভোলি, না অপেরায়
যদি বা মিললো, অনিবার্য স্রোত কখন অনন্য পথ ভাগ করে দুই দিকে ;
যেন অন্তহীন প্রবাসবেদনা কুরে খায় সারা বুক,
মনে হয় সব বিশৃঙ্খল, অসংবদ্ধ—নেই কারণ বা সূত্র ঘটনাবিন্যাসে।

*

তৃষ্ণার আঁধারে জ্বলে সারাক্ষণ মুখ কার···মুখের ব্যঞ্জনা :
দুঃস্বপ্নের রাত্রিভার—সাপের-নর্তক-ইচ্ছা বাহুবদ্ধ নারী
মুহূর্তে ছাড়াতে চায় একটি দেহের সীমা যন্ত্রণা আগুন !

আমার সংকোচ এত, বিচ্ছেদের ভয় আরো, দুর্মর বিষাদ ;
দৃষ্টি ভ'রে পান শুধু অন্তরঙ্গ রূপ এক অনুষঙ্গময়।
ঋতুর নির্মোক ছিঁড়ে কখন নিঃশব্দে তার মুঞ্জরিত প্রেম।

*

সমস্ত অতীত জ্বলে নোতর দামের কাচে।
খ্রীষ্টের দক্ষিণ হাতে কবুতর শান্ত স্থির।
কেবল বাতাসে ঘোরে নানা বর্ণ একরাশ স্মৃতির পালক।

*

বিযুক্ত শীতল হাত।
বিদায়ে শুধু কি মৃত্যু···মেরুর শূন্যতা।

সফোক্লেস-এর আন্তিগোনে

(পূর্বানুবৃত্তি)

অনুবাদ : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

[আন্তিগোনে সহ প্রহরীর প্রবেশ]

প্রহরী এই যে এনেছি তাকে, হাতে নাতে ধরা যাকে বলে,
যাঁর জন্য ধ'রে আনা সেই রাজা ক্রেয়োন কোথায় ?

সূত্রধার। কথা উঠতে-না-উঠতেই ঐ তিনি এসে গিয়েছেন।

[ক্রেয়োনের প্রবেশ]

ক্রেয়োন। আমার আসার সঙ্গে কিসের সম্বন্ধ ? কী হয়েছে ?

প্রহরী। মহারাজ, দুনিয়ায় আগে থাকতে কে বলতে পারে
'এ-কাজটা করবো না' ? কে যেন উপরে ব'সে আছে,
তার কাজ মানুষকে মিথ্যাবাদী মানুষ বানানো ;
আমি আপনার ভয়ে ভেবেছিলাম যে কোনোদিন
এ-পথে পা বাড়াবো না, কিন্তু সেই পা বাড়াতে হ'লো।
অঘটন ঘ'টে গেলো, স্বপ্নেও যা কখনো ভাবিনি,
তাই হ'লো, সব সুখ এর কাছে পানসে, মহারাজ।
এই যে এনেছি এই মেয়েটিকে ধ'রে, এ মেয়েটি
নিরিবিলি কবর সাজাচ্ছিলো মড়া লোকটার,
নিজ ভাগ্যে নিজ হাতে আমি ওকে গ্রেপ্তার করেছি,
একা আমি, আর কেউ নয়, এই নিন, এইবারে
আপনার ইচ্ছামতো ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করুন,
আমার আর দায় নেই, দোষ নেই। যেতে পারি আমি ?

ক্রেয়োন। তুমিই ধরেছো ওকে ? কোনখানে ? কী কাজ করছিলো ?

প্রহরী। এই তো বলেছি, মৃত লোকটিকে কবর দিচ্ছিলো।

ক্রেয়োন। তুমি কী বলছো তুমি বুঝতে পেরেছো তার মানে ?

প্রহরী। বেআইনি মড়া লোকটাকে যেই কবর দিচ্ছিল
আমি ওকে দেখতে পাই, এইবার স্পষ্ট হয়েছে তো ?

ক্রেয়োন। ধাঁধাঁ লাগছে। কী ক'রে দেখলে ওকে ? কী ক'রে ধরলে ?

প্রহরী। খুলে বলি। দণ্ডভয়ে আমরা সকলে জড়োসড়ো
গিয়ে মৃতদেহ থেকে সরালাম ধুলোর আস্তর,
গ'লে-যাওয়া লোকটার উলঙ্গ শরীর মেলে রেখে
হাওয়ার দুর্গন্ধ থেকে দূরে একটা পাহাড়ে বসলাম।
এ ওকে শাসিয়ে বলছে, 'বাপু তুমি গা আলগা দিচ্ছো',
এ ওকে শাসিয়ে বলছে, 'বাপু হে, ঘুমিয়ে পড়ছো কেন ?'
এই ভাবে একঠায় ব'সে আছি···দেখতে-দেখতে
চড়া দুপুরের সূর্য তেতে উঠলো মাথার ওপর,
কখন আচমকা লাগলো আঁধিঝড়, কোড়া হাতে যেন
মাটি থেকে খ্যাপা হাওয়া আকাশের দুশ্চিন্তার মতো
উঠে এসে চারদিকে এলোপাথাড়ি চাবুক কসালো,
বুক খালি ক'রে দিলো পাতাছাওয়া বন, ঝরাপাতা
নিয়ে গেলো আকাশের বুকে। মুখ বুজে এতক্ষণ
চোখে-মুখে মাখলাম দেব্‌তার পাঠানো মহামারী।
শেষে যেই ঝড় থামলো, মেয়েটিকে দেখতে পেলাম ;
আপনারা কখনো কেউ শুনেছেন খড়ের বাসায়
ফিরে এসে বুকজোড়া দুধের ছানাকে যদি ঘরে
দেখতে না পায় তবে পাখি-মা কেমন ডুকরে ওঠে ?
ঠিক তেমনি মড়া সেই লোকটার উলঙ্গ শরীর
দেখতে পেয়ে কেমন ককিয়ে উঠলো মেয়েটা হঠাৎ,
কী যে শাপ দিতে লাগলো যারা এই শয়তানি করেছে
সেই সব পাপীদের···তারপর কয় মুঠি ধুলো

জড়ো ক'রে আনলো দুই হাতে, দুধ মদ মধু জল
কাঁসার বাটিতে রেখে তিনবার ঠিক তিনবার
সমান-সমান ক'রে ঢেলে দিলো মড়ার উদ্দেশে…
ছুটে গিয়ে তখুনি আমরা ওকে ঘেরাও করেছি,
ও তবু কাঁপেনি একটু, পাথরের মূর্তির মতন,
যখন বললাম : 'তুমি এর আগে করেছো, আবার
এখন, তোমারি করা এই কাজ?' 'আমারি এ-কাজ,'
ব'লে দিলে শান্তভাবে, সব দোষ ঘাড়ে তুলে নিলে।
ওঃ, আমি কখনো, একসঙ্গে এত দুঃখী এত খুশি
জীবনে হইনি আর, নিজে তো বেঁচেছি মৃত্যু থেকে,
যদিও মৃত্যুর মুখে বন্ধু ঠেলে বেঁচে থেকে লাভ?
আগে তো আপন প্রাণ, পরে অন্য লাভ লোকসান।

ক্রেয়োন। তুমিই করেছো তবে এত সব? যে-তুমি এখন
চোখ তুলে তাকাচ্ছো না সেই তুমি করেছো এ-সব?

আন্তিগোনে। আমারি এ-কাজ। আমি অস্বীকার করতে চাই না।

ক্রেয়োন। ওহে, তুমি এবার যেখানে ইচ্ছা চ'লে যেতে পারো,
রাজরোষ থেকে ছুটি, বেঁচে গেছো, পালাও—পালাও—
[প্রহরীর প্রস্থান]

এইবার আমার কথার ঠিক সদুত্তর দাও,
অল্প কথায় বলো। তুমি জানতে নিষিদ্ধ আইন?

আন্তিগোনে। জানতাম। নিষিদ্ধ হ'লেও সে তো নীরব ছিলো না।

ক্রেয়োন। তবে তুমি জেনে-শুনে রাজ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করেছো?

আন্তিগোনে। কারণ, রাজার আজ্ঞা দ্যুস্পিতার দৈববাণী নয়;
মৃত্যুর তমসাবৃত সুনৃতা প্রজ্ঞায় সিংহাসন,
সেই সিংহাসন থেকে বারণ তো শুনতে পাইনি।
রাজার নিষেধ এত দৃঢ় নয় যে নশ্বর মানুষ

মুছে দেবে ঈশ্বরের অলিখিত অমোঘ নিয়ম।
শুধু আজকের নয়, কিংবা শুধু কালকের নয়,
নিত্যনিয়মের ধারা ব'য়ে চলে, উৎস যে কোথায়,
কে জানে? কেউ জানে না। দর্পিতের ভয়ে আমি তাকে
এড়িয়ে পালিয়ে গিয়ে দেবতার ভর্ৎসনা কুড়োবো?
রাজন্, তাছাড়া আমি রাজাজ্ঞা শোনার আগে থেকে
জানি যে মানুষ মরে, আমাকেও মরতেই হবে
আজ না-হয় তো কাল, কাল যদি না-হয় পরশু,
শেষের প্রহর তাই ঘনাবার আগে আমি যদি
পালা শেষ করি তবে জয় হবে আমার জয় হবে,
জ্বালাযন্ত্রণায় ঘেরা যার রাত্রিদিন, তার কাছে
মৃত্যুবরণের চেয়ে মহত্তর আর কিছু নেই।
তেমন কী কষ্ট এতে? কিন্তু যদি আমার এ-কাজ
বাকি রইতো, মহারাজ, সোদর ভাইকে আমি যদি
মাটি না-দিতাম, তবে নরকযন্ত্রণা বইতাম—
এ আমি সইতে পারবো। আপনি যদি বলেন 'পাগল',
আমিও তাহ'লে বলবো বিচারক স্বয়ং পাগল।

সূত্রধার। দেখুন কেমন শক্ত, ঝড় এলে মাথা নোয়াবে না।
এ ওর বাপের মেয়ে, ভাঙবে তবুও মচকাবে না।

ক্রেয়োন। এটাও জানবেন, অতি বড়ো গাছ ঝড়ে উড়ে যাবে,
যত বেশি শক্ত লোহা একগুঁয়ে চুল্লিও তেমন
বিষদাঁত ভেঙে তাকে গলাবে ততই। খুব জানি
কী ক'রে মাতাল ঘোড়া একটু মোচড়ে পোষ মানে।
হায়রে গোলাম তবে কেন সাজে নাটুকে মালিক?
আমি এই মেয়েটিকে খুব চিনি, সেই একবার
বছর কয়েক আগে আগুনে ও হাত রেখেছিলো,

দাপটে দেমাকে আইনের বেড়া টপকে গিয়েছিলো
এই মেয়ে। এখন আবার, আর এবার দেখছি
নারীর ভূষণ লজ্জা মুছে ফেলে নিজের কাজের
কাহন শোনায় এসে! ও কি মেয়ে, আমি কি পুরুষ?
হোক না ও আমারি বোনের মেয়ে, হোক না ঘরের
আদুরী দুলালী তবু আমি ওকে রেহাই দেবো না;
ওকে শুধু নয়, ওর বোনকেও কড়া সাজা দেবো,
দুজনে সমান পাজি, এক দোষে দোষী দুইজনে।
কে আছো, এখুনি যাও, তাকে ডেকে আনো, তাকে ঠিক
বাড়ির ভিতরে পাবে, একটু আগেই তাকে আমি
ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদতে লক্ষ্য করেছি; মূঢ় মেয়ে।
এ-রকমই ঘটে, যত কুচক্রী দেখেছি, সকলেই
অজান্তে নিজের দোষ ফাঁস ক'রে দেয় আগে থেকে।
এর মধ্যে আশ্চর্যের কিছু নেই, কিন্তু যে-মুখরা
ধরা প'ড়ে গিয়ে তবু নিজের পাপের ঢাক পেটে,
সে তো শুধু মূঢ় নয়, সে যে এক দুঃশীলা ভীষণ।

আন্তিগোনে। আমায় তো মারবেন, আর কী প্রত্যাশা আপনার?

ক্রেয়োন। আর কিছু নয়, প্রাণদণ্ড দিয়ে তোমাকেই চাই।

আন্তিগোনে। তবে আর দেরি কেন? আপনার সমস্ত কথা যে
মর্মে বাজে শেল হ'য়ে, সেই শেল এমনি বাজুক,
আমার কথাও তেমনি আপনার কাছে বিষ লাগে।
কিন্তু এর চেয়ে আর কোন কাজ, পুণ্যকাজ বেশি
কুকুর শকুনি থেকে মরা ভাইকে লুকিয়ে বাঁচানো?
এই যে এখানে যাঁরা জ্ঞানবৃদ্ধজন, সকলেই
মনে-মনে আমার সপক্ষে, কিন্তু আপনার ভয়ে

মুখ খুলতে পারছেন না, রাজারা সত্যিই খুব সুখী
যখন-তখন দেন যাকে-তাকে হুমকি-হুকুম।

ক্রেয়োন। একা তুমি সব বোঝো? আর-সব প্রজা কি নির্বোধ?

আন্তিগোনে। মনে-মনে তারা বোঝে, প্রাণভয়ে বলতে পারে না।

ক্রেয়োন। তোমার কি লজ্জা নেই তুমি যে তাদের মতো নও?

আন্তিগোনে। এক রক্তমাংসে গড়া আপন ভাইকে ভালোবাসা
লজ্জার বিষয় ব'লে বুঝিনি তো।

ক্রেয়োন। তবে অন্য জন,
এর হাতে অপঘাতে যে মরেছে, সে বুঝি তোমার
কেউ নয়?

আন্তিগোনে। কেউ নয়? দুই জন আমারি সোদর!

ক্রেয়োন। তাকে তুচ্ছ ক'রে তার ঘাতকেরে সম্মানিত করো?

আন্তিগোনে। শান্তসমাহিত মৃত দোষারোপ করতে জানে না,
মান-অপমানের প্রশ্নে বিচলিত হয় না সে-জন।

ক্রেয়োন। বিশ্বাসঘাতক তবে পাবে কি পূজার উপচার?

আন্তিগোনে। ভাইকে মেরেছে ভাই, নয় কোনো প্রভুর গোলাম।

ক্রেয়োন। একটি দেশের ভিৎ, শহীদ, অন্যটি দেশদ্রোহী।

আন্তিগোনে। তবুও পবিত্র মৃত্যু সাম্যকৃত্য দাবি করে তার।

ক্রেয়োন। এক ব্রত এক কৃত্য কাপুরুষ বীরপুরুষের?

আন্তিগোনে। হয়তো বা সকলেই ক্ষমা পায় সমাধির পারে।

ক্রেয়োন। শত্রু যে সর্বদা শত্রু, জীবনে কী মরণেই বা কী?

আন্তিগোনে। আমি তো চেয়েছি শুধু ভালোবাসা, শত্রুতা চাইনি।

ক্রেয়োন। যাও, তবে মৃতকেই ভালোবাসো, মৃত্যু ভালোবাসো,
অসম্ভব, আমি থাকতে নারী হবে রাজা কিংবা রানী।

সংস্তব-গান

দুয়ার-বাহিরে এলো ঐ ইসমেনে,
সহোদরা ও যে ঝরায় অশ্রুলোর,
নত ভ্রূ কাঁপে রাঙা মেঘ মুখে এনে,
দীপ্র কপোল অভিসিঞ্চিত ওর।

[রক্ষীদলের সঙ্গে ইসমেনের প্রবেশ]

ক্রেয়োন। কালনাগিনী, তোকে আমি যত্নে প্রতিপালন করেছি,
লুকিয়ে আমারি রক্ত শুষে নিয়ে ঋণ শুধেছিস,
যমজ সাপিনী তোরা দুইজন বিষ ঢেলেছিস
প্রাণদাতা রাজাকে মারবি ব'লে। তাহ'লে তুমি কি
এ-চক্রান্তে একজন, না তুমিও অপাপ অবলা ?
ইসমেনে। হ্যাঁ, আমিও একজন, আন্তিগোনে সাক্ষ্য দেবে, আমি
এই কাজে তার সঙ্গে অন্যতম অপরাধী এক।
আন্তিগোনে। মিথ্যা সাক্ষী দিতে পারবো না। তুমি ভয় পেয়েছিলে,
আমিও সাহসী হ'তে পিড়াপিড়ি করিনি তোমাকে।
ইসমেনে। তোমার দুঃখের দিনে পাশে দাঁড়াবার অধিকার
নিয়ো না, নিয়ো না কেড়ে, এক দুঃখে ভেসে যেতে দাও।
আন্তিগোনে। মৃত্যু ও মৃতের আত্মা দুষ্কৃতিকারীর খোঁজ রাখে,
কথায় হীরার ধার, সে কখনো আমার বন্ধু না।
ইসমেনে। আমাকে অমন ক'রে ফিরিয়ে দিয়ো না; আন্তিগোনে,
একসাথে মরতে দাও, মৃতের পুণ্যাহ করতে দাও।
আন্তিগোনে। তোমার আমার মৃত্যু এক নয়, তুমি যা করোনি
তুমি তা করোনি, তবে আমার মরণে কেন মরো ?
ইসমেনে। তুমি যদি না-রইলে, এই প্রাণ মৃত্যু ছাড়া কিবা ?
আন্তিগোনে। ক্রেয়োনকে প্রশ্ন করো, যিনি তোর ভরসাভাজন।
ইসমেনে। শুধু-শুধু তুমি কেন কথা দিয়ে বিঁধছো আমাকে ?

আন্তিগোনে। তোকে যদি বিদ্ধ করি, সে-ব্যথা আমার বুকে বাজে।
ইসমেনে। শুধু বলো, তোমার কী কাজে মোরে সঁপে দিতে পারি।
আন্তিগোনে। নিজের জীবন যদি বাঁচাতে পারিস, খুশি হবো।
ইসমেনে। তোমার মৃত্যুর ভাগ আমাকেও দাও, আন্তিগোনে।
আন্তিগোনে। তুমি বাঁচতে চেয়েছিলে, আর আমি মৃত্যুই চেয়েছি।
ইসমেনে। যা বলেছি তা-ই সব ? যা বলিনি, বুঝবে না তুমি ?
আন্তিগোনে। কেউ বোঝে তোর মতো, কেউ বা আমার মতো বোঝে।
ইসমেনে। আন্তিগোনে, আজ মোরা এক দোষে দোষী দুই বোন।
আন্তিগোনে। ইসমেনে, অবুঝ হোসনে, বেঁচে থাক। আমি তো আগেই
ম'রে আছি, আমি তাই মরা মানুষের কাজে লাগি।
ক্রেয়োন। বদ্ধ উন্মাদিনী দু'জনেই, সবেমাত্র একটির
মস্তিষ্ক বিকৃতি হ'লো, অন্য জনে আজন্ম পাগল।
ইসমেনে। হায় রাজা কী ক'রে জানবে তুমি দুঃখীর হৃদয় ?
দুঃসময়ে সকলেই জন্মের স্থিরতা ভুলে যায়।
ক্রেয়োন। কুমন্ত্রণা নিতে গিয়ে তুমিও স্থিরতা ভুলেছিলে।
ইসমেনে। মোর বোন আন্তিগোনে, তাকে ছেড়ে কী ক'রে বাঁচবো ?
ক্রেয়োন। 'মোর বোন', 'আন্তিগোনে'—আর কেন এই সব বলো ?
আন্তিগোনের প্রাণ মৃতের ভিতরে গণ্য করো।
ইসমেনে। ও যে আপনার ভাবী পুত্রবধূ ভুলেছেন সে কি ?
ক্রেয়োন। রাজকুমারের জন্য কুমারীপ্রান্তর ঢের আছে।
ইসমেনে। মনে-প্রাণে তারা কেউ কুমারের বাগ্‌দত্তা নয়।
ক্রেয়োন। রাজকুমারের জন্য নষ্ট নারী কখনো চাই না।
আন্তিগোনে। এই কি তোমার পিতা ? আইমোন, দয়িত আমার।
ক্রেয়োন। দয়িত তোমার ! তুমি প্রিয়া তার। বোলো না, বোলো না।
ইসমেনে। হায়, নিজ সন্তানের ঘরনীরে নিতে চাও ছিঁড়ে
তার বাহুডোর হ'তে।

ক্রেয়োন। কী করি, কৃতান্ত তাই চায়।
সূত্রধার। মৃত্যুই সাব্যস্ত তার? এর কোনো নড়চড় নেই?
ক্রেয়োন। গত্যন্তর নেই, জানি সকলের সমর্থন পাবো।
রক্ষীদল, নিয়ে যাও দু-বোনেরে অন্তঃপুরে, ওরা
যেন বোঝে নারীর এলাকা শুধু অন্দরমহল,
কী সাহস! দুঃসাহসী এ-জীবনে দেখেছি অনেক,
তারাও সাহস ভোলে দুয়ারে মৃত্যুর করাঘাতে।

[রক্ষীদলের সঙ্গে আন্তিগোনে ও ইসমেনের প্রস্থান]

সংস্তব গান

স্থায়ী : এক

সুখী সে-মানুষ নিষ্পাপ রহে জীবনপাত্র যার;
যদি-বা দৈব দুগ্রহ নামে কারো ভবনের মাঝে
তবে সে-ই নয়, ডুবে যায় তার সমস্ত সংসার,
থ্রেসের বাতাস অভিসম্পাতে কালভৈরবী নাচে,
কীর্তিনাশিনী সমুদ্র করে সহাস্য হাহাকার,
কলঙ্করেখা তীরের নয়ানে, কালো তরঙ্গ যাচে
পাতকের ফল কূলে-কূলে অনিবার,
পঙ্কিল স্রোত থামে না যে, থামে না যে,
পারাবার জুড়ে ঘুরে চলে পাপ, নাশ করে পরিবার।

অন্তরা : এক

রাজবৃত্তের দুর্গতি সেই ঘটেছিলো পুরাকালে,
লাবদাস-কুল দূষিতদর্পে ভেসে গেলো কোনখানে,
কত যে পুরুষ হারালো পাতকী প্রাক্-পুরুষের জালে,
বিধাতা বিরূপ, কে তবে তাদের ফেরাবে আলোর পানে?
তারপরে এলো ঈদিপাস, তারি রক্তবিষের টানে

ছুটে চলে ঘুণ শিকড়ের সন্ধানে,
ভাগ্যদেবতা দুর্ভেদ ধূলি জমালো সাঁঝ-সকালে,
ঘুণ ধ'রে গেলো শেষের সজীব ডালে
দর্পিত বাণী সে বড়ো ভীষণ প্রহসন ডেকে আনে।

স্থায়ী : দুই

দ্যাম্পিতা, তব বিভূতির পাশে মানব অহমিকার,
বৃথা বিক্রম সার।
সর্ব আবরি' সুষুপ্তি রয়, সে জানে মায়াপ্রপঞ্চ,
তোমার সমীপে সে তবুও মানে হার,
শ্রান্তিবিহীন চন্দ্রকিরণ সেও তো অকিঞ্চন,
পূর্বাচলের স্বর্গ শিখরমঞ্চ
ঐ যে অলিম্পাস,
তারি 'পরে তব চিরকালজয়ী স্বর্ণ-সিংহাসন,
তুমি যে অতীত বর্তমানের ভবিষ্য উদ্ভাস,
মর্ত্যমানুষ যেন কোনোদিন করে না দুরভিলাষ,
অসত্য তব রাজার দণ্ড অনন্ত সনাতন।

অন্তরা : দুই

কোনো মানুষের আশাতীত আশা সন্তোষ দেয় তারে,
অন্ধ বাসনা কারো-বা জীবন ভেঙে দেয় একেবারে,
বহ্নিরঙ্গে নিঃশঙ্কায় পতঙ্গ যায় ভেসে,
একদিন, তবু একদিন অবশেষে
তার সারা পথ জ্বলে-জ্ব'লে যায় অগ্নি-অঙ্গীকারে।
বিজ্ঞবচন শ্রবণে পশেছে এসে:
শ্রেয়োবেশ যদি পরে কোনো অপরাধী,
সে তবে আত্মঘাতী,

পরিণামে নেভে তার ভরসার বাতি,
আর্জ সে দাঁড়ায় একমুহূর্ত, পায় না ভবিষ্যৎ,
আর তার পরে নিয়তির হাতে প'ড়ে যায় নিঃসাড়ে।

সূত্রধার। মহারাজ, ঐ যুবরাজ আইমোন,
বংশপ্রদীপ একা শুধু যুবরাজ,
আন্তিগোনেরে দিয়েছেন আয়ু, মন—
হতাশ হৃদয়ে এসেছেন বুঝি আজ।

[আইমোনের প্রবেশ

ক্রেয়োন। চাক্ষুষ দেখি কী ঘটে, যার কাছে নীরব জ্যোতিষী;
কুমার, বোধ হয় তুমি ইতিমধ্যে সমস্ত জেনেছো,
মৃত্যুদণ্ডে অভিযুক্ত তোমার দয়িতা একটিকে,
অন্যদিকে পিতার বিধান। বলো, কার পাশে যাবে?
মতভেদ হোক, পিতা পিতা, পুত্র পুত্র, তাই নয়?

আইমোন। পিতা আজো পিতা, আমি আপনার সন্তান এখনো!
কোন পথে যেতে হবে আপনি সে-পথের নিশানা,
বিবাহ আমার কাছে আপনার নির্দেশের চেয়ে
বড়ো নয়, জীবন সত্যের চেয়ে মহত্তর নয়।

ক্রেয়োন। ওরে, আমি পুত্রগর্বে গর্বিত। এ যেন হয় তোর
সত্য পরিচয়, তোর অকম্পিত পিতৃপরিচয়;
দুঃসময়ে রইবি ছায়ার মতো কান্ত সুকুমার,
না হ'লে মানুষ আর অন্য কী কারণে পুত্র চায়?
কারণ পিতার শত্রু তার শত্রু হবে, পিতৃসখা
তার সখা হবে, শত্রুনাশ আর মিত্রসহায়তা
একমাত্র সত্য হবে। কিন্তু যেই অযোগ্য সন্তান
নিছক আগাছা শুধু, পিতার সে দুঃখের আকর,
শত্রুরও সে চাপা হাসি আর উপহাসের কারণ।

কখনো ভুলেও তুমি স্থির বুদ্ধি বিকিয়ে দিয়ো না
মায়াবিনী কামিনীর পায়ে, সে যে মিথ্যা নারী, তার
আশ্লেষে কিছুই নেই, বিশ্বাসের সুযোগে সে ঘর
ভাঙে তলে-তলে পলে-পলে, শয্যা ম্লান ক'রে তোলে।
জীবনসঙ্গিনী সে কি হবে শুধু ঠুনকো খেলনা?
ঠুনকো খেলনা কোন কাজে লাগে? ফেলে দাও তাকে।
ছেড়ে দাও তাকে, বেছে নিতে দাও কবরের নিচে
আত্মীয় সুপাত্র কোনো। এই নগরের সুস্থ বায়ু
বিষিয়েছে বিশ্বাসঘাতিনী এই বিষকন্যা; আমি
বিশ্বাস ভাঙিনি, ওকে হত্যা করা হোক, এই মর্মে
আদেশ দিয়েছি, প্রাণদণ্ড রদ করা অসম্ভব।
কেননা আমার ঘরে গৃহশত্রু ত্রাণ পায় যদি,
তবে কি আমারে সাজে অন্য ঘরে অন্যায়দমন।
যে তার আপন ঘরে ন্যায়দণ্ড ধরে, সেইজন
সারা রাজ্যে বিশ্বাসভাজন। যারা স্বৈরাচারী, তারা
বর্জনীয়, রাজকার্য রাজাকে শেখাতে যায় যারা,
বর্জনীয় তারা। যে যেখানে আছে রাজকর্মচারী
বিনাবাক্যব্যয়ে হবে সকলেই রাজাজ্ঞায় নত।
আদর্শ প্রজাও তাকে বলা যায়। দুর্দিনে তাকেই
দেখবে সঙ্গীর পাশে, যুদ্ধক্ষেত্রে একমাত্র সে-ই
সবার নির্ভরযোগ্য। মানুষের যত পাপ আছে,
তার মধ্যে অবাধ্যতা চরম গর্হিত, অবাধ্যতা
ঘরকে বানায় মাটি, শক্ত রাজ্য বানায় শ্মশান,
অবাধ্যতা মিত্রপক্ষে ভয় আনে, শত্রুপক্ষে জয়,
অন্য দিকে অনুগত সরলতা রক্ষা করে কত
নিরীহ গৃহস্থ প্রাণী। ঘৃণ্য তাই শান্তিভঙ্গকারী।

নারী কিনা হবে পুরুষের দণ্ডমুণ্ডের মালিক ?
পুরুষ হবে কি শেষে নামমাত্র পুরুষমানুষ ?
এর চেয়ে লজ্জা নেই। আমি যেন পুরুষের হাতে
প'ড়ে যাই পথে, কোনো রমণীর ইচ্ছাসঞ্চালনে
আহত হওয়ার চেয়ে সে অনেক ভালো, সে অনেক
বরণীয়। আমায় বোলো না নারীনির্জিত বেচারি।

সূত্রধার। বয়সে, অভিজ্ঞতায় বৃদ্ধ আমি। আপনার কথা
সমীচীন, সুসংগত, এ-কথা আমার মনে হয়।

আইমোন। পিতৃদেব, মানুষের মনে দেবতারা যতগুলি
মানবিক অধিকার দিয়েছেন, যুক্তিশীলতাই
তার মধ্যে প্রথম, প্রধান। আপনার ত্রুটিচ্যুতি
আবিষ্কার আমার অনভিপ্রেত, সাধ্যেরও বাইরে ;
কিন্তু আপনার সন্তান হিশেবে আমার দায়িত্ব
অন্য-অন্য অভিমত অভিযোগ কার্যকলাপ
পুঙ্খানুপুঙ্খ লক্ষ্য ক'রে শেষে আপনার গোচরে
নিয়ে আসা, তা হয়তো আপনার কাজে আসতে পারে।
যে-কোনো লোকেরই কানে আপনার বিধান
ভীষণ ঠেকবে, তারও ব্যক্তিগত বক্তব্য কিছু বা
থাকতে পারে, যে-কথা বিষের মতো লাগবে আপনার।
মহারাজ, এ-পর্যন্ত যতদূর শুনেছি, বুঝেছি
সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া, একবাক্যে তারা
সবাই বলেছে : 'এ যে পাপহারা সুন্দর প্রতিমা,
করেছে পুণ্যের কাজ, মৃত্যু তাই সাজা হ'লো ওর ?
শিকারী কুকুর আর শকুনির আক্রমণ থেকে
সোদর ভাইকে ঢেকে রেখেছে সে, এই তার দোষ ?

লেখা যে উচিত ছিল ওর নাম সোনার অক্ষরে—
এই সব বলছে তারা অন্ধকারে অন্ধকার মুখে।
মহারাজ, আপনার সুনাম, আপনার সম্মান,
এ ছাড়া আমার কোনো স্পৃহণীয় ভোগ্য বস্তু নেই।
পিতার গৌরব সব সন্তানের মাথার মুকুট,
পুত্রের গৌরব তবে পিতার কিরীট বুঝি নয় ?
সুতরাং একবার যে-কথা সহসা উচ্চারিত,
বিবেচিত হোক আরো একবার, যে শুধু নিজেকে
কথায় ও কাজে একমাত্র স্থিতপ্রজ্ঞ ব'লে মানে,
সে অচিরে সর্বশূন্য হ'য়ে যায় কাজে ও কথায়,
তার বুকে নিজস্ব ব'লে যে আর কিছুই থাকে না।
প্রাজ্ঞ মানুষকে তাই নম্র হ'য়ে জেনে নিতে হয়,
এক গুরুগৃহে শিক্ষা নয় তো জীবন। বন্যা এলে
বন্যার্ত নদীর পাড়ে যে-গাছটা মাথা নত করে,
তার পাতা ঠিক থাকে, আর যে-গাছটা একরোখা,
বানের কুটিল জল গুঁড়িসুদ্ধ নিয়ে যায় তাকে।
ক্ষুব্ধ সমুদ্রের জলে যে-নাবিক জাহাজের পাল
টান-টান ক'রে রাখে, খানখান করে সে জাহাজ।
প্রশমিত হোন, মহারাজ, আমি তরুণ হ'লেও
হয়তো নির্বোধ নই। অমোঘ প্রজ্ঞার প্রবীণতা
কোথাও থাকতো যদি, ভালো হ'তো, কিন্তু তা বিরল।
সুতরাং, এর পরে, সৎপরামর্শ নেওয়া ভালো।

সূত্রধার। রাজন ক্রেয়োন, ওঁর কথাগুলি যুক্তিপূর্ণ,
যুবরাজ আইমোন, রাজার কথাও তুচ্ছ নয়।

ক্রেয়োন। প্রৌঢ় মানুষেরা তবে অপ্রাপ্তবয়স্কের কাছে
হাতে খড়ি নিতে যাবে প্রাথমিক শিশুবিদ্যালয়ে ?

আইমোন। কে শিক্ষক, তার চেয়ে শিক্ষা আরো বেশি মূল্যবান,
বয়সের প্রশ্ন নয়, সত্যই তো বয়স্ক বিষয়।
ক্রেয়োন। দুর্বৃত্তের অসম্ভ্রম—সে কি তার সত্যানুমোদিত?
আইমোন। দুর্বৃত্তের কাছে শ্রদ্ধা চাওয়া ভুল, আমি মনে করি।
ক্রেয়োন। ধৃত নারীটিকে তবে 'দুঃশীলা' বলাই সুসংগত।
আইমোন। থেবাই জনতা এই আখ্যা শুনলে শিউরে উঠবে।
ক্রেয়োন। থেবাই মাত্রই বুঝি আইনপরিষদের সদস্য?
আইমোন। যারা শুধু সদ্যযুবা এ-কথা তাদেরই মুখে সাজে।
ক্রেয়োন। আমি রাজা, কাউকে জবানবন্দী দিতে পারবো না।
আইমোন। যে-নগরে একজন বাস করে, নগর তা নয়।
ক্রেয়োন। একজন রাজা, একাধিক রাজদণ্ড হ'তেই পারে না।
আইমোন। এমন রাজাকে সাজে কোনো জনহীন জনপদে।
ক্রেয়োন। এ যে দেখি নারীত্রাতা নরোত্তম—বিচিত্র ব্যাপার!
আইমোন। আপনি কি নারী? তবে আমি তো নিশ্চয় নারীত্রাতা।
ক্রেয়োন। পিতার বিরুদ্ধে তুমি মুখ তোলো? মূর্খ নরাধম!
আইমোন। সত্যের বিরুদ্ধে পাপ আরো পাপ—অসত্যপূজারি!
ক্রেয়োন। অসত্যপূজারি আমি? অসত্য আমার রাজাসন?
আইমোন। যদি তা অগ্রাহ্য করে ঈশ্বরের প্রাপ্য সম্মান।
ক্রেয়োন। নারীর ভিখারি, তোর কথা শুনতে প্রবৃত্তি হয় না।
আইমোন। কিছুই তো করিনি যে লজ্জিত কি অপদস্থ হবো।
ক্রেয়োন। নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে তুমি মেয়েটির আয়ুভিক্ষা করো!
আইমোন। আপনার, আমার, তার, পুণ্য পারলৌকিক ক্রিয়ার।
ক্রেয়োন। যথেষ্ট হয়েছে, থামো। সে তোমার ঘরনী হবে না।
আইমোন। অন্তত সে একা-একা মরবে না, বলাই বাহুল্য।
ক্রেয়োন। ভয়-ডর নেই, উল্টে কিনা ভয় দেখাও আমাকে?
আইমোন। ভয় দেখানোর সঙ্গে ভুল ধরা এক কথা হ'লো?

ক্রেয়োন। হা অপরিণামদর্শী, মরবি অদূর ভবিষ্যতে।
আইমোন। পিতা যদি না হতেন, বলতাম আপনি উন্মাদ।
ক্রেয়োন। নারীর করুণাজীবী, পিতা তোর কৌতুকভাজন?
আইমোন। শুধু কথা বলবেন, কর্ণপাত করলে কী দোষ?
ক্রেয়োন। তাই বুঝি? ঊর্ধ্বে রন অলিম্পাস, তাঁর নামে বলি,
তোমার বিদ্রূপ নিয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাকবো না,
কে আছো, এখনি যাও সেই ডাকিনীকে নিয়ে এসো,
তার পালা শেষ হোক প্রেমিকের চোখের উপর।
আইমোন। আমার চোখের 'পরে? অসম্ভব। আমার সামনে
তার শেষ হবে? অসম্ভব। তবে শুনুন, আপনি
আমৃত্যু কখনো আর আমাকে দেখতে পাবেন না,
আর যারা আপনার সহচর, তাদের ধিক্কার।

[আইমোনের প্রস্থান]

সূত্রধার। রাগে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য উনি গেলেন কোথায়?
অল্প বয়সের ক্রোধ, মহারাজ, অতি ভয়ংকর।
ক্রেয়োন। যেতে দিন। যতো ইচ্ছা ফোটাক না আকাশকুসুম,
স্বপ্নান্ধ বাঁচাতে তবু পারবে না সে-দুটি মেয়েকে।
সূত্রধার। দুটি মেয়ে? মহারাজ, একসঙ্গে মরবে দু'জনা?
ক্রেয়োন। ঠিক বটে, যে-মেয়েটি মৃতদেহ ছোঁয়নি, মুক্ত সে।
সূত্রধার। অন্য মেয়েটিকে কোন প্রণালীতে হত্যা করা হবে?
ক্রেয়োন। সে এক মানবশূন্য দেশান্তরে পাহাড়গুহায়
তাকে বন্ধ রাখা হবে, শুধুমাত্র প্রাণধারণের
প্রায়শ্চিত্তপালনের উপযোগী খাদ্য দেয়া হবে,
এ-রাজ্য রক্তের দোষ থেকে তবে পরিত্রাণ পাবে,
সেখানে আছেন ওর পরমশ্রদ্ধেয় হাইদাস্,
পাতালবিধাতা। তিনি দয়া যদি করেন, ভালোই;

নচেৎ, কী আর করা, সেখানে বুঝুক তিলে-তিলে
মরা মানুষকে অতো শ্রদ্ধা করা নিতান্ত নিষ্ফল।

সংস্তব
স্থায়ী

অতনু এরোস্, দারুণ তোমার খেলা,
রণজয়রব দিকে-দিকে শুনি তব,
নিদ্রানিলীনা নারীর কপোলে কাঁপো যে রাত্রিবেলা,
সিন্ধু অটবি প্রান্তরে ওগো ত্রিভুবনবল্লভ।
উন্মত্তেরে আরো করো তুমি উদ্দাম অভিনব,
তব পদতলে মর্ত্যমানবমেলা,
দেবতার বৈভবও॥

অন্তরা

শ্রেয় যে মানুষ তারে তুমি করো প্রেয়,
তার গৌরব ঝ'রে যায় ধরণীতে,
কলহনিপুণ ওগো তুমি দুর্জ্জেয়
আনন্দ পাও স্বজনদ্বন্দ্বশোণিতে।
যে-প্রদীপ জ্বলে প্রিয়ার আঁখিতে, আকাঙ্ক্ষা হ'য়ে সে-ও
পারে সব-কিছু আগুনে পুড়িয়ে দিতে।
সতীর শিথানে রতিশাশ্বতী জাগরী আক্রোদিতে॥

[দরজা খুলল। প্রহরীরা আন্তিগোনেকে মহল থেকে মহল পার ক'রে সমাধির দিকে যাবার পথে]

সূত্রধার। দুই চোখে ওরে আর কতো দেখা যায়,
দৃষ্টিতে আমি সহিতে পারি না আর,
ঝর্না নেমেছে বেদনায়-বেদনায়,
আন্তিগোনে যে চ'লে যাবে পরপার—
গাঢ় সুপ্তির রাত্রিবাসরে তার।

এক-জানালা রাত্রি আমার

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

এক-জানালা রাত্রি আমার কাটল কেমন ক'রে;
মোগলসরাই প্যাসেঞ্জারে বৃষ্টি নামল তোড়ে।
বৃষ্টি নামল, ভীরু ধানখেত ভালোবাসার মতো,
আলের পথে আলের পথ আলিঙ্গনরত।

এক-জানালা রাত্রি আমার কাটল কেমন ক'রে,
বৃষ্টি থামল, সাঁকোর তলায় এই পৃথিবী ক্রোড়ে
মা জননী ব'সে আছেন, চোখের সামনে খালি
শহরে কাজ নিতে পালায় বলাই বনমালী।

বলাই বনমালী সুবল শ্রীদাম সুদাম শেষে
রমেন নরেন পরেশ হ'লো শহর ভালোবেসে।
মধ্যমগ্রাম হালিশহর রামপ্রসাদী সোনা
চুরির ভয়ে আব্‌জে নিল চব্বিশ পরগণা।
'মা গো, ভীষণ ঘুম পেয়েছে, আমায় রক্ষা করো,
বলতে বলতে সামলে নিলাম, আকাশ জড়োসড়ো,
আকাশ আমার বুকের নিচে মাথা গুঁজবার আশায়
জড়ো হ'লো। কে আর তবু একভিড় লোক হাসায়?
দু-হাত থেকে ছিটকে গেলো কাঁপা হাতের কুপি,
চোখ-ধাঁধাঁনো আলো ছুঁড়লো কে এক বহুরূপী,
এক আলালের ঘরের দুলাল গাড়ির মধ্যে জেগে
বাংলাদেশের পাতা ছিঁড়লো ভূগোলের বই থেকে॥

দুটি কবিতা

পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচা

তোমার বাতাস

মন্ত্রের মতন তুমি ধীরোদাত্ত, স্থির।
দূরত্বই তোমার নিয়ম।
একটি ঢিলের মতো বর্তুল চক্কর
আকাশের অদৃশ্য দেয়ালে প্রতিহত।

তবুও সতত ছুঁয়ে তোমার বাতাস।

শেলফ খালি, বইগুলো ছড়ানো টেবিলে।
ফুলদানিটা গেলো যে কোথায়?
মেঝেময় ধুলোর পত্তন।
চেনা যায় না এই ঘর সেই ঘর কিনা!
সময়ের স্নেহহীন শাসন কুন্তলে।

কেবল সতত ছুঁয়ে তোমার বাতাস।

একটি আবিষ্কার

'হলুদ বিকাল, পাণ্ডাশ সকাল!'

'ও কিছুই নয় বয়সের দোষ:
সূক্ষ্ম দুঃখ, মিহি শোকতাপ
উড়ুক্কু মন, উষ্ণ দৃষ্টি,
কেটে যাবে কালে বোহেমীয় ভাব।
ও কিছুই নয়।

'এসো বাৎলাই সহজ দাওয়াই:
ধ'রে বেঁধে দাও বাঁধের জোয়াল,
ধর্মের ষাঁড় মানবেই ঘাট,
বাছুরে ভরবে বাছার গোয়াল।
সহজ দাওয়াই।'

ছিদ্রান্বেষী, অতি সুদক্ষ
পিতৃবন্ধু তীক্ষ্ণ শায়ক
ছুঁড়লেন, তাঁর অমোঘ লক্ষ্য।
অজ্ঞাতে হাসে গুপ্ত নায়ক।
অমোঘ লক্ষ্য।

বাতাসে ধুলোর জীবাণুপুঞ্জ,
আকাশের নীল পেয়ালা শূন্য,
সূর্য সে যেন কামলায় ভোগে
নীরক্ত দিন বিবিক্ত শোকে।
নীরক্ত দিন।

কালো বোরখায় মুখ ঢেকে রাত
যখন দাঁড়ায় জানলার পাশে,
সতিন-জালায় জ্বলে মিটমিট
জোনাকির বুক গাছে, ঝোপে, ঘাসে।
জোনাকির বুক।

কালপুরুষেরা নিচে চেয়ে ছাখে,
অপলক জেগে তখনও যুবক,
তার মুখে চোখে কুয়াশার ধোঁয়া
তার কালো চুলে দ্রাবিড় কুহক।
দ্রাবিড় কুহক।

রক্তের ঝুল মাকড়সা-জাল,
হলুদ বিকাল, পাঙাশ সকাল।

ভাসিত জন্ম : অনিন্দিত মৃত্যু

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

কাচের আধারে ডুবে ঘুমোয় যমজ শিশু ছুটি,
পৃথিবীতে আসবার মাঝপথে পেয়ে গেছে অন্তহীন ছুটি॥

অপার রহস্য-ঘেরা অন্ধকার এখনো ছু'চোখে
আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি পাবার আগেই অবসাদ
নেমেছে নিঝুম প্রাণে, ছুটি সুস্থ প্রসন্ন প্রমাদ
ফর্সেপ্‌স্‌-শীতল হ'য়ে ফর্মালিনে শুয়ে আছে সুখে।

লোশনে ডোবানো হাত সার্জনের স্থির চোখে কেঁপেছিল বিস্ময়ের ঢেউ
বিচক্ষণ বিশ্লেষণে মর্মস্পর্শী ক্লান্ত অনুভব,
কোন ধ্রুব জিজ্ঞাসার বিচলিত শিক্ষার্থীরা এসেছিল কাছে কেউ-কেউ
নির্জন টেবিল ঘিরে অন্তরঙ্গ শোকের উৎসব।

আসঙ্গ তৃপ্তির নগ্ন নির্বাপিত পরিণতি নিয়ে
আস্বচ্ছ কাচের ভাঁড়ে শুয়ে আছে অনেক বৎসর,
মাতৃস্তন্য পিতৃস্নেহ আলো হাওয়া দৃশ্য গন্ধ গান ফাঁকি দিয়ে
পরিপূর্ণ পিপাসার পৃথিবীকে চোখ মেলে দেখবার নেই অবসর।

আলোর আরক্ত ঠোঁটে অন্ধকার একটি চুম্বনে
অনিঃশেষ পরমায়ু রেখে গেছে জ্যোতির্ময় ক্ষণে॥

হঠাৎ কথনো এসে এই ঘরে বিস্মিত কুমারী
একরাশ প্রশ্ন বুকে টেবিলের সামনে দাঁড়াবে,
বেদনার রক্তপদ্ম বুকে নিয়ে সমাহিত নারী

নিজেরই রক্তের স্রোতে শান্ত এক সদুত্তর পাবে।
সৃষ্টির বেদনা তাকে সংগোপনে করবে মাতাল
দু'চোখে কাঁপবে তার দুপুরের ম্লান হাসপাতাল ॥

কোন প্রাজ্ঞ শল্যবিদ আজ থেকে শতবর্ষ পরে
অবিরাম অধ্যয়নে মন্ত্রমুগ্ধ শরীরসন্ধানী
উন্মোচিত রহস্যকে খুঁজে পাবে আশ্চর্যের বীক্ষণ-আগারে,
চৈতন্যের অন্ধকারে উদ্ভাসিত আগ্নেয় সরণি।

নীরব নিশ্চিন্ত মনে আরকে ঘুমোয় দুটি শিশু।
অকাল-সমাধিমগ্ন সম্ভাবিত বুদ্ধ কিংবা যীশু ॥

লের পুরাণ (অংশ)

থাল-রমণীর মনে আত্মহত্যার সংকল্প কী ভাবে উদিত হ'লো

জ্যোতির্ময় দত্ত

সে দেখলো
দেহের ভিতরে আরো দেহ, বিজাতীয়।
কথনো যথন হয় জলপূর্ণ শ্রাবণ-রজনী
ডুবে যায় মুখর পৃথিবীর বিপুল স্থিতিও

শুধু দূরে-দূরে কয়েকটি স্তম্ভিত লণ্ঠন
ভেসে থাকে ডুবে-যাওয়া জাহাজের বিষণ্ণ মাস্তুলের মতো,
তথন যেমন বহু-রোগে শীর্ণ, বৃষ্টির শব্দে অর্ধনিদ্রিত,
কোনো একদা-উদ্ধত যুবক
তন্দ্রার মধ্যে শোনে নিজের হৃদয়স্পন্দন,

ভাবে সে তো মৃত, শূন্য ঘরে বুঝি অন্য কেউ
ভুল ক'রে এসে থমকে দাঁড়িয়ে আছে বিছানার পাশে,
তেমনি সেই কন্যার অন্ত্রে আর ধমনিতে, ফুসফুসে,
তার নিজস্ব নিশ্বাসে যেন কোনো স্বতন্ত্র প্রাণীর জীবন।
তার রক্তে প্রাক্-মানুষের আদিম কান্নার ঢেউ

ডাকে যেমন নিশীথের দূরগামী ট্রেনে
ঘুমন্ত নতুন দম্পতির মনে
যদিও ঘুম বিস্মৃতি আনে, অন্তর্জ্ঞানে
বিরামহীন এঞ্জিনের ধ্বনি
পরিস্রুত হ'য়ে মনে হয়, এঞ্জিন নয়, গত উৎসব-রজনী

এঞ্জিনের ধমনিতে মুখর হয়েছে। এতক্ষণে
সন্ধ্যা হ'লো, মেঘের কানায় আলোর কারুকার্য
যেন এক রঙিন মাছির ডানা অণুবীক্ষণে।
সে এসে দাঁড়ালো জলের ধারে। যন্ত্রণার অতি-দাহ
ইন্ধন তার সেই কোমল শরীর। তখন দেখলো

তিনটি রাজহংসী আর তরঙ্গহীন জল। জলের স্তন্যপানে
প্রাণীশিশুরা ভোলে নিঃসঙ্গের জ্বালা; জলের আদিম মায়া
নেশাঘোর চোখে এককে দুই করে। জলমগ্ন তিনটি অস্পষ্ট ছায়া
আর তিনটি রাজহংসী তাদের জলপূর্ণ, আচ্ছন্ন প্রাণে
পরস্পরকে অসংখ্য চুম্বন করে, নীল জলে

আকণ্ঠ ডুবিয়ে। আত্মার ভেদ ঘুচে গেলে
জলের গভীরতম ঘন নীলে
নিজেদের ছায়া ছাখে হংসীদের নিমগ্ন আত্মারা,
জলের অদ্ভুত সম্মোহ
এনে দেয় দেহের ওপারে আরো দেহ।

গুমোট বাতাসের স্তব্ধ জলার
মধ্য থেকে অন্ধকার মেঘের পাহাড়
আদিকালের অতিকায় স্থূল এক জলজন্তুর মতো
উঠে আসে। সমস্ত পৃথিবী আকাশ
ডুবিয়ে রাখে অবদ্রবে রাসায়নিক রাতের বাতাস

বাতাসের কিমিয়ায় গ'লে
বায়ু আর মেঘের বদলে
কোনো এক বিশুদ্ধ ধাতুর মতো
জলার স্তব্ধ আরশিতে
অন্ধকার অবনত।

দুটি কবিতা

নবনীতা দেব

আদি-অন্ত

আমি ছাড়া তোমার আর কে আছে? সে বললো, নীল আকাশ। আকাশ ছাড়া তোমার আর কে আছে? সে বললো, সবুজ ধান। ধান ছাড়া তোমার আর কে আছে? গেরুয়া নদী। নদীর পরে? পঞ্চবটী। পঞ্চবটী ছাড়া? সোনালি হরিণ। হরিণের পরে? ঝড়। ঝড় ছাড়া তোমার আর কে আছে? কালো মাটি। কালো মাটির পরে? তুমি আছো।

আরোগ্য

শুধু তুমি সুস্থ হবে।
আমি দিয়ে দেবো আমার কোজাগরীর চাঁদ
শাদা দেয়ালের ময়ূরকণ্ঠী আলো
দিয়ে দেবো গতবছরের মরা পাখির মমতা
আর আগামী বছরের কলাগাছটির স্বপ্ন।

চ'লে যেতে-যেতে সবাই তা-ই ব'লে গেল।

কুন্তী নদীর গেরুয়া জল তার সবুজ-ছায়া-কাঁপা ঠাণ্ডা গলায়
আমাকে বলেছে
শুকনো সোনালি গোরুর গাড়িগুলো
ক্লান্ত কাদাটে গলায় আমাকে বলেছে
শেষ হেমন্তের বুড়ো সবুজ পাতারা
আসন্ন মৃত্যুর খসখসে গলায় বলেছে
তুমি সুস্থ হ'লেই ওরা আবার ফিরবে।

এমন কি
যে-প্রদীপটি ধ'রে তুমি আমার মুখ দেখেছো
তাকেও ভাসিয়ে দিয়ে
একটি শুভ্র স্তব হ'য়ে জ্বলবো তোমার শিয়রে
আসুক, ওরা ফিরে আসুক, যারা চিরকাল
শুধুই চ'লে যাচ্ছে, এখান থেকে অন্য কোনোখানে

উৎপাটিত একগুচ্ছ কচি সবুজ দূর্বার মতো
তুচ্ছ উষ্ণ কাতর
আমি তোমার যন্ত্রণা মুছে নেবো
তার বদলে, ঈশ্বর, তার বদলে আসুক
তোমার কাঙ্ক্ষিত আরোগ্য।

নগরী

রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধু

বাড়ি
ওঠে
হৃদয়ে আমার,
ধূপ-শাদা একরাশ সুগন্ধের মতো।
যেন শান্ত নীল ফুল অসুস্থ শিয়রে ;
উজ্জ্বল রুপোর পাত্রে সোনালি আঙুর ;
গোলাঘরে বছরের দু-তিনশো হন্দর সচ্ছলতা।
এত বিষ হাওয়ায়-হাওয়ায়,
বাড়ি
তবু ছিলো একদিন আমারও কোথাও,
যে-নির্মল উৎস ঘিরে উড়েছিলো পাখি।

ওঠে
ভাঙে
স্বপ্নের সন্ধ্যায়।
সুন্দরীর গুচ্ছ আসে—
নেকড়ের মতো ঔদরিক
হাসে
সপ্রলাপ ক্ষিপ্র হাতে
বুকের কাঁচুলি খুলে হিংস্র হ'য়ে যায়।
(স্ফটিকের মতো এক নারী,
আমার সমস্ত আয়ু ন্যস্ত যার কাছে।)
আলতা ঝরে পায়ে-পায়ে, ঘাগরা ঘুরে চলে,
সাপ ফোঁসে নূপুরের বোলে—
এ-হৃদয় রক্ত হ'য়ে যায়।

সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বালক-বয়সে, ইশকুলের প্রয়োজনে, একটি প্রবন্ধসংকলন পড়তে হয়েছিলো, যে-গ্রন্থে প্রবন্ধকার সনেট সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে একজন বিদেশী সমালোচকের উক্তি উদ্ধার করেছিলেন, যা এই রকম: সবেগ সঞ্চরণ ও ঘূর্ণনের জন্য চাতকপাখির ডানায় প্রকৃতির যে-কারুকার্য দেখা যায়, চিলের বা অ্যালবাট্রসের পাখায় ঠিক তেমনটি নেই ; এই শেষোক্ত পাখিদের জীবনযাত্রায় একটানা অনেকক্ষণের জন্য আকাশে ভেসে থাকবার প্রয়োজন হয়, তাই তাদের ডানায় প্রকৃতি আরেক রকম শক্তি দিয়েছেন। সব পাখির ডানা এক রকম নয়, কারণ সব পাখির প্রয়োজন এক রকম নয়। সনেটের আঁটো গড়ন অন্য অনেক রকম গীতিকবিতার মতো নয়, তার নিজের প্রয়োজনেই অষ্টকের উচ্ছ্বাস ষট্‌কের অবরোহণে সম্পূর্ণ করতে হয়: এই দুই অংশের অন্তর্লীন ঐক্য সত্ত্বেও এরা পরস্পরবিচ্ছিন্ন।

এই উক্তি থেকে এইটেই বোঝা যায় যে, সনেটে অষ্টক ও ষট্‌কের বিচ্ছিন্নতা থাকবেই। থিঅডর ওঅটস-ডানটন যখন বলেন, 'সনেট হচ্ছে গীতলতার এক তরঙ্গ, প্রবল এবং শৃঙ্খলিত ; সংরক্ত আত্মার মধ্য থেকে উথলে-ওঠা ফেঁপে-ওঠা জলরাশির এক—এক এবং সম্পূর্ণ—জোয়ার-সংগীত ভেসে যায় অষ্টকে, তারপর ফেরে স্বাধীন, এর টান প্রক্ষালিত করে ষট্‌ক আর গড়িয়ে এসে পুনরায় পড়ে জীবনের গভীর ও তুমুল সমুদ্রে'—তখনও তাতে নির্বিচারে অষ্টক ও ষট্‌কের ভেদ মেনে নেয়া হয়। কিন্তু এ-ধরনের মতামত যে ভ্রান্ত তা, অন্য অনেক কবিকে বাদ দিয়ে, কেবল মিল্টন, শেক্সপীয়র, বোদলেয়ার ও রিলকের সনেট পড়লেই বোঝা যায় ; এবং এমন সনেটও আছে—শুধু ফরাশিতেই নয়, প্রায় সর্ব ভাষার আধুনিক কবিতাতেই—যেখানে ষট্‌ক

সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ: জগদীশ ভট্টাচার্য ॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স, ছয় টাকা

যদি বা থাকে, তা অনেক সময় অষ্টকের আগে এসে বসে, পেত্রার্কার অবিচল নিয়মকে লঙ্ঘন ক'রে।

আমি ব্যক্তিগতভাবে এই অষ্টক-ষট্কের পার্থক্য মানতে রাজি নই, কেননা তা মেনে নিলে আমার বিশেষ প্রিয় অনেক সনেট—শেক্সপীয়র, বোদলেয়ার বা রিলকের সনেটগুচ্ছ—তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং কারিগরি নিয়ে দাঁড়াতে পারে না। সেই কারণেই অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যের মূল্যবান গ্রন্থটি আমাকে প্রথম দর্শনেই আকর্ষণ করেছিলো তার নামকরণ দ্বারা: 'সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ'। মধুসূদন যদিও আদিম ইতালীয় রূপ মেনে কতিপয় সনেট রচনা করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ 'কড়ি ও কোমল' ব্যতিরেকে অন্য কোথাও বোধ হয় 'বিশুদ্ধ' ইতালীয় সনেট রচনা করেননি, এমনকি প্রথম বয়সের সেই কবিতাবলিতেই 'কৌলীন্যচ্যুতির লক্ষণ পরিস্ফুট' হ'য়ে উঠেছিলো। আর 'কড়ি ও কোমল' নিয়ে আর যা-ই হোক রবীন্দ্রনাথের কবিতার কোনো আলোচনাই যেহেতু হ'তে পারে না, সেই হেতু অধ্যাপক ভট্টাচার্যের গ্রন্থে পেত্রার্কার গোত্রচ্যুত রবীন্দ্রনাথকে স্বীকার ক'রে নেয়ার দরুণ আমি যথার্থই উৎসাহিত হয়েছিলাম। প্রতীচীজাত একটি রূপকল্প বিষয়ে বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম বই ব'লেও এই গ্রন্থ আমার সম্ভ্রম জাগিয়েছিলো। কেননা এর আগে সনেট নিয়ে বাংলা ভাষায় যে-সব আলোচনা হয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য এই তিনটি: প্রিয়নাথ সেন-কৃত প্রমথ চৌধুরীর 'সনেট পঞ্চাশৎ'-এর আলোচনা, বুদ্ধদেব বসু-রচিত 'কল্লোলে' প্রকাশিত—অধুনালুপ্ত—একটি সন্দর্ভ, মোহিতলাল মজুমদারের ছন্দ-বিষয়ক আলোচনা-গ্রন্থের 'সনেট' শীর্ষক নিবন্ধ। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু অধুনা নিশ্চয়ই সেই বাল্যবয়সে রচিত প্রবন্ধের রচনাস্বত্ব স্বীকার করবেন না (অন্তত কোনো গ্রন্থে স্থান না-দিয়ে তিনি সেটাকে প্রায় অস্বীকার করেছেন), আর প্রিয়নাথ সেনের প্রবন্ধটিও পাঠ্যপুস্তকে ছাড়া দুষ্প্রাপ্য। এবং মোহিতলালের সন্দর্ভটি সেই কৌলীন্যপ্রথারই পক্ষপাতী, যা ওঅটস-ডানটন-কৃত তরঙ্গতত্ত্বের বিরোধিতা করে না। এই রকম স্থলে আলোচ্য গ্রন্থটি আমাদের পক্ষে

উপকারী তো বটেই, উপরন্তু একটি প্রথম প্রচেষ্টার মর্যাদাও দাবি করতে পারে।

কিন্তু অধ্যাপক ভট্টাচার্যও গ্রন্থারম্ভে (এবং প্রথম অধ্যায়ে) জানিয়েছেন যে, শেক্সপীয়রের সনেটগুলি সনেট নয়, সনেটকল্প, এবং কবিতা হিশেবে সেগুলি নিম্নস্তরের*, কেননা তিনি কাব্যবিচারের মাপকাঠি হিশেবে 'পেত্রার্কান প্লেটনিজমে'র অনুরাগী। এই মাপকাঠি বিষয়ে আমি নীরব থাকতে চাই, কেননা কোনো দার্শনিক মতবাদ, না কবির মানসিক দ্বন্দ্ব ও চিত্তবৃত্তির বিবর্তন কাব্যবিচারের কষ্টিপাথর হবে—সে-বিষয়ে প্রচুর মতভেদ সম্ভব। কিন্তু শেক্সপীয়রের চতুর্দশপদী—পেত্রার্কার অনুগামী নয় ব'লেই—যদি সনেট ব'লে স্বীকার্য না-হয়, তাহ'লে সনেটলেখকের তালিকা থেকে আর যে-সব নাম আমরা বাদ দিতে বাধ্য তার মধ্যে পড়েন গোতিয়ে ও বোদলেয়ার, র‍্যাঁবো ও মালার্মে, গেঅর্গে ও রিলকে। স্পষ্টত, সনেট বস্তুটিকে কেবলমাত্র পেত্রার্কার আদর্শে বিচার করা চলে না।

২

যে-পেত্রার্কাকে স্মরণে রেখে অধ্যাপক ভট্টাচার্য তৎবিহিত রূপকল্পবিহীন কবিতাকে সনেট বলতে রাজি নন, গ্রন্থকারের নিবেদনে তাঁর প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছেন: 'পেত্রার্কা শুধু ইতালীয় তথা য়ুরোপীয় নবজন্মেরই প্রাণপুরুষ নন, তিনি আধুনিক য়ুরোপীয় গীতিকাব্যেরও আদিপুরুষ।' এবং সনেট সম্পর্কে তাঁর মত: 'সনেট জাতিতে ইতালীয়, গোত্রে পেত্রার্কান' (পৃ: ১৫)।

---

* 'গীতিকবিতা হিসাবেও শেক্সপীয়ারের সনেটকল্প রচনাবলীর আমি উচ্চপ্রশংসা করতে পারিনি। পেত্রার্কান প্লেটোনিজমে অনুরাগী কাব্যরসিকের পক্ষে শেক্সপীরীয় বিবর্ধনবাদ এবং জৈবস্তরে অবনমিত প্রেয়সী-প্রণয়াসক্তির প্রশংসাপরায়ণ হওয়া দুঃসাধ্য।' (গ্রন্থকারের নিবেদন : পৃঃ দশ)

'বিষয়বন্ধ হিসাবে সনেটগুলি মহৎ অনুভূতির প্রেরণা নিয়ে আসেনি। এগুলি অসুস্থ ও বিকারগ্রস্ত মনের অন্ধ গলিঘুঁজির ক্লিন্ন ও ক্লেদাক্ত পরিবেশে ঊনমানবের কলুষিত আত্মাকে বহন ক'রে চলেছে।' (সনেটের জন্মকথা : পেত্রার্কা ও লরা : পৃঃ ৩৫)

'কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ছাড়া তাঁর (শেক্সপীয়রের) দেড়শতাধিক সনেট তাঁর প্রতিভার মর্যাদা বহন করে না।' (পৃঃ ৩৬)

আদি সনেট পেত্রার্কার নামে চিহ্নিত হ'লেও পেত্রার্কা যে এর জনক নন, এ-কথা তিনি স্বীকার করেছেন। প্রথম সার্থক সনেটকার হিশেবে তিনি উল্লেখ করেছেন বলোনাবাসী Guido Guinicelliকে, এবং Guittone d'Arezzoর দাবিও তিনি অস্বীকার করেননি। সনেটকারদের পূর্বসূরী হবার সৌভাগ্য যে লেনটিনির প্রাপ্য (২২ পৃষ্ঠায় Lentino ছাপা। বোধ হয় ছাপার ভুল, কেননা লেনটিনি [১১৯৫-১২৪০] ব'লেই তিনি বহু গ্রন্থে উল্লিখিত), তাও তিনি উল্লেখ করতে ভোলেননি। ত্রুবাদুর উচ্ছ্বাসের মাঝখানে আঁটোসাঁটো ও সংবৃত রূপকল্পের দিকে কবিতাকে উন্মুখ ক'রে তৎকালে লেনটিনি-প্রমুখ কবিগণ যে-ভাবে কবিতাকে রক্ষা করেছিলেন, তার তথ্যবহুল ও সুখপাঠ্য ইতিহাস রচনার জন্য আমরা অধ্যাপক ভট্টাচার্যের নিকট কৃতজ্ঞ আছি। কিন্তু তাঁর কোনো-কোনো মন্তব্য বিস্তারিত আলোচনার যোগ্য, যেমন দান্তে ও পেত্রার্কার পার্থক্য দেখাতে গিয়ে তিনি বলেছেন : 'দান্তের প্রেম স্বর্গের সংগীত, পেত্রার্কার প্রেম মানুষের ভালবাসা'। এই উক্তির বিরুদ্ধে অনেকের যুক্তি বল্লম উঁচোবে সন্দেহ নেই, এবং জাক মারিতাঁ প্রমুখ অভিজ্ঞদের বিশ্লেষণও দান্তে-বিষয়ে এই মন্তব্যের পরিপন্থী, তা ছাড়া বিশেষ ক'রে—অধ্যাপক ভট্টাচার্য যেহেতু কোথাও স্পষ্ট ক'রে বলেননি যে পেত্রার্কা আত্মবিশ্লেষণ, হতাশা এবং তজ্জাত অক্ষমতা দ্বারা আচ্ছন্ন ছিলেন, যা আসলে আধুনিক মানুষেরই কুললক্ষণ, সেই হেতু দান্তে না-হ'য়ে পেত্রার্কা কেন আধুনিক য়ুরোপীয় কবিতার আদি প্রবক্তার গৌরব পাবেন, তা ঠিক স্পষ্ট হয়নি। এই সব অংশে বিভিন্ন সমালোচকের উক্তির বদলে আলোচিত লেখকদের রচনা উদ্ধার করলে অধিক কার্যকর হ'তো, অন্তত ৫২ পৃষ্ঠায় যে-পেত্রার্কান সনেট তিনি উদ্ধার করেছেন, তা তার সংরক্ত আর্তনাদ দ্বারা সেই মানসিক আবহাওয়ার দিকেই ইঙ্গিত করে, যার জন্ম দ্বন্দ্বসংকুল আধুনিক মানুষের হতাশা ও আত্মনিগ্রহের ঠাণ্ডা, রিক্ত ও ঝোড়ো ভূগোলে। আসলে যে-নির্মম আত্মবিশ্লেষণ দ্বারা পেত্রার্কা য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের প্রবক্তা হয়েছিলেন, এবং আধুনিকতার কোনো-কোনো বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিলেন, সে-কথা পেত্রার্কা

ও লরার প্রেমকাহিনীর বিশ্লেষণে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠেনি। আধুনিকতা কাকে বলে, সে-বিষয়ে অধ্যাপক ভট্টাচার্যের ধারণা ভিন্ন হ'তে পারে, কিন্তু দান্তে ও পেত্রার্কার আলোচনায় আধুনিকতার প্রসঙ্গ অপরিহার্য ব'লেই মনে হয়।

৩

পেত্রার্কান রূপকল্পকেই সনেটের একমাত্র আদর্শরূপে ধ'রে নিয়ে গ্রন্থকর্তা কোনো পক্ষেই সুবিচার করেননি—না পেত্রার্কার, না সনেটের, না নিজের প্রতি। এ-কথা আজকের দিনে তর্কাতীত যে, কোনো-একটি ভাবনার সংহত নিঃসরণকে চোদ্দ চরণ ও সর্পিল মিলবিন্যাসে প্রকাশিত করলেই সনেটের চেহারা পাওয়া যায়। মিলের বিন্যাস পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে ভাবনাটিকে ঘিরে থাকবে, সেইজন্যই সর্পিল। অন্য কোনো উপমা দিতে গেলে লতাবেষ্টিত কোনো মহীরুহের কথা বলা যায়, যার লতাটি মিল এবং মহীরুহ ভাবনা। এবং, সেই কারণেই, রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ চতুর্দশপদী যেহেতু পর-পর দুই চরণে অন্ত্যানুপ্রাসযুক্ত, সেইজন্য, প্রবহমান পয়ারে রচিত হ'লেও, খাঁটি সনেট ব'লে স্বীকার্য নয়। শেক্সপীয়রীয় সনেটে চতুষ্কপরম্পরার শেষে অন্তিম যুগ্মকে যে-প্রচণ্ড আঘাত আছে, তা শারীরিকভাবে অনুভব করা যায়, এবং ফরাশি সনেটের মধ্যযুগ্মকও অনুরূপভাবে সক্রিয়। কিন্তু রাবীন্দ্রিক চতুর্দশপদীর অধিকাংশই সাতটি যুগ্মকপরম্পরায় রচিত ব'লে সেই আঘাত দিতে পারে না, একঘেয়েমিতে ভারাক্রান্ত হয়, এবং স্ক্রুর প্যাঁচের মতো ভাবনা অন্ত্যানুপ্রাস দ্বারা যুক্ত নয় ব'লে সেই সংবৃত সংহতি লাভ করতে পারে না, যা সনেটের প্রথম লক্ষণ।

'ইংরেজি সনেটের কুপ্রভাবে বাংলা সনেটের বিশুদ্ধি কলুষিত হয়েছে' (পৃ ৪১)—এ-জাতীয় মন্তব্য অধ্যাপক ভট্টাচার্য একাধিকস্থলে করেছেন। কিন্তু পেত্রার্কান রূপকল্প কেবল ইংরেজ কবিরাই লঙ্ঘন করেননি, আমার মতো একস্তর পাঠকের জ্ঞাতসারেও এই চরিত্রবৈশিষ্ট্য তেমন বহু মহৎ ফরাশি ও জর্মন কবির মধ্যেও প্রাপ্তব্য, যাঁরা সনেট-রচয়িতা হিশেবে নিঃসন্দেহে অতুল

মর্যাদার অধিকারী। বাঙালি পাঠকের সহজলভ্য হবে ব'লে র‍ঁসার, বোদলেয়ার, মালার্মে এবং রিলকে, গেঅর্গে, ট্রাক্‌ল্-এর কথা উল্লেখ করি। তাঁদের সনেটগুচ্ছকে অন্য কোন নামে অভিহিত করবো? সনেটকল্প বললেই কি তাদের সম্পর্কে সব কথা বলা হ'য়ে গেলো? না কি তাদেরও সনেট ব'লে স্বীকার ক'রে আমরা গোঁড়ামি থেকে মুক্তিলাভের পরিচয় দেবো? আশা করি ভবিষ্যৎ সংস্করণে গ্রন্থকর্তা এই বিষয়ে উপযুক্ত আলোকপাত করবেন, কেননা এমন অসংখ্য পাঠক পাওয়া যাবে, যাঁরা নিশ্চয়ই পেত্রার্কান মিলবিন্যাস এবং অষ্টক-ষট্‌কের ভেদকেই সনেট রচনার একমাত্র পদ্ধতি ব'লে স্বীকার করবেন না। যদি অন্য রীতির সনেটকে বিশুদ্ধ বলতে আপত্তি থাকে, তাহ'লে কি আমরা কেবল বহিরঙ্গের বিন্যাসকেই সনেটের একমাত্র কুললক্ষণ বলবো?

৪

মধুসূদনের কাব্য বিচার করতে গিয়ে ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন যে, এতকাল মুখ্যত মেঘনাদ-বধের কবি হিশেবে তাঁর প্রতিভার বিশ্লেষণ হয়েছে ব'লে যে-অসম্পূর্ণতা দেখা দিয়েছিলো, সনেটের আলোকে বিচার ক'রে তিনি তা দূরীকরণের চেষ্টা করেছেন। স্মৃতির যে-করুণ রঙিন পরিমণ্ডল 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে আমরা দেখে থাকি, তা একান্তই বাংলা দেশের, যদিচ কবিতাবলির রূপকল্প বৈদেশিক, নানা বিদেশী নাম ও স্থানের উল্লেখও তার মধ্যে আছে, এবং অধিকাংশই য়ুরোপ ব'সে লেখা। আসলে বাংলা সাহিত্যের প্রথম য়ুরোপীয় কবি যে মধুসূদন দত্ত নন, রবীন্দ্রনাথ—এই বিষয়ে পূর্বে বুদ্ধদেব বসু ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কোনো-কোনো প্রবন্ধে উল্লেখ ক'রে থাকলেও এ-বিষয়ে একটি বিস্তারিত আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন ছিলো। অধ্যাপক ভট্টাচার্যের গ্রন্থটি সেই অভাব বহুলত দূর করেছে ব'লে আমার বিশ্বাস। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উপর মধুসূদনের প্রভাব পড়েছে, তাঁর এই বিশ্বাস বিষয়ে বিস্তর মতভেদের অবকাশ আছে। এ-কথা অনস্বীকার্য যে মধুসূদন বাংলা কবিতায় অনেক

প্রান্তর এবং বহু সমুদ্রগর্ভের সন্ধান দিয়েছিলেন, কিন্তু সে-সব প্রান্তর পেরিয়ে রবীন্দ্রনাথই প্রথম সমুদ্র পাড়ি দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন, যা তাঁর আগে আর-কেউ করেননি, এমন কি মধুসূদনও না। মধুসূদন বাঙালি ছিলেন, আর রবীন্দ্রনাথের উপর পাশ্চাত্ত্য রোমান্টিকতার প্রভাব পড়েছিলো—এই তথ্য মানলে পর কিছুতেই আমরা রবীন্দ্রনাথের উপর মধুসূদনের প্রভাব স্বীকার করতে পারি না। প্রচলনির্ভর ধ্যানধারণা এবং বহুমুখী ঐতিহ্য কী ভাবে একজন কবির মানসিক আবহাওয়াকে সৃষ্টির উপযোগী ক'রে তোলে, সেই বিতর্ক স্বভাবতই এখানে প্রাসঙ্গিক। কিন্তু অধ্যাপক ভট্টাচার্য রবীন্দ্রনাথের প্রেমের ধারণাকে 'রাবীন্দ্রিক প্লেটনিজম' ব'লে যে-আখ্যা দিয়েছেন, 'যোগাযোগ', 'চতুরঙ্গ', 'মালঞ্চ', 'চার অধ্যায়', 'শ্যামা', 'চিত্রাঙ্গদা' প্রভৃতি বহু রচনার কথা মনে রেখে আমরা কি তাঁর সেই আখ্যায় গলা মেলাতে পারি? যেহেতু মুখ্যত সনেটই আলোচনার বিষয়বস্তু, সেইহেতু হয়তো এই সূত্র দিয়ে ভাবনাজাল তৈরি হয় নি, কিন্তু কোনো কবি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর কোনো বিশেষ ধরনের রচনাকে পৃথক ক'রে নিয়ে আলোচনার অধিকার আমাদের আছে কিনা—সে-প্রশ্ন অনায়াসেই উঠতে পারে। যদি আমরা কোনো বিশেষ রূপকল্পের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে চাই, তাহ'লে তার আলোচনা সর্বাঙ্গীণ হয়, যদি তাতে সাম্প্রতিক বিকাশ ও বিবর্তনের দিকে ইঙ্গিত থাকে। আধুনিক বাংলা কবিতায় সনেট নিয়ে যে-সব পরীক্ষা চলছে, এবং আধুনিক কবিদের উপর মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পড়েছে কিনা, আর পড়লেও কতটুকু পড়েছে—এই সব প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আলোচনা থাকলে ভালো হ'তো। আর যদি এই গ্রন্থের বিকল্প নামকরণ স্মরণে রাখি—'পেত্রার্কা, মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ'—তা হ'লে আধুনিকতা কাকে বলে এবং আধুনিক য়ুরোপীয় ও বাঙালি মানুষের ধ্যান-ধারণার পশ্চাতে এঁরা কোনভাবে সক্রিয়—এই সূত্রে তাঁদের সমগ্র রচনা আলোচনার অন্তর্ভূত হ'লে সুখী হতাম। সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে লেখকের পরবর্তী গ্রন্থ 'কবি-মানসী'র উপর আমাদের অনেকখানি আশা থাকলো, কেননা অধ্যাপক ভট্টাচার্য সেই

গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের প্রেমের ধারণার ‘পূর্ণাঙ্গ বিচার-বিশ্লেষণ’ করবার আশ্বাস দিয়েছেন।

৫

বাংলা ভাষায় অধুনা যে-সব আলোচনাগ্রন্থ বেরোয়, তাদের অধিকাংশেরই মুখ্য উদ্দেশ্য ডক্টরেট ডিগ্রিলাভ বা ছাত্রগণের প্রয়োজন মেটোনো ব’লে, অধ্যাপক ভট্টাচার্যের গ্রন্থখানি সহজেই চোখে পড়ে, কেননা বইখানি কেবলমাত্র তথ্যভারাক্রান্ত নয়, বরং স্বতন্ত্র চিন্তার উদ্দীপক। কোনো প্রচলিত মতের শস্তা পুনরাবৃত্তি না-ক’রে তিনি মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটি নতুন ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছেন, যার সঙ্গে অনেকে একমত না-হ’লেও বহু বিষয়েই আকৃষ্ট ও উপকৃত হবেন। সনেটের ইতিহাস এবং পেত্রার্কা-বিষয়ে যে-আলোচনা আছে, তা নানা দিক থেকে বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে একটি উজ্জ্বল সংযোজন। আমার জিজ্ঞাসাগুলি উপস্থাপিত করছি এই কারণে যে ভবিষ্যৎ সংস্করণে সে-সব বিষয়ে আলোচনা থাকলে অন্য বহু পাঠকের সঙ্গে আমিও লাভবান হবো।

৫৭ পৃষ্ঠায় Francesco Petrarca নামের ইতালীয় উচ্চারণ হিশেবে ‘ফ্রান্সিসকো পেত্রার্কা’ ছাপা হয়েছে, এ-বিষয়ে লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

কবিতাভবন, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৯ থেকে প্রকাশিত ও ১৪১ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-১৩ মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস প্রাইভেট লিমিটেড-এ মুদ্রিত।
সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রক: বুদ্ধদেব বসু। সহকারী সম্পাদক: নরেশ গুহ।

একটি নূতন ধরনের
স্কুল
প্রতিভা বসু
পরিচালিত
শিশুবিতান
নার্সারি থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত
ছাত্রছাত্রী নেয়া হয়
১১২/১ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড,
কলকতা ২৬
অনুসন্ধানের জন্য টেলিফোন
৪৬-১২০৪

KAVITA
(Poetry)

Vol. 23, No. 1

Yearly Rs. 4/-, or 6s. 6d. or $ 1. 50
Rupee one per copy

এক টাকা

Published quarterly at Kavitabhavan, 202 Rashbehari Avenue, Calcutta 29, India
Editor & Publisher: BUDDHADEVA BOSE

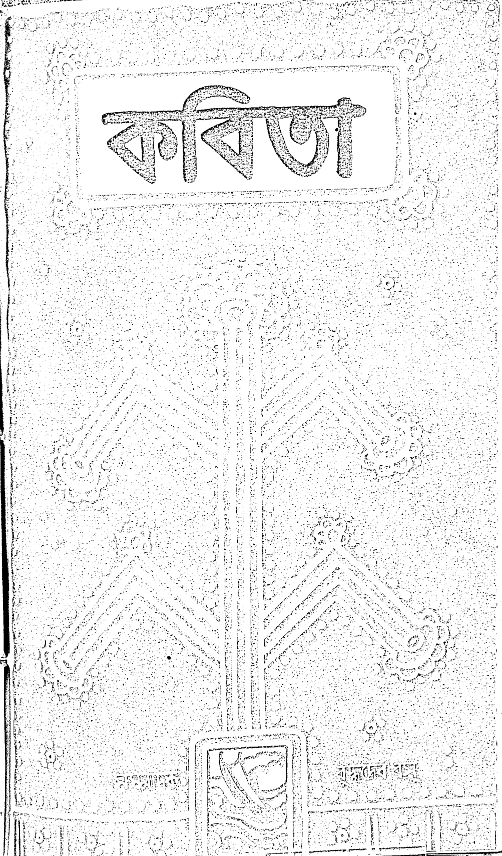
কবিতা
বুদ্ধদেব বসু

কবিতা

পৌষ ১৩৬৫

কবিতা

বিষ্ণু দে, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, প্রভাকর সেন, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, তারাপদ রায়, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, তরুণ সান্যাল, দীপক মজুমদার, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

অনুবাদ

সফোক্লেসের আন্তিগোনে ... অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত
স্তেফান মালার্মের দুটি কবিতা ... প্রণব চট্টোপাধ্যায়

প্রবন্ধ

পাস্টেরনাক-এর প্রসঙ্গে ... অমিয় চক্রবর্তী
আধুনিক বাংলা কবিতা ... নরেশ গুহ
উনগারেত্তির কবিতা ... প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

উল্লেখযোগ্য পত্র-পত্রিকা

কথাবার্তা

সমসাময়িক ঘটনাবলী ও সাহিত্য বিষয়ক বাংলা সাপ্তাহিক।
বার্ষিক ৩৲ টাকা; ষাণ্মাসিক ১.৫০ টাকা।

উইক্‌লী ওয়েষ্ট বেঙ্গল

সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত ইংরেজি সংবাদপত্র।
বার্ষিক ৬৲টাকা; ষাণ্মাসিক ৩৲ টাকা।

বসুন্ধরা

গ্রামীন অর্থনীতি ও কৃষি বিষয়ক বাংলা মাসিক পত্র।
বার্ষিক ২৲ টাকা।

শ্রমিক-বার্তা

শ্রমিক-কল্যাণ সংক্রান্ত বাংলা-হিন্দি পাক্ষিক পত্র।
বার্ষিক ১.৫০ টাকা।

পশ্চিম বংগাল

নেপালী ভাষায় সচিত্র সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র।
বার্ষিক ৩৲ টাকা; ষাণ্মাসিক ১.৫০ টাকা।

মগ্‌রেবী বংগাল

উর্দু ভাষায় সচিত্র পাক্ষিক সংবাদপত্র।
বার্ষিক ৩৲ টাকা; ষাণ্মাসিক ১.৫০ টাকা।

গ্রাহক হবার জন্য এই ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন—
প্রচার-অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, রাইটার্স বিল্‌ডিংস,
কলিকাতা—১

রবীন্দ্রপরিচয় গ্রন্থমালা

শ্রীশান্তিদেব ঘোষ

রবীন্দ্রসংগীত

পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল

এই সংস্করণে ছয়টি নূতন অধ্যায় সন্নিবেশিত হয়েছে, যথা, ভারতীয় সংগীতে গুরুদেবের স্থান, দেশী সংগীতের প্রভাব, গানের বিষয়বৈচিত্র্য ও কলিবিভাগ, ঋতুসংগীত, নেপথ্যের কথা, এবং গীতনাট্যের বৈচিত্র্য। অনেকগুলি পুরাতন অধ্যায়ের পরিবর্ধন করা হয়েছে। পরিশিষ্ট অংশেও ছয়টি নূতন লেখা সংযোজিত হয়েছে। মূল্য ৬·০০ টাকা।

পূ র্ব প্র কা শি ত

শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসংগম

রবীন্দ্রনাথ গানের ক্ষেত্রেও কি রকম পরকে আপন করে নিতে পেরেছেন— চলিত কথায় যাকে গান ভাঙা বলা হয় তার পরিধি কত বিস্তৃত এবং তাতেও কি রকম অপরূপ কারিগরি দেখিয়েছেন, দৃষ্টান্ত-সহ তার আলোচনা। প্রত্যেক সংগীত-রসিকের অবশ্যপাঠ্য বই। মূল্য ০·৮০ নয়া পয়সা।

শ্রীপ্রতিমা দেবী

নৃত্য

রবীন্দ্রনাথের আর-একটি বিশেষ দান নৃত্যনাট্যের প্রচলন। নৃত্যশিল্পকে যদি শ্রেষ্ঠ কলা বলে স্বীকার করি, যদি তার সম্প্রসারণ আমাদের কাম্য হয়, তবে এ শিল্পের যিনি পুরোহিত তাঁর শ্রম ও রুচিবোধের কথাটাও মনে রাখা দরকার এবং সে সঙ্গে জানা প্রয়োজন, আজ আমরা যা একান্ত সহজে হাতে পেয়েছি তার ইতিহাস। বাংলাদেশে আধুনিক কালে নৃত্যচর্চার পরিচয়লাভের পক্ষে অপরিহার্য বই। রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক অঙ্কিত প্রচ্ছদপটসহ ছয়খানি চিত্রে সমৃদ্ধ। মূল্য ৩·০০ টাকা।

বিশ্বভারতী

৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

Books on Art :

INDIAN TEMPLE SCULPTURE
With an Introduction by
Jawaharlal Nehru,
Text by **K. M. Munshi**
140 Plates. Rs. 36.00 net.

THE ART OF THE CHANDELAS
Text with Descriptions by
O. C. Gangoly
60 Plates. Rs. 32.00 net.

THE ART OF THE PALLAVAS
Text and Descriptive Notes by
O. C. Gangoly
46 Plates. Rs. 32.00 net.

RUPA & CO.
15, Bankim Chatterjee St., Calcutta-12.

107, South Malaka,
Allahabad-1

11, Oak Lane,
Fort, Bombay-1

কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র
অনূদিত
হুইটম্যানের
শ্রেষ্ঠ কবিতা

গদ্য-কবিতার প্রবর্তক ও আধুনিক কাব্যের ত্রাণকর্তা মহাকবি হুইট-ম্যানের শ্রেষ্ঠ কবিতার অনুবাদ করেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র।
সামনের ছবি সত্যজিৎ রায়ের।

দীপায়ন
প্রকাশনা ভবন
২৮/সি মহিম
হালদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-২৬

নাভানা'র বই

কঙ্কাবতী
বুদ্ধদেব বসু

‘কঙ্কাবতী’ চিরনতুন প্রেমের কাব্য। কোনো গ্রন্থের অন্তর্ভূত হয়নি এমন কয়েকটি নতুন কবিতা এবং কবির বহুকাল পূর্বে প্রকাশিত ‘পৃথিবীর পথে’র বিশিষ্ট কবিতাগুলি ‘কঙ্কাবতী’র নতুন নাভানা সংস্করণে সংযোজিত হয়েছে। ৩.০০ টাকা॥

গড় শ্রীখণ্ড
অমিয়ভূষণ মজুমদার

বৃহৎ উপন্যাসের অন্তঃপর্বটি যেন যুগসন্ধির জীবন-জিজ্ঞাসার নির্ভুল জবাব। বিশাল পটভূমিতে বাংলার গণজীবনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ও মহৎ উপন্যাস॥ ৮.০০ টাকা॥

বসন্তপঞ্চম
নরেন্দ্রনাথ মিত্র

বাংলা ছোটোগল্পে নরেন্দ্রনাথ মিত্র যে একজন প্রধান শিল্পী ‘বসন্তপঞ্চম’-এর গল্পগুচ্ছ তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন॥ ২ ৫০ টাকা॥

নাভানা

॥ নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস প্রাইভেট লিমিটেডের প্রকাশনী বিভাগ ॥
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

একটি নূতন ধরনের

স্কুল

প্রতিভা বসু

পরিচালিত

শিশুবিতান

নার্সারি থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত

ছাত্রছাত্রী নেয়া হয়

১১২/১ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড,

কলকতা ২৬

অনুসন্ধানের জন্য টেলিফোন

৪৬-১২০৪

যন্ত্রস্থ

রবীন্দ্রনাথ

১৮৬১-১৯৬০

॥ একশো বছরের রুচিবৃত্ত ॥

রবীন্দ্র সমালোচনার

সংকলন।

মীনাক্ষী দত্ত ও সুবীর রায়চৌধুরী

সম্পাদিত।

।'পাণ্ডুলিপি'।

৭ কর্নফিল্ড রোড, কলকাতা—১৯

কবিতা

বর্ষ ২১

ও

বর্ষ ২২-এর

সম্পূর্ণ সেট

পাওয়া যাচ্ছে।

বহু মূল্যবান কবিতা

অনুবাদ-কবিতা

ও

প্রবন্ধের সঞ্চয়ন।

প্রতি সংখ্যা ১।০

প্রতি সেট পাঁচ টাকা

মাশুল স্বতন্ত্র

কবিতা

ত্রৈমাসিক পত্র

আশ্বিন, পৌষ, চৈত্র ও আষাঢ়ে প্রকাশিত। * আশ্বিনে বর্ষারম্ভ, বৎসরের প্রথম সংখ্যা থেকে গ্রাহক হ'তে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যা এক টাকা, বার্ষিক চার টাকা, রেজিস্টার্ড ডাকে ছয় টাকা, ভি. পি. স্বতন্ত্র। * ষাণ্মাসিক গ্রাহক করা হয় না। * চিঠিপত্রে গ্রাহক-নম্বরের উল্লেখ আবশ্যিক। * ঠিকানা-পরিবর্তনের খবর দয়া ক'রে সঙ্গে-সঙ্গে জানাবেন, নয়তো অপ্রাপ্ত সংখ্যা পুনরায় পাঠাতে আমরা বাধ্য থাকবো না। অল্প সময়ের জন্য হ'লে স্থানীয় ডাকঘরে ব্যবস্থা করাই বাঞ্ছনীয়। * অমনোনীত রচনা ফেরৎ পেতে হ'লে যথাযোগ্য স্ট্যাম্পসমেত ঠিকানা-লেখা খাম পাঠাতে হয়। প্রেরিত রচনার প্রতিলিপি নিজের কাছে সর্বদা রাখবেন, পাণ্ডুলিপি ডাকে কিংবা দৈবাৎ হারিয়ে গেলে আমরা দায়ী থাকবো না। * সমস্ত চিঠিপত্রাদি পাঠাবার ঠিকানা:

কবিতাভবন

২০২ রাসবিহারী এভিনিউ

কলকাতা ২৯

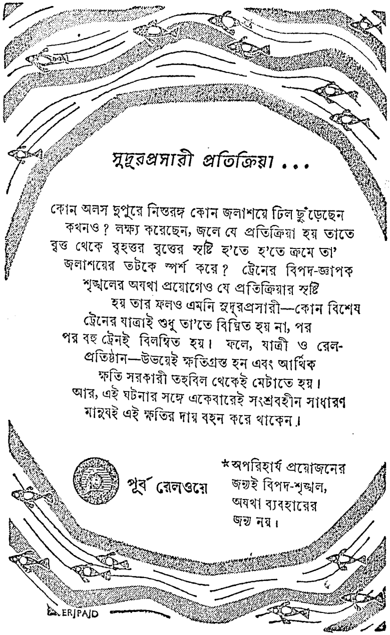

কবিতা

পৌষ ১৩৬৫
বর্ষ ২৩, সংখ্যা ২
ক্রমিক সংখ্যা ৯৬

এ আর ও

বিষ্ণু দে

'স সর্বেষু লোকেষু সর্বেষু ভূতেষু সর্বেষ্বাত্মস্বন্নমত্তি।'—ছান্দোগ্য উপনিষদ্

ও ঢাকে সত্যের মুখ হিরণ্ময় হৃদয়ে, আকাশে
সূর্যকে লাঞ্ছিত করে অনৃতের অসুস্থ ধোঁয়ায়,
অস্পষ্ট মানসে দিনরাত্রি ঢাকে শ্মশান-উচ্ছ্বাসে,
কারণ মৃত্যুর মাঠে জন্ম ওর ক্লান্তির রোঁয়ায়।
আর এর দেহমন অক্ষিত, অচ্যুত, নিঃসংশয়;
মৃন্ময়ীর বাহু স্নিগ্ধ ছিল এর জন্মের সময়,
তাই এ অপাপবিদ্ধ; খোঁয়ারিতে ও যবে গোঙায়
এ হাসে, প্রাকৃতজন স্বাধীন কি খণ্ডিত ভঙ্গিতে?
এ জানে কর্ষিত মুক্তি সর্বেন্দ্রিয়ে দু-হাতে আশ্বাসে
মনন যেখানে স্বস্থ প্রত্যহের তৎসৎ বিশ্বাসে:
নিষাদের সংস্কৃতিই মহাকাব্য সীতার গণ্ডিতে।

তাই এ দিনান্তে শ্রান্ত, ঘরমুখো। এর শুধু পেশী
কর্মক্লান্ত, তাই গোধূলিতে গার্হপত্যে ফেরে, ঘুম
ঘর চায়, ঘরনী ও পুত্রকন্যা, অন্নের আরাম।
সূর্যের আরম্ভে তাই এর শুরু স্বচ্ছ প্রতিদিন।
আর ওর ক্লান্তি হ'লো প্রারম্ভিক, আজন্মনিঃঝুম
গোধূলিতে কৃত্য শুরু, ক্লান্তি থেকে কর্ম, ভিন্‌দেশী

বিচ্ছিন্ন অদ্ভুত, তাই দৈনিক সে দিয়ে যায় দাম
মৃত্যুর মোদক কিনে, জীবনে সে জীবে প্রেমহীন।
স্নায়ুর শূন্যের ক্লান্তি, তাই তার ক্রিয়া অকর্মক
নিরুদ্দেশ, বিভক্তিতে ভুলে গেছে কর্মের কারক।

এতে ওতে মুখোমুখি হ'লে হাওয়া হিম হ'য়ে যায়,
বর্ষায় নির্জলা দেশ, শিশিরে গঞ্জিত নেশা জলে।
ও যবে বক্তৃতা দেয় আধিগ্রস্ত কবন্ধ কৌশলে,
নীলাকাশে মুক্ত এর হাত চলে লাঙলে চাকায়॥

আধুনিক বাংলা কবিতা

নরেশ গুহ

কবিতা লেখাও বরং সহজ কিন্তু কবিতার বিষয়ে লেখা আর অসাধ্যসাধন করা প্রায় এক কথা। বাইরের দিক থেকে বলা যেতে পারে—কবিতার ভাষাটা কেমন, ছন্দ মিলের মধ্যে কোনো কৌশল আছে কিনা, চিত্রকল্পের ব্যবহার কোথায় সার্থক হয়েছে, কিংবা হয়নি। ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে বর্ণনা করবার মতো কোনো প্রসঙ্গ থাকলে তারও আলগা একটা বিশ্লেষণ হয়তো করা যায় দেখানো যায় কাছের বা দূরের কী ঘটনার ছায়া পড়েছে তাতে, কিংবা পড়েনি; কেমন অনায়াসে সেই সব 'যুগান্তকারী' ব্যাপারকে কবি উপেক্ষা ক'রে গেছেন, কোথাও বা তাতেই আকণ্ঠ মজেছেন। কোন কবির মনের গড়নটা যেন এই রকমের, যদিও ঠিক এই রকমের নয়ও আবার। অনেক কথা জানা যায়, শেখা যায় এ-সব থেকে, শুধু কবিতার হৃৎপিণ্ডের ধ্বনি নীরব থাকে। অথচ রক্তের স্পন্দনের মতোই নিজের অস্তিত্বকে পৌঁছে দিতে পারাই তো কবিতার লক্ষণ। সে-কাজটা ঠিক কী উপায়ে সম্পাদিত হয় তার কথা, আভাসে ইঙ্গিতে হ'লেও, তাঁরাই ভালো ব্যক্ত করতে পারেন, কোলরিজ বা এলিঅটের মতো যাঁরা নিজেরাও কবি, সেই সঙ্গে ভাবুক।

তার মানে এ নয় যে কবি-সমালোচক ছাড়া আর কারো পক্ষে এ-কাজে হাত দিতে যাওয়া পণ্ডশ্রম। বরং এটাকেই সত্য ব'লে ধ'রে নেয়া যায় যে কোনো-না-কোনো সময়ে কবিতার সহৃদয় ও বোদ্ধা পাঠক জুটবেই। আধুনিক বাংলা কবিতা বিষয়ে, নিজেরা কবি না-হ'য়েও, যাঁরা ইতিপূর্বে সহৃদয় আলোচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, আবু সয়ীদ আইয়ুব ও বিমলচন্দ্র সিংহ। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ একটি আলোচনার গুরু দায়িত্ব প্রথম নিলেন শ্রীমতী দীপ্তি ত্রিপাঠী, এবং যেভাবে এই দায়িত্ব তিনি পালন ক'রে উঠেছেন তাতে আমরা বিস্মিত ও কৃতজ্ঞ বোধ করছি।*

* আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়: দীপ্তি ত্রিপাঠী। নাভানা। ছয় টাকা।

শ্রীমতী ত্রিপাঠী যে-পাঁচজন কবিকে আধুনিক বাংলা কাব্য-আন্দোলনের পুরোধা ব'লে বেছে নিয়েছেন—তাঁদের আলোচনা প্রসঙ্গে শুধু অগ্রজ রবীন্দ্রনাথকে এনেছেন তা নয়, সমসাময়িক পাশ্চাত্ত্য কবিদের কার্যকলাপও তিনি বিস্মৃত হননি। বিনিময়ের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর মানুষ ক্রমেই পরস্পরের এত কাছে এসে পড়ছে যে এ-যুগে আর সব জিনিশের মতো সাহিত্য-শিল্পকেও একমাত্র স্বদেশীয় সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে দেখা সম্ভব হচ্ছে না। এবং কবিদের মনের গড়ন আর দৃষ্টিভঙ্গির বিশিষ্টতার কথা বলতে গিয়ে গত একশো বছরের পৃথিবীতে সমাজ, রাষ্ট্র, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি নানা দিকে যে-সব বড়ো-বড়ো পরিবর্তন ঘ'টে গেছে, যে-সব ঢেউয়ের আন্দোলন এসে শিল্পীর চিত্তেও পৌঁছতে বাধ্য, সে-সব কথাও তাঁকে আনতে হয়েছে। অবশ্য এমন দাবি যদি আমরা করি যে কবিতা পড়তে গেলে পাঠককে আরো দশটা গুরুতর বিষয়ে জ্ঞানী হ'তে হবে, তাকে বুঝতে হবে রোমান্টিকের 'কল্পনা' বিষয়টা কী, লক্-এর দর্শন কী বলে, জানতে হবে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন-তত্ত্ব, নক্ষত্র আর নৃতত্ত্ববিদদের গবেষণা, জড়বাদের বিপর্যয়কাহিনী এবং ফ্রান্সের প্রতীকী আন্দোলন, ইমেজিস্ট-সুররিয়লিস্টদের ক্রিয়াকলাপ, ইম্প্রেশনিস্টদের শিল্পচিন্তা এবং মার্ক্সীয় ইতিহাসচেতনা এবং ইত্যাদি-ইত্যাদি, তাহ'লে সংগত কারণেই ভাঙা আসর আরো খালি হ'য়ে যাবে। আসলে যে-যুগে আমরা বাঁচি সে-যুগের হাওয়া থেকেই এ-সব জিনিশ আমরা অল্পবিস্তর পেয়ে যাই। সেটা যাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় না, যাঁরা এই সবের মধ্যে থেকেও যেন নেই, কোনো তোলপাড় হুলুস্থুলই যাঁদের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাতে পারে না, এ-যুগের কবিতা প'ড়ে অর্থোদ্ধার করতে হ'লে খানিকটা তৈরি তাঁদের হ'তেই হবে। 'কিছুই সহজ নয়, কিছুই সহজ নেই আর।'

আধুনিক কবিতা জটিল—এ-অভিযোগটা যেমন পুরোনো তেমনি টেকসই। তাহ'লেও এ-বিষয়ে দুশ্চিন্তা নিষ্প্রয়োজন। জটিলতাই যার একমাত্র গুণ সে-জিনিশ কবিতা নাও তো হ'তে পারে। তাছাড়া এ-গুণটা শুধু সাম্প্রতিক কবিতারই অপূর্ব উদ্ভাবন নয়। চিরকালই কিছু-কিছু কাব্য জটিল থেকেছে,

আবার প্রথম পাঠের ফলেই অভিভূত হ'তে হয় এমন কবিতারও অভাব নেই এ-কালে। তার চাইতে, আধুনিক কবিতা কাকে বলে, সে-কথাটা বেশি জরুরি। কোনো-এক বিশেষ তারিখের পর থেকে লেখা কবিতা মাত্রেই যে আধুনিক নয় সে-কথা শুধু এই থেকেও অনুমান করা যায় যে লেখিকা তাঁর আলোচনার জন্য অনেকের মধ্যে মাত্র পাঁচজনকে বেছে নিয়েছেন। তিনি ঠিক কোনো সংজ্ঞার্থ দিয়েছেন বলবো না, কী-কী লক্ষণ আধুনিক কাব্যে দেখা যায় তিনি তার একটা তালিকা করেছেন। বলেছেন :

১। কালের দিক থেকে আধুনিক কবিতা প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী।
২। ভাবের দিক থেকে তা রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে মুক্তিলাভের প্রয়াসী।
৩। সৃষ্টির দিক থেকে তা নবতম সুরের সাধক।'

ভাব অবশ্য কবিদের নিজের হওয়াই বাঞ্ছনীয়, সেটা কথা নয়। কিন্তু আধুনিকদের মধ্যে একের সঙ্গে অন্যের কবিতার পার্থক্য এতই প্রকট, মেজাজ এবং রীতির দিক দিয়ে তাঁদের মধ্যে অমিলের তুলনায় মিলটা এতই কম চোখে পড়ে যে এ থেকে কোনো সামান্য লক্ষণ খুঁজে বার করতে গেলে বিপদে পড়তে হয়। উপরোক্ত লক্ষণ তিনটি এতই অস্পষ্ট যে তা আমাদের জিজ্ঞাসাকে শান্ত করে না। লেখিকা নিজেও সে-কথা জানেন, তাই তিনিও শুধু ঐ কথা ব'লেই ক্ষান্ত হ'তে পারেননি। কথাটা আরো বিশদ, আরো যথাযথ করতে গিয়ে বলেছেন, ভাবের দিক থেকে বারোটি এবং আঙ্গিকের দিক থেকে বারোটি লক্ষণ আধুনিক কবিতায় বর্তমান। উপরন্তু যোগ করেছেন যে 'রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে মুক্তিলাভের প্রয়াস' বলতে বুঝতে হবে 'আধুনিক কবিদের বিদ্রোহ রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে নয়, রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে।'

সব মিলিয়ে ব্যাপারটা অবশ্য জটিল হ'য়ে গেলো। নতুন লেখা থেকে আধুনিক কবিতাকে বেছে নিতে গেলেও এ থেকে কোনো সাহায্য পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। সংজ্ঞার্থমাত্রেই সংক্ষিপ্ত হয়, এবং সেই পরিসরের মধ্যে একমাত্র সামান্য লক্ষণেরই স্থান হতে পারে। ভাবের দিক থেকে দ্বাদশ লক্ষণের সবগুলি প্রতিটি আলোচ্য কবির রচনায় নেই। আমি অন্তত অমিয় চক্রবর্তী

কিংবা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের রচনায় 'রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে সচেতন বিদ্রোহে'র কোনো নমুনা আছে ব'লে জানি না। 'বর্তমান জীবনের ক্লান্তি ও নৈরাশ্যবোধ'ই বা বিষ্ণু দে-র পরবর্তী রচনায় অথবা অমিয় চক্রবর্তীর সমগ্র কাব্যে কোথায় মিলবে? লেখিকা, স্পষ্টতই, যাঁর-যাঁর বৈশিষ্ট্যগুলিকে বেছে একত্র করেছেন, তা না-হ'লে 'মার্ক্সীয় দর্শনের, বিশেষত সাম্যবাদী চিন্তাধারার প্রভাবে নূতন সমাজসৃষ্টির আশা'কে ভাবের দিক থেকে আধুনিক কাব্যের অন্যতম লক্ষণ ব'লে ঘোষণা করতে তাঁর দ্বিধা হ'তো। কেননা এঁদের মধ্যে একমাত্র বিষ্ণু দে-র রচনায় এই ধারণার সঙ্গে সাক্ষাৎ মেলে।

তাহ'লে কি বিচিত্র সুরের সাধনা সত্ত্বেও এঁদের মধ্যে একমাত্র মিল হচ্ছে কলাকৌশলের বিশিষ্টতায়? মনের দিক থেকে কোনো মিলই নেই? অথচ প্রসঙ্গ আর রূপের মধ্যে হরপার্বতীর মিলন যদি না-থাকে, রূপটা যদি ধার-করা হয়, পোষাকি হয়, বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়—তাহ'লে যতই জমকালো রূপসী দেখাক না কেন, তাকে আমরা কবিতা বলবো না। আধুনিক কবিতার আঙ্গিক বা রূপের মধ্যে কোনো মৌলিক সাদৃশ্য যদি থাকেই, আগেকার কবিতা থেকে ভিন্ন হ'লেও তার উপযোগিতার কথা যদি মেনেই নিই আমরা, তাহ'লে এই কবিদের মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো চারিত্রিক মিলও আছে। সে-মিলটা মনে-মনে আমরা জানি না তা নয়, কিন্তু ভাষায় বলতে গেলেই বিপদ দেখা দেয়।

একটা বিদ্রোহের মনোভাব নিয়েই আধুনিক কাব্যের নান্দীপাঠ শুরু হয়েছিলো, সে-কথা ঠিক। তখনকার মতো সে-বিরোধিতার উপলক্ষ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, এবং তাঁর মধ্য দিয়ে একটা আস্ত যুগ। রবীন্দ্রনাথ যে নিছক উপলক্ষ মাত্র, আধুনিকেরা তাঁকে কোনোকালেই যে পরিহারের চেষ্টা করেননি, বরং শিরোধার্য ক'রে নিয়েছেন, তার প্রমাণ 'আধুনিক বাংলা কবিতা' নামক সংকলনগ্রন্থ। তবে প্রাক্তন এবং আধুনিকের চোখে দেখা রবীন্দ্রনাথের চেহারায় হয়তো বা মিল নেই। সে যা-ই হোক, জীবনের যে-কোনো ক্ষেত্রে গভীর কোনো পরিবর্তনের সূচনায় খানিকটা বিদ্রোহের হাওয়া দিয়েই থাকে।

কিন্তু নতুনের আদর্শ একবার যখন প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে যায় তখন থেকে তার নিজের মূল্যেই তার পরিচয়। কাজেই রবীন্দ্র-বিরোধিতাও আধুনিক কবিতার কোনো সামান্য লক্ষণ ব'লে মানবো না।

আমরা কি তাহ'লে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে 'আধুনিকের বিদ্রোহ রোমান্টিকের বিরুদ্ধে'? অর্থাৎ আধুনিক কবিতা রোমান্টিক নয়? দুঃখের বিষয় জীবনে নিত্য নতুন অভিজ্ঞতার অন্ত নেই, কিন্তু অভিধানে শব্দের সংখ্যা শোচনীয়ভাবে পরিমিত। বিশেষত 'রোমান্টিকে'র মতো গুণবাচক শব্দগুলিকে, বিকল্পের অভাবে, এত রকমের ভিন্ন এবং বিরোধী অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে যে তাদের সাহায্যে ঠিক-ঠিক অভিপ্রায় ব্যক্ত করা আজ প্রায় অসম্ভব। রোমান্টিক আর ক্লাসিকল বলতে দু'জন লোক একই জিনিশ বোঝেন কিনা সন্দেহ। উনিশ শতকী ইংরেজ কবিরাই রোমান্টিক প্রতিভার একমাত্র প্রতিভূ, রোমান্টিক চেতনার সবগুলো উল্লেখযোগ্য গুণই তাঁদের কাব্যে আছে—এই রকমের একটা ধারণা অনেকের মনে বদ্ধমূল। রোমান্টিক কাব্যের মূলসূত্র যদি "imagination" ['ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরিদৃশ্যমান এই বস্তুজগতের সীমার অন্তরালে এক অসীম রহস্যময় অলৌকিক জগৎ বিদ্যমান। কল্পনা প্রতিভার সহায়তায় কবির কাছে সে-জগৎ প্রত্যক্ষ হয়। কবি সেই দর্শনের বিস্ময় কাব্যে রূপায়িত করেন।' ১৬ পৃঃ], তাহ'লে বায়রন রোমান্টিক কিনা? এবং তার আগে শেক্সপীয়রকেই বা কোন দলে রাখবো? আলোচনা থেকে বোঝা যায় শ্রীমতী ত্রিপাঠী রোমান্টিসিজম্-এর উনিশ শতকী ইংরেজি ধারার কথা বলছেন। কিন্তু তার বিরোধিতা ক'রেও যে রোমাণ্টিক থাকা যায় সেটা গণ্য করেননি ব'লে তাঁকে বলতে হয়েছে:

"কি ক্লাসিক, কি রোমাণ্টিক, প্রেমের আদর্শে 'বন্দীর বন্দনা'-র কবির বিশ্বাস নেই"
—৯৭ পৃঃ

"বস্তুত রোমাণ্টিক-বিরোধী হ'লেও সুধীন্দ্রনাথের পক্ষে ক্লাসিক আদর্শ নেওয়া সম্ভব ছিলো না, যুগধর্ম তার বিরোধী।"

"'পরস্পর'-এ সেই অচরিতার্থতার বেদনার অন্তরালে নূতন এক অনুভূতি বা বোধের জন্ম হচ্ছে দেখি। রোমাণ্টিসিজমের যুগ শেষ হ'য়ে যাচ্ছে, রিয়ালিজম ফিরে আসছে; আবার রিয়ালিজমের ধ্বংসস্তূপের মধ্য দিয়ে আর এক তীক্ষ্ণ বোধের উপলব্ধি হচ্ছে, তা হ'লো সুররিয়ালিজম বা অতিবাস্তব চেতনা"।
—১৯৬ পৃঃ

ক্লাসিক সাহিত্যের সুমিতি আর শৃঙ্খলাবোধ অনেক পরিমাণে আয়ত্ত করা গেলেও সমাজের মানুষরা যে-কালে তাদের বিশ্বাস এবং ধ্যানধারণায় শতধা বিভক্ত, বিশৃঙ্খল পারিপার্শ্বিকের মধ্যে কবির নিজেকেই যেখানে বাধ্য হ'য়ে একটা কোনো শৃঙ্খলা বানিয়ে নিতে হয়, সে-পরিবেশে ক্লাসিক সাহিত্যের উদ্বর্তন অভাবনীয়। ক্লাসিক সাহিত্যে বিদ্রোহ নেই, শিল্পীর স্বাতন্ত্র্যের অধিকার কেউ স্বীকারই করেন না। প্রচলিত বিশ্বাস, ধ্যানধারণা এবং শিল্পরীতিকে তাঁর নাটকে পুরোপুরি মানতে পারেননি ব'লে রোমান্টিকের ছোপ-লাগা ইউরিপিডিসকে আথেন্স ছেড়ে পলাতে হয়েছিলো। শেষ পর্যন্ত প্রবাসেই তাঁর জীবন সাঙ্গ হয়। আমার ধারণা, এলিঅট নতুন এক ক্রিশ্চান সমাজের প্রতিষ্ঠা চান এই কারণে যে, তাঁর মতে, শুধু সেই ধরনের পরিবেশেই নাগরিকদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ঐক্যবোধ জন্মাতে পারে, যার ফলে আনুষঙ্গিক বিষয়গুলিতে শক্তি এবং কালক্ষয় না-ক'রে শিল্পীর পক্ষে তাঁর আসল রচনাকর্মে মনোনিবেশ করা সহজ হ'য়ে যাবে, শিল্পে ক্লাসিকাল যুগ ফিরে আসবে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির এ-রকমের ঐক্যবোধ এ-যুগে সোভিয়েট রাশিয়ার মতো দেশেই বোধ করি থাকা সম্ভব। রোমান্টিক শিল্পীর অভ্যুদয় সেখানে ভাবা যায় না। তাই মানুষের অপরাজেয় হৃদয় যদি কোনো বরিস পাস্টেরনাকের মধ্যে আকাশের দিকে হাত তোলে, তাহ'লে সমাজের দিক থেকে তাঁর হঠকারিতার প্রতিবিধান করতে তৎপরতার অভাব হয় না।

কথা হচ্ছে, এক যুগের রোমান্টিক মনোভাব যখন কালক্রমে অন্য যুগে এসে দুর্মর অভ্যাসের অন্তঃসারশূন্যতায় পর্যবসিত হয় তখন তার প্রবল বিরোধিতা করার পরেও কবি মনে-প্রাণে রোমান্টিকই থাকতে পারেন। কারো-কারো রচনায় ক্লাসিক গুণ বর্তানো অসম্ভব নয়, যেমন সুধীন্দ্রনাথের কবিতায়। তাতে কিছু এসে যায় না। আধুনিক কবিমাত্রেই রোমান্টিক ধারারই অনুশীলন করছেন। তবে তার পরিধিকে যদি তাঁরা বাড়িয়ে থাকেন সেটা তো গৌরবের কথা। 'কাব্যের মুক্তি' প্রবন্ধে এ-বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সুধীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

'বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই দেখা গেল যে পূর্ব পুরুষের অনন্ত শোষণে কাব্যের কলেবর থেকে অর্থ ও আবেগের মজ্জাটুকু শুকিয়েছে, প'ড়ে আছে শুধু কঙ্কাল—প্রতিধ্বনিপূর্ণ মরুভূমির মধ্যে প'ড়ে আছে শুধু দীর্ণ, জীর্ণ, বৈশিষ্ট্যহীন কঙ্কাল।......

......ফলে কোনও সৎ কবিরই আর বুঝতে বাকি রইল না যে সে-ফাঁকির মধ্যে সত্যের শৃঙ্খলা আনতে গেলে, আড়ম্বরের মোহ অবশ্য পরিত্যাজ্য, অন্তঃসারশূন্য বস্তুমাত্রার আমূল উচ্ছেদ অত্যাবশ্যক। কেন না শুধু নূতন অট্টালিকার নির্মাণে কোনও সার্থকতা নেই; হর্ম্যখানাকে বাসোপযোগী ও কালোপযোগী করা চাই, দেখা চাই যাতে আকাশের আলো তার ভিজে দেওয়ালে বাধা না পায়, বিশ্বের বাতাস ফিরে না যায়, তার অর্গলিত দ্বারের শিকল নেড়ে। সেজন্য একটা নগণ্য বাহ্য সৌন্দর্যের দিকে নজর রেখে ইটের পরে ইট সাজানো যথেষ্ট নয়, বাড়িতে যারা থাকবে তাদের ভুললে চলবে না। ভুললে চলবে না তারা মানুষ, ভুললে চলবে না তারা রক্ত মাংসে গড়া, দুঃখ-আনন্দের দাস,. পরিবর্তনশীল, বর্ধিষ্ণু। তাতে যদি প্রথাগত স্থাপত্য বর্জনীয় ঠেকে, তবে তাই স্বীকার; তাতে যদি নাস্তিক, বস্তুবাদী ইত্যাদি অন্যায় অপবাদ ঘাড়ে পড়ে, তবে তাও বরণীয়। প্রথম দফায় দরকার অবৈকল্য, দ্বিতীয় দফায় দরকার অবৈকল্য, তৃতীয় দফায় দরকার অবৈকল্য, এবং শেষের দফায় দরকার অবৈকল্য। **বিংশ শতাব্দীর মূলমন্ত্র অবৈকল্য আর অকপটতা।**'......

......সময়রূপ চতুর্থ আয়তনের মার্গে শাশ্বত অভিজ্ঞতার সংগে যতক্ষণ না মিলতে পারছে, ততক্ষণ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নিতান্ত মূল্যহীন। সেইজন্য প্রত্যাখ্যান কবিকে সাজে না, এবং কালজ্ঞান ভিন্ন তার গত্যন্তর নেই।'......

তার মানে, বিশ শতকে লেখা যে-কবিতায় অবৈকল্য, অকপটতা আর কালজ্ঞানের পরিচয় আছে তাকেই বলবো আধুনিক কবিতা। অকপট ব'লেই এ-কথা মানতে আধুনিক কবির কোনো দ্বিধা নেই যে মানুষ দুর্বল। সঙ্গে-সঙ্গে এ-কথাও তিনি স্বীকার না-ক'রে পারেন না যে এই পরমাশ্চর্য জীবনের রহস্য শেষ হবার নয়। অলৌকিক বৃন্দাবনী গোষ্ঠে চিরস্থায়ী প্রেমের লীলা তাঁর অভিজ্ঞতায় ধরা দেয় না বটে, কিন্তু প্রেমের অপরিসীম শক্তি আর মহিমায় তাঁর আস্থা নেই বললে কথাটা মনগড়া হবে, কবিতায় তার প্রমাণ মিলবে না। অন্ধকারকে স্বীকার করতে গিয়ে তাঁরা আলোকের আশীর্বাদকে অস্বীকার করেন না। এবং বিজ্ঞান তার প্রকাণ্ড হাতুড়ির ঘায়ে একে-একে মানুষের সব কিছু প্রচলিত মোহকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করলেও কবিকে দমাতে পারেনি। সৌন্দর্যের দরজা আগলিয়ে এখনো কবি দাঁড়িয়ে আছেন। দ্রষ্টব্য, এই গ্রন্থেরই ৩৩৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত অমিয় চক্রবর্তীর চিঠি, যাতে তিনি নিজের কবিতার কথা বলছেন :

'পৃথিবীতে এসে যা দেখা গেলো তার **বিমিশ্র** সহজ একটি আক্ষরিক পরিচয়, সাক্ষীর বিমুগ্ধ আত্মভাষায় স্বীকৃতি। কিছু আপত্তি, কিন্তু সব বিরুদ্ধতা ভুলিয়ে-দেওয়া আশ্চর্য সংসারের স্রোতোধ্বনি, আশ্চর্য রঙিন কাহিনী যা দেখা-শোনা যায় না।'

আধুনিক কবি কোনোদিক থেকেই মুখ ফিরিয়ে নেন না :

দেখিবে সে মানুষের মুখ?
দেখিবে সে মানুষীর মুখ?
দেখিবে সে শিশুদের মুখ?
চোখে কালশিরার অসুখ,
কানে যেই বধিরতা আছে,
যেই কুঁজ—গলগণ্ড মাংসে ফলিয়াছে
নষ্ট শসা—পচা চালকুমড়ার ছাঁচে,
যে সব হৃদয় ফলিয়াছে
—সেই সব।

প্রেম, প্রকৃতি বা ঈশ্বর বিষয়ে আধুনিক কবি পূর্বেকার প্রচলিত ধারণাকে ছেড়ে দিয়েছেন ব'লেই শাশ্বত অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দেননি। 'বন্দীর বন্দনা'য় প্রেম আর সৌন্দর্যের উপলব্ধি অতিমাত্রায় তীব্র ব'লেই কবিতায় কোথাও ক্রোধ, কোথাও বা বিদ্রূপের স্বর লেগেছে। সে-কবিতায় অভিমান আছে, আত্মগ্লানি আছে, অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের চিহ্নও সর্বত্র। 'চর্ম সাথে চর্মের ঘর্ষণ একমাত্র সুখ যাহাদের' তাদের সঙ্গে প্রেমিক প্রেমিকাকে কবি এক ক'রে দেখেননি। অথচ তারাও আছে। এবং তাদের সংখ্যাই বেশি। সতী-সাবিত্রীকে ব্যঙ্গ করতে কবির সুদূরতম অভিপ্রায় ছিলো ব'লে মনে করি না। বিদ্রূপের তাঁরাই লক্ষ্য যারা সতীসাবিত্রী-শকুন্তলার দোহাই দিয়ে জৈব কামনার চরিতার্থতা খোঁজেন। 'বন্দীর বন্দনা'য় নবযৌবনের ঔদ্ধত্য যে কত প্রকট তার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত 'প্রেমিক' কবিতা। প্রেম এতই পবিত্র যে কোনো পার্থিবার পক্ষে সেই পবিত্রতীর্থে সহযাত্রী হওয়া যেন দুরাশা মাত্র, এটাই হচ্ছে কবির বলার কথা। সে শুধু আধার, এবং সে-আধারে প্রেমের আবির্ভাব একমাত্র প্রেমিক-কবির পক্ষেই উপলব্ধি করা সম্ভব। অথচ এই অসমর্থ নায়িকাকেই পরে কঙ্কাবতীতে রূপান্তরিত দেখে আমরা অবাক হই না। সেই পার্থিবার মুখেই তখন সকল রূপকথার, গ্রীক পুরাণের, স্বদেশ-বিদেশের নানা কালের কাব্যে কীর্তিত নায়িকার লাবণ্য এসে মিশেছে। নায়িকাতেই মূর্ত হয়েছে প্রেম, আর শেষ পর্যন্ত প্রেমেই কৈবল্য। কাজেই "কি ক্লাসিক, কি রোমান্টিক,

প্রেমের আদর্শে 'বন্দীর বন্দনা'র কবির বিশ্বাস নেই'—বললে কবির প্রতি সুবিচার হয় না।

গ্রন্থে এই রকম আরো কিছু-কিছু সিদ্ধান্ত আছে যার সঙ্গে আমি একমত হ'তে পারিনি, যেমন জীবনানন্দ বিষয়ে তিনি বলেছেন : 'সত্যের অন্বেষায় তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গিত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে প্রত্যক্ষ ক'রে লাভ করেননি। এজন্য তাঁর কাব্যের ট্র্যাজিক মহিমা এত বেশি মর্মভেদী'। কিংবা, 'রোমান্টিক কবিদের শাশ্বত প্রেমের আদর্শে জীবনানন্দের বিশ্বাস নেই।' অথবা, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' 'অচরিতার্থতার কাব্য'। কীটস-এর বহু-আলোচিত সেই পংক্তিটি থেকেই এই রকম একটা ধারণার জন্ম হয়েছে যে কবি সত্যদ্রষ্টা। তাহ'লে মানতে হয় যে দার্শনিক আর কবির উদ্দেশ্য অভিন্ন। অথবা 'সত্য' কথাটা স্থানভেদে তার অর্থ বদলায়। এলিঅট বা রিচার্ডস-এর মতো অনেকেই কীটস-এর ঐ উক্তিটি নিয়ে সুখী হ'তে পারেননি। এবং প্রচলিত অর্থের বিভ্রাট না-ঘটিয়ে কিংবা প্লেটোর জগৎকে পুরোপুরি অঙ্গীকার না-ক'রে নিলে ও-কথার সত্যি কোনো অর্থ হয় না। কবির উদ্দেশ্য সত্যের অনুসন্ধান নিশ্চয়ই নয়, উপলব্ধি আর উক্তির সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিমা নির্মাণই তাঁর অভীষ্ট। উপলব্ধিতে যদি কপটতা না-থাকে তাহলেই হ'লো, লোকাচারের সঙ্গে মিলছে কিনা সেটা কথাই নয়।

'শাশ্বত প্রেম' বলতেই বা কী বোঝায়? প্রেম শাশ্বত, এ-কথা সবাই মানবেন। কিন্তু জীবনে তার আবির্ভাব ক্ষণস্থায়ী। তার জন্য প্রতীক্ষার অন্ত নেই, এবং প্রেম চ'লে গেলে প্রেমের স্মৃতিমন্থন, কিংবা তার যন্ত্রণা সহ্য করা—এই তো চিরকালের অভিজ্ঞতা। চিত্রিত, অথবা ভাস্কর্যে-উৎকীর্ণ, নরনারীর পক্ষেই শুধু অক্ষয় প্রেম সম্ভোগ সম্ভব। জীবনানন্দের কাব্যে এই শাশ্বত অভিজ্ঞতার কথাই আছে যে প্রেমের চূড়ায় যত ক্ষণকালের জন্যই দাঁড়াই না কেন, তা আমাদের অন্য জন্মে উত্তীর্ণ ক'রে দেয়।

সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে মালার্মে-র এবং অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক নিয়ে লেখিকা দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে 'মালার্মের

প্রতি সুধীন্দ্রনাথের আকৃষ্ট হবার প্রধান কারণ তাঁর দুরূহতা, সংহত স্বল্পভাষ ব্যঞ্জনাময় প্রকাশশৈলী, শব্দের অভিধানগত অর্থের বিনষ্টি এবং সর্বোপরি তাঁর বিষণ্ণ নেতিবাদী জীবনদর্শন'। উভয়ের কবিতাই দুরূহ; কিন্তু দুয়ের দুরূহতা কিন্তু দুই জাতের, কবিস্বভাবেও চোখে পড়ার মতো মিল নেই। তবু মালার্মের প্রতি সুধীন্দ্রনাথের অনুরাগ এত প্রবল কেন সে-প্রশ্নের কোনো সন্তোষজনক উত্তর লেখিকার আলোচনা থেকে আমি জানতে পারলাম না। আর অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা যে আধ্যাত্মিক, সে তো তিনিও মানেন। রবীন্দ্রনাথের "মিস্টিক" বোধ নিশ্চয়ই অন্য রকমের, কিন্তু তার জন্যে এ-কথা বলা যায় না যে "**আপাতদৃষ্টিতে** মনে হ'তে পারে তিনি এ যুগের প্রধান আধ্যাত্মিক কবি।" "আপাতদৃষ্টিতে" কেন, নিকট দৃষ্টিতেও তিনি আধ্যাত্মিক।

আধুনিক বাংলা কবিতা বিষয়ে লেখিকার সিদ্ধান্ত কোথাও-কোথাও আমার সঙ্গে মেলে না ব'লে এ-গ্রন্থের মূল্য কিছুমাত্র কমছে না। নির্বাচিত কবিদের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি অসাধারণ ধৈর্য, নিষ্ঠা, ও সন্ধানশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। জীবনানন্দের কবিস্বভাবের সঙ্গে ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীদের, অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে হপকিন্স, রিল্‌কে আর ওয়ালেস্ স্টীভেন্স, আর বিষ্ণু দে-র সঙ্গে লোর্কা, আরাগঁ এবং পল এলুয়ারের তিনি যে-সব মিল আবিষ্কার করেছেন তা থেকে এই-সব কবিদের নতুন ক'রে পড়ার সময় নিশ্চয়ই আমরা লাভবান হবো। আধুনিক কবিতা তাঁর পক্ষে শুধু কৌতূহলের সামগ্রী নয়। বাধ্য হ'য়ে পড়েননি, ভালোবেসে পড়েছেন। এবং রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর মনোভাব ঠিক পূজারিনীর মতো নয় ব'লে এ-যুগের কবিতা তাঁর কাছে পরধর্মের মতো ভয়াবহ মনে হয়নি। তাঁর লেখার প্রধান গুণ এই যে অন্য অনেক বাংলা সমালোচনার মতো তাঁর লেখাকে তিনি আপ্তবাক্যের চর্বিতচর্বণে ভ'রে তোলেননি। তিনি যে নিজে চিন্তা করেছেন তার প্রমাণ এই যে আমাদের দিয়েও পদে-পদে তিনি ভাবিয়ে নেন। এ-লেখা প'ড়ে মন চুপ ক'রে থাকে না। তিনি প্রশ্ন জাগাতে পারেন। এ-কালের বাংলা কবিতায় যাঁরা কৌতূহলী তাঁরা

প্রত্যেকেই এ-বিষয়ে লেখা এই প্রথম বিস্তারিত গ্রন্থ থেকে উপকৃত হবেন, সন্দেহ নেই।

আলোচিত কবিতাংশের উপযুক্ত অনুবাদ সমেত এ-বইয়ের কোনো সংক্ষিপ্ত সার যদি ইংরেজিতে প্রকাশিত হয় তাহ'লে বাংলা যাদের মাতৃভাষা নয় তাদের পক্ষেও এ-কবিতা পড়ার পথ সুগম হবে। এই আধুনিক কবিতার মধ্যেই আমরা এ-যুগের বাঙালি হৃদয়ের অকপট ভাষা শুনতে পেয়েছি। লেখিকা দেখিয়েছেন, কেমন অসংকোচে পৃথিবীর যে-কোনো সাহিত্যের পাশে বসিয়ে তাকে উপভোগ করা যায়। এশিয়ার মধ্যে একমাত্র হালের জাপানি সাহিত্যই যদি পৃথিবীতে সাড়া জাগিয়ে থাকে সেটা বাংলার তুলনায় সে-সাহিত্য অগ্রসর ব'লে নয়, তার কারণ তাদের ভাগ্যে ভালো অনুবাদক জুটেছে।

৩২ পৃষ্ঠায় বোদলেয়ার-এর সনেট থেকে মাত্র ৮ লাইন তোলা হ'য়েছে, যদিও সঙ্গের বাংলা অনুবাদটি পুরো কবিতার। পরবর্তী সংস্করণে ফরাসী উদ্ধৃতিগুলির স্থানে-স্থানে বানান ঠিক ক'রে দেওয়া প্রয়োজন। ২৭ পৃষ্ঠায় বর্নট্ নর্টন্ কবিতার উদ্ধৃতিতে ভুল আছে। The Second Coming এবং The Coming of Wisdom with Time কবিতার উদ্ধৃতিতে কয়েকটি কমা সেমিকোলন ছাপা না-হওয়ায় অর্থ বুঝতে অসুবিধা হয়।

প্রেম, পুনর্বার

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

হে আস্বাদিত দুঃখ, তুমি বাম পার্শ্বে বোসো
আর এই সুমঙ্গলা রমণী দক্ষিণে;
আমি মধ্যবর্তী থাকি, কথা বলো তোমরা দুজনে
কলহ কোরো না, ঊর্ধ্বে গোধূলির আলো বড়ো নির্জনতাপ্রিয়।

তোমার নিরালা মুখ বলো দুঃখ কে কাঁদালো কলহে, কণ্টকে।
জানি, নারী সুমঙ্গলা, হিংসা ওর বুকের প্রিয়তা;
কাম্য শান্তি তাই ভাবি, বিবাদে ক্ষরিত রক্ত, বিবাদ ভালো না
আনো মুখ দৃশ্য মুছি, গোধূলির আলো বড়ো নির্জনতাপ্রিয়।

শোনো, সহ্য করো এই রমণী দক্ষিণে বামে দুই হাতে আমাকে জড়াবে,
হিংস্রক সমস্ত চায়;—
বলে, প্রেম উদারতা থেকে আরো অধিক যুবতী।
বিলাপ কোরো না, দুঃখ, তুমি বাম পার্শ্ব থেকে বুকে এসে বোসো।
কলহে কণ্টক, ঊর্ধ্বে গোধূলির আলো বড়ো নির্জনতাপ্রিয়।

সংশয়

প্রভাকর সেন

বিকালে ধুলোর ঝড়, ঘোলাটে আকাশ,
ছেঁড়া কাগজের গলি, কানা রাজপথ,
ন্যাকড়াজড়ানো তাজা হৃৎপিণ্ডবৎ
শেয়ালদার ত্রিসীমানা, চারটে আটাশ।

ক্রমশ নিস্তেজ হ'লে শব্দের জঙ্গল
চ'লে যায় নৌকা নিয়ে ভাঙরের খাল,
দ্রুত জর্লা, কাদামাখা মহিষের পাল,
দুয়েকটি ভাঙা ঘাট, ছায়াচ্ছন্ন জল।

হৃদয়পুরের পথ এ-সবের পর
অন্ধকার আকাশের যেন খুব কাছে,
জোনাকির মতো যেন তারা গাছে-গাছে,
কোথা যেন নিদ্রাতুর শিশুদের স্বর।

বুঝি নাকো আলো হাতে দোর খুলে দিলে
আছো নাকি তত দূরে, যত দূরে ছিলে।

শিল্পী

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

আকাশে সে দৃশ্য গড়ে
মাটিতে ফোটায় শতদল,
তার নামে, বনান্তরে
দক্ষিণের রটনা চঞ্চল।

সূর্য, দিনে ছায়া লোটে
রাত্রি রচে আত্মার মহিমা,
দুঃখ তাকে দেহ দিলে

মন ভাঙে সম্ভবের সীমা ॥

সফোক্লেস-এর আন্তিগোনে

[পূর্বানুবৃত্তি]

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

আন্তিগোনের গান
স্থায়ী : এক

হেরো গো আমারে আমার স্বদেশবাসী,
জলের মতো এই পথ যাবো ছেড়ে,
হেরিব না আর সূর্যরশ্মিরাশি,
দিন চ'লে গেলো, সব নিয়ে গেলো কেড়ে।
নিদ্রাঞ্জনে হাইদাস মোর নয়নের জ্যোতি গ্রাসি'
উপহার দেবে এ-জীবন মোর তুহিন সৈকতেরে,
আকেরন লবে বৈতরণীর ঢেউয়ের বাহুর ঘেরে,
এ-দেহ আমার। মিলনগীতিকা কখনো শুনিনি যে রে,
আকেরন মোরে মরণে জড়াবে, পরাবে প্রেমের ফাঁসি ॥

সংস্তব

তুমি চলো, চলে গৌরব পিছু-পিছু,
তুমি মৃতদের বন্দীভবনে চলো,
ত্রিতাপতৃষ্ণা তোমার চরণে নিচু,
অসির উপরে গরীয়সী তুমি জ্বলো,
নিজ নিয়তির নায়িকা, মৃত্যু দলো,
সমাধির পানে একা চ'লে যাও ঋজু ॥

আন্তিগোনের গান
অন্তরা : এক

সেই যে করুণ বিজন তান্তালস
আত্মজা তার নিয়োবি নাম্নী ফ্রিজিয়াবাসিনী বালা
সিপুলস ব'লে পাহাড়চূড়ায়, সহিল মরণজ্বালা;

পাথরে-পাথরে নিথর হ'লো সে-ব্রততী-জীবন-রস।
বেয়ে-ওঠা সেই লতার উপরে বছর-বছর ধ'রে
বৃষ্টিতুষার, সে রইলো নিচে প'ড়ে,
বৃষ্টিতুষার-অশ্রুপ্লুতা দেহবল্লরী ভ'রে ;
আমারও তো সেই দুর্ভাগিনীর পালা,
আমিও ঘুমাবো শিলাশয্যায় তারি মতো ঘুমঘোরে ॥

সংস্তব

দেবতার ঘরে জন্মেছিলেন তিনি,
মোরা নশ্বর, মৃন্ময় পরিণাম,
তুমি যে তরুণী ইহলোকে শরীরিণী,
জীবনে মরণযন্ত্রণা লভি' দেবী তবু তোর নাম।

আন্তিগোনের গান

স্থায়ী : দুই

শান্তি দেবে না, কৌতুক করো অভাগা নারীর মনে ?
পিতা-পিতামহ-প্রপিতামহের নগরদেবতা যতো,
দেখুন আমায়, নির্জিতা আমি কথার নির্যাতনে,
এখনো তো বেঁচে, মরিনি শেষ মরণে,
ম'রে গেলে মোরে মুখের উপরে কোরো ক্ষতবিক্ষত।
ওরে ও আমার রত্নানগরী, নরনারী নগরীর,
ওরে ও আমার দির্কা নদীর নদীনীর, নদীতীর,
থেবা নগরীর রথের পথের অরণ্য ছায়াঢালা,
তোমরা ভুলো না অপঘাত মোরে সাজা দিলো অকারণে,
মিললো না কোনো সমবেদনার সখ্য নয়ননীর,
মাটির তলায় গহন নিরালা
পাথরের গড়া সমাধি-কারায় চলেছি অবরোহণে,
জীবনে অথবা মরণে কোথাও পাবো না আপন নীড় ॥

সংস্তব

স্থায়ী : এক

ওরে মেয়ে, তোর সামনে গভীর খাদ,
দুঃসাহসের শিখরে আছিস রত,
বিচারের বেদী অদূরেই উদ্যত,
পিছনে পূর্বপুরুষের পরমাদ।

আন্তিগোনের গান

অন্তরা : দুই

সেই তো আমার ভীষণ অসহ ভার,
পুরোনো ব্যথার সে-কাহিনী তিন বার
বলা হ'য়ে গেছে, তবু কি হ'লো না বলা ?
প্রাচীন রাজার পাতকের অধিকার,
দুর্ভাগা পিতা, অভাগিনী মাতা তামসী রজস্বলা,
কী অভিশপ্ত দয়িত যে তার আপন জঠর থেকে
অকালে উঠলো জেগে।
হায় সে কেমন জনকের সংসার
যে-ঘরে আমার জন্ম যন্ত্রণার,
এখন মাটির নিচে সেই ঘর, ফিরে চলি সেইখানে
একাকিনী আর অবলুণ্ঠিতা, স্বজনসন্নিধানে
ফিরে যাই আমি। নিজ ঘরনীর ঘূর্ণিবিপাক লেগে
মৃত মোর ভাই মৃত্যুতিমির থেকে যে আমারে টানে ॥

সংস্তব

যোগ্যজনেরে অর্চনা দেয়া ভালো,
নিয়তিশক্তি অনতিক্রমণীয়,
বিশ্বভুবন তার কাছে নমনীয়,
নিজ ইচ্ছায় নেভালে আপন আলো।

আন্তিগোনে
আমি চলি একা আপন বেদনা ল'য়ে
আমি চলি একা দুঃখরুগ্নহৃদি,
কোনো সঙ্গীর মধুমঙ্গলগীতি
ধ্বনিল না, কেউ এলো না অশ্রু ব'য়ে।
মোর ভালে দিন উঠবে না র'য়ে-র'য়ে,
মোর ভালে শুধু আমার পথের বিধি।

[ক্রেয়োনের প্রবেশ]

ক্রেয়োন। কান্না কিংবা মায়াকান্না অকারণ অরণ্যে রোদন,
এ শুধু অবধারিত মৃত্যুর আগেই আয়ুক্ষয়,
যাও, ওকে নিয়ে যাও আমার চোখের সামনে থেকে,
কবরের গর্তে শক্ত ক'রে ওরে বন্ধ ক'রে রাখো,
যেমন বলেছি, ঠিক সেই ভাবে। একা ছেড়ে দাও,
মরুক বাঁচুক কিংবা বেঁচে ম'রে থাক অন্ধকারে,
ওর যে-রকম সাধ। আমরা তো সংস্পর্শ এড়াবো!
মোট কথা, মাটির উপরে ওকে থাকতে দেবো না।

আন্তিগোনে। আমার সমাধি সে যে মিলনবাসর। ও আমার
চিরন্তন কারাগৃহ। অবনম্র নববধূসাজে
যেখানে আমার সব পরিজন রাজে সেইখানে
অভিসারে চ'লে যাবো, পের্সিফোনে সেখানে সবারে
অসংখ্য মৃতের সাথে রেখেছেন অতিথিসদনে।
তাঁর প্রাসাদেই আমি যাবো সবশেষে, সবচেয়ে
ভাগ্যহীনা আমি, যাবো দিন ফুরানোর কতো আগে।
যাবার আগেই তবু মনে-মনে আশা লাগে বড়ো—
মা আমাকে হাসিমুখে বুকে নেবে, স্মিতমুখে পিতা,
ভাই কাছে এসে ধরবে। ওরে ভাই, সেই ভরসায়

দুই হাতে আমি তোর মৃতদেহ পরিচর্যা ক'রে
দিয়েছি তো সায়ন্তন শান্তিজল। আর এইবার
পোলুনাইকেস, তোর মৃতদেহ পরিচর্যা ক'রে
এই কি রে সমুচিত পুরস্কার তার? সুধীজন
পুণ্যময় এ-পাপের মর্ম জানে। কিন্তু আমি জানি,
যদি আমি সন্তানের মা হতাম, অথবা আমার
স্বামী যদি যুদ্ধহত বিপর্যস্ত হ'য়ে রইতো প'ড়ে,
সেই সন্তানেরে কিংবা সেই দয়িতেরে কখনোই
রাজরোষ তুচ্ছ ক'রে দিতুম না সমাধি এমন;
কারণ জিজ্ঞাসা করো? শোনো, তবে অন্য একজন
স্বামীকে বরণ ক'রে তাঁর কাছে সন্তান না-হয়
চাইতাম, তিনি তা-ই দিতেন আমাকে। কিন্তু দ্যাখো,
মা-বাবা দুজনে মৃত, সমাধির মাটিতে প্রোথিত,
একটি ভাইয়ের ডাল হবে আর কোন বৃক্ষমূলে?
তোমাকে সম্মান দিতে গিয়ে তবু ক্রেয়োনের চোখে
প্রতিপন্ন হলাম যে আমি ঘৃণ্য—তাই, ওরে ভাই,
আমার উপরে তিনি ক্রূরহস্ত। বধূ-মা অথবা
বধূরে যেমন ক'রে নিয়ে যায়, সেইমতো নয়,
আমাকে চালান তিনি রুক্ষভাবে। আমি কারো বধূ
নই, কারো মাতা নই, বন্ধু নই কারো, আমি একা,
তবু বেঁচে আমি, তবু বেঁচে থেকে পাতালে আমায়
যেতে হ'লো। বলো কোন দেবতার দিব্য অধিকার
লঙ্ঘন করেছি? বলো কী ক'রে আমার দুঃখদিনে
ঊর্ধ্বে মুখ তুলে ধরি? কার কাছে দৈব দয়া চাই?
পবিত্র কাজের পরে অশুচি আমার পরিচয়!
স্বর্গের শাব্যস্ত যদি এই হয়, তবে আমি পাপী,

এ-শাস্তি আমারি প্রাপ্য। ওরাই শাব্যস্ত যদি হয়,
প্রতিপক্ষ সমান-সমান দণ্ড পায় যেন তবে।

স্ত্রধার। সেই ঝড় সেই ঝটিকা এখনো দেখি
থামলো না ওর—

ক্রেয়োন। দেরি করে যদি সেপাইশাস্ত্রী যতো
ওর চেয়ে কম শাস্তি পাবে না, এ-কথা ব'লে রাখি।

আন্তিগোনে। প্রতিটি শব্দ কানে বাজে প্রাণে বাজে
মৃত্যুর মতো।

ক্রেয়োন। জীবনের মতো জীবনের আশা ছাড়ো,
মিথ্যা প্রবোধ দিতে আমি পারবো না।

আন্তিগোনে। ওরে ও আমার পিতা ও পিতামহের
মহতী নগরী, শহরে আমার ঘর,
ঘরের দেবতা, চলেছি দ্বীপান্তর।
দেরি কেন আর, এখনি তো যেতে পারি,
সব চেয়ে শেষে এসেছি রাজকুমারী,
ব্রতের পুণ্যে আমি বন্দিনী নারী,
ব্রতপুণ্যের বর।

[প্রহরীরা আন্তিগোনেকে নিয়ে গেলো]

সংস্তব

স্থায়ী : এক

এমনই ভাগ্য ক'রে এসেছিলো দানাএ,
পিতলে রচিত কারার প্রাচীরে ঘেরা তার তনুখানি
রূপসী দানাএ মহীয়সী ছিলো জানি,
জিউসের দয়া স্বর্ণরেণুতে ঝরেছিলো সারা গায়ে,
সৌরশিশুকে দিয়েছিলো বুকে আনি' ;
বন্ধ কারায় সে তার নিয়তি নতশিরে নিলো মানি।

বিত্তের চেয়ে বিপুল নিয়তি, দুর্গপ্রাকার তার কাছে নিরুপায়,
অস্ত্রের চেয়ে কুটিল নিয়তি, তরীর চেয়েও দ্রুতবেগে চ'লে যায়।

অন্তরা : এক

এদোনিয়াদেশে দ্রুয়াস-তনয় রাজা লুকাউর্গাস,
এমনই ভাগ্য তাঁর,
কোথায় মিলালো সেই সন্ত্রাস, তাঁর সে-অহংকার ?
তাঁকে বড়ো সাজা দিলেন দিয়নুসাস।
প্রস্তরতলে শুকালো রাজার গরবী ফুলবাহার,
কী সাহস, তিনি শাসিয়েছিলেন দেবদাসী মাইনাস
পূজারিণীদের, এভিয়ান শুভ অগ্নিকে পরিহাস
করেছেন, তাই হ'লো সে-রাজার দারুণ সর্বনাশ ॥

স্থায়ী : দুই

কৃষ্ণশিলার গিরিবর্ত্মের নিখাদে ও ধৈবতে
এদিকে নিজের কূলের কিনারে মগ্ন বসফোরাস,
ঐদিকে একা সাল্‌মুদেসস জনহীন সৈকতে,
যেখানে আরেস ফেলেছিলো তার করুণ দীর্ঘশ্বাস,
কেননা আরেস চোখে দেখেছিলো, অকারণ দ্বৈরথে
বিমাতার হাতে নির্জিত সেই ফিনেউস-শিশু দুটি,
কেড়ে নিয়েছিলো বিমাতা তাদের আঁখির দিঠির দ্যুতি,
চিকন অঙ্গ ছুরিতে বিঁধিয়ে পেয়েছিলো উল্লাস,
শোণিতলুব্ধ কঠিন মুঠিতে রক্তক্ষয়ী পথে।

অন্তরা : দুই

জনম অবধি সেই দুটি শিশু কেঁদে-কেঁদে হ'লো সারা,
মা-র তরে তারা দুঃখে-দুঃখে কাটালো সকল বেলা,
বিস্ময়াহত প্রশ্নে নিয়ত ক্ষ'য়ে-ক্ষ'য়ে গেছে তারা
অকূল দুটি একেলা।

মা ছিলো তাদের এরেখথিয়স বংশ-উজল বাতি,
সে যে উত্তরে বায়ুর দুহিতা, পাহাড় চতুর্দিকে,
পিতার ঝঞ্ঝা বুকে আগলিয়ে জেগেছিলো অনিমিখে,
আকাশদুহিতা, তবু তারও 'পরে নামলো আঁধার রাতি,
যুগযুগান্তে জীবনে-জীবনে নিয়তির জাল ফেলা।

[অন্ধ ভাবি কথক তাইরেসিয়াসের প্রবেশ, তাঁর আগে-আগে পথপ্রদর্শক একটি বালক]

তাইরেসিয়াস

কুশল তো সুধীবৃন্দ? আমরা সতীর্থ দুইজনে,
যাত্রার সম্বল শুধু আমাদের একজোড়া চোখ,
আমি অন্ধ, আমার নায়ক তবু আমার নির্ভর।

ক্রেয়োন। চরণে প্রণত, তাত, কী ভাগ্য দিলেন পদধূলি।
তাইরেসিয়াস। কথা আছে, ইচ্ছা তব কর্ণপাত করা বা না-করা।
ক্রেয়োন। আপনার আদেশের অসম্মান করিনি কখনো।
তাইরেসিয়াস। তাই রাজরথচক্র হয়নি শ্লথ বা বক্রগতি।
ক্রেয়োন। সে-ঋণ স্বীকার করি, অধমর্ণ সর্বদা আমরা।
তাইরেসিয়াস। সাবধান, তুমি এসে দাঁড়িয়েছো ক্ষুরধার পথে।
ক্রেয়োন। সে কী কথা? কেঁপে উঠি আপনার কথার কশাঘাতে।
তাইরেসিয়াস। স্পষ্ট কথা বলতে চাই অন্ধকার উদ্‌ঘাটিত ক'রে।
শোনো, আমি দীর্ঘকাল ভবিষ্যদ্বক্তার আসনে
বসতে শিখেছি, আর দৈববাণী পড়তে শিখেছি।
এখনি বসেছিলাম সে-আসনে, হঠাৎ শ্রবণে
একাগ্র মনন ভেঙে গেরোবাজ কয়েকটা পাখির
কর্কশ আওয়াজ এলো, শিকারি পাখিরা নখে-নখে
ডানায়-ডানায় যুঝে চিৎকারে আকাশ ছেয়ে গেছে;

অমঙ্গল আশঙ্কায় তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালাম
সমস্ত সমিধ এনে প্রতিকার-যজ্ঞের আগুন
জ্বালাতে গেলাম, কিন্তু বৃথা সেই স্বস্তির কামনা—
তন্নো দেবা যচ্ছত সুপ্রবাচনং ছর্দিরাদিত্যাঃ
ভরং নৃপায্যং।
পর্শে তোকায় তনয়ায় জীবসে
স্বস্ত্যগ্নিং সমিধানমীমহে॥
সমিধ সমিধ হ'য়ে রইলো, তবু আগুন জ্বললো না,
স্তূপাকার মাংসমজ্জা জানুজঙ্ঘা থেকে কী-রকম
উৎকট দুর্গন্ধ রস গলতে লাগলো জলন্ত অঙ্গারে
আমার প্রাণান্ত শ্রম একেবারে ব্যর্থ হ'য়ে গেলো।
যে-আমি সবার হ'য়ে দেখতে পাই, অন্ধ সেই আমি,
আর এ-বালক যেন অন্তর্যামী, ও আমার হ'য়ে
দেখতে পায়। এ-বালক আমাকে তখন ব'লে দিলো
সব কথা। তবে তুমি এই দুর্যোগের জন্য দায়ী?
অভিশপ্ত ঈদিপাস! সারমেয় আর শকুনিরা
তার সন্তানের মাংস খেয়ে গেছে, রক্তমুখে তারা
অপবিত্র ক'রে গেছে সব যজ্ঞবেদীর আহুতি।
তাই তো ঈশ্বর নিরুত্তর এত যজ্ঞসত্ত্বেও!
আর বলো কোন পাখি মরা মানুষের রক্ত দেখে
সেই রক্ত চেটে খেয়ে অমঙ্গলধ্বনি করবে না?
এখনো সময় আছে, ভেবে ছাখো; মানুষমাত্রেই
ভুল করে, ভুল করা স্বাভাবিক, ভুল সংশোধন,
সেও স্বাভাবিক। যদি ত্রুটি স্বীকারের পরে কেউ
সংশোধিত হয়, তাকে নির্বোধ বা দুর্জন বলিস।
বরঞ্চ, গোঁয়ার যারা, বুদ্ধিহীন আখ্যা পায় শেষে।

তাঁই বলি, মৃত মানুষেরে তুমি অবজ্ঞা কোরো না।
মৃত মানুষেরে তুমি আবার মেরো না; তাতে কোনো
পৌরুষ আছে কি? আমি তোমারই ভালোর জন্য বলি,
কাম্য কল্যাণ যদি চাও তবে অমান্য কোরো না—
অসতো মা সদ্‌গময়, আমি এক শুভার্থী তোমার।

ক্রেয়োন। বৃদ্ধ যে সন্দেহ নেই, তীরনিক্ষেপের কালে তবু
এদিক-ওদিক হয় না! আমি জানি, ভালো ক'রে জানি
পেশাদার জ্যোতিষীর সমস্ত রকম ছলাকলা,
যে-কোনো উপায়ে এই জ্যোতিষীরা স্বার্থসিদ্ধি ক'রে
জুয়া খেলে। কিন্তু সারা সার্দিনিয়ার রৌপ্যরাশি,
ভারতবর্ষের সব সোনা এনে উপুড় করুন,
বিশ্বাসহন্ত্রীকে তবু একতিল সমাধির মাটি
দেবো না, দেবো না আমি। ঈশ্বরের ঈগলের ঝাঁক
মৃতের কঙ্কাল ব'য়ে জিউসের শীর্ষসিংহাসনে
নিয়ে যাক, তবু জেনো বিশ্বাসঘাতক এক কণা
পাবে না সমাধি মাটি, তাছাড়া এ-কথা ব'লে রাখি
ঈশ্বরের মহিমায় হস্তক্ষেপ কোনো মানুষের
সাধ্যের আয়ত্তে নেই। কিন্তু তাইরেসিয়াস,
মুনফার লোভে মরে অতিশয় ধূর্ত সে-মানুষ
যে বলে কুচক্রী বাক্য তত্ত্বকথার আচ্ছাদনে।

তাইরেসিয়াস। হায়!
সারা পৃথিবীতে বুঝি একজনও জানে না, বোঝে না?

ক্রেয়োন। কী জানে না? বলুন না সর্বসমক্ষে সেই কথা।

তাইরেসিয়াস। জানো না কি সদুক্তি যে বিকোয় না স্বর্ণমূল্যেও।

ক্রেয়োন। এ-কথা অন্তত বুঝি, নির্বুদ্ধিতা মস্ত ক্ষতিকর।

তাইরেসিয়াস। অথচ তোমার মধ্যে ক্ষতিকর সেই নির্বুদ্ধিতা।

ক্রেয়োন। রাষ্ট্রগুরু, অপমান করতে আমি ভ্রূক্ষেপ করিনে।

তাইরেসিয়াস। অপমানকারী, তুমি আমাকে বলেছো মিথ্যাচারী!

ক্রেয়োন। এই জ্যোতিষীর জাত যথারীতি অর্থপিশাচ।

তাইরেসিয়াস। রাজার লালসা তার চেয়ে আরো গর্হিত তাহ'লে।

ক্রেয়োন। আপনি কী বলছেন। আপনি কাকে কী বলছেন?

তাইরেসিয়াস। তোমাকে দিয়েছি রাজ্য, তুমি রক্ষী, আমি শিক্ষাগুরু।

ক্রেয়োন। ভূয়োদর্শী গুরুদেব, কিন্তু গুরুদক্ষিণাকাতর।

তাইরেসিয়াস। জিহ্বাসংবরণ করো, শেষ কথা এখনো বলিনি।

ক্রেয়োন। নিঃসংকোচে ব'লে যান, উৎকোচের ভরসা না-রেখে।

তাইরেসিয়াস। আমার ধর্মকে তুলি বাস্তবিক পেশা মনে করো?

ক্রেয়োন। করিই তো, নই কারো চক্রান্তচালিত ক্রীড়নক।

তাইরেসিয়াস। তবে বলতে বাধ্য হই। সূর্য তাঁর রথপর্যটনে
আরেক অয়নপথ অতিক্রান্ত হ'তে-না-হতেই
ঘনাবে তোমার রাত্রি। তোর পুত্র নিজ মৃত্যু দিয়ে
শুধবে মৃত্যুর ঋণ, মরণ তোমার মহাজন,
তুমি তার অধমর্ণ, তার কাছে দুই ভাবে ঋণী:
এক, তুমি একটি জীবন পাঠিয়েছো মরণের
পরীক্ষার্থিনী ক'রে জীবন্ত কবরে। দ্বিতীয়ত,
মৃত মানুষের মৃত্যুসূত্রে প্রাপ্য ন্যায্য অধিকার
অস্বীকার ক'রে তুমি এক মানুষের মৃতদেহ
অনাদৃত স্বজনের রোদনবঞ্চিত অনাবৃত
রেখেছো পথের মধ্যে। এর ফল কখনো ভেবেছো?
কর্মফল ভোগ করো, প্রতিক্রূর নরকের প্রেত,
পাতালের পিশাচিনী তোর জন্য উদ্‌গ্রীব রয়েছে,
তারাই তোমাকে দেবে তোমার নিজস্ব পরিণাম।
বোঝো তবে কী ইষ্ট সাধিত হ'লো জ্যোতিষীর? বোঝো,

আর খুব বেশি দেরি নেই, তোর প্রাসাদমহল
আবালবনিতাবৃদ্ধ ভ'রে তুলবে মড়াকান্নারোলে ;
তোকে ঘিরে শাপ দেবে প্রতিবেশী প্রতিটি নগরী,
তাদেরও অর্পিতপ্রাণ শহীদেরা যোগ্য সম্মান
পায়নি, শিকারি জন্তু সংকার করেছে, তাদেরও তো
উনানে চুল্লিতে রক্ত পড়েছিলো পরিতৃপ্ত যতো
কুকুরের মুখ থেকে, শকুনির মুখ থেকে। তুমি
আমারে কথার বিষে দংশেছো, এবার তুমি নিজে
বক্ষোবিদ্ধ হও অভিসম্পাতের ধারালো শায়কে,
মর্মে-মর্মে যাতনার অর্থ বোঝো, পরিতাপ করো।
ওরে বাছা, কই তুই, আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে চল,
সাপ তার কণ্ঠবিষ উগরে দিক বয়োকনিষ্ঠেরে,
তারপর শান্ত হোক। চল বাছা, বাড়ি নিয়ে চল।

[তাইরেসিয়াস ও বালকটির নিষ্ক্রমণ]

সূত্রধার। উনি চ'লে গিয়েছেন, মহারাজ। ব'লে গিয়েছেন
দুর্বাক্য ভীষণ, আর রক্ষা নেই। এক মাথা চুল
যবে কালো ছিলো সেই যুবাকাল থেকে বৃদ্ধকালে
সব শাদা হ'লো—ওঁর কোনো বাক্য বিফল দেখিনি।

ক্রেয়োন। সে-কথা আমিও জানি, শঙ্কা এসে আমাকেও ঢাকে,
তাঁর কাছে নত হওয়া দুঃসহ যে, কিন্তু দর্পনাশা
নিয়তি দংশায় যদি, হায়, সে যে আরো দুর্বিষহ।

সূত্রধার। ক্রেয়োন, আপনি যদি পরামর্শ নিতেন এখন।

ক্রেয়োন। বলুন, বলুন, আজ শিরোধার্য আপনার আদেশ।

সূত্রধার। তবে মুক্ত ক'রে দিন সেই তরুণীরে, আর সেই
অবজ্ঞাত মৃতটির সমাধির উদ্যোগ করুন।

ক্রেয়োন। আপনারা তাহ'লে কি এ-ইচ্ছাই পোষণ করেন ?

সূত্রধার। মহারাজ, অতি শীঘ্র এই কাজ সম্পাদিত হোক,
অন্যায় প্রতিবিধানে দেবতারা সত্বর তৎপর।

ক্রেয়োন। হা ঈশ্বর! এ বড়ো কঠিন কাজ, তবু তাই হোক,
বৃথা কেন আমি আর গ্রহের বিরুদ্ধে যুঝে মরি!

সূত্রধার। তবে যান, স্বহস্তে কঠিন কাজ সমাধা করুন।

ক্রেয়োন। এই মুহূর্তেই যাবো, যত অনুচর,
কুঠার কুড়াল নিয়ে সকলে এখনি
অদূর পাহাড়ে চলো, নির্দেশ পেয়েছি।
আগে তো বুঝিনি, বড়ো দেরিতে বুঝেছি
যে-আমি রুধেছি তারে, সেই আমি তার
বাঁধন খুলবো। যত কষ্ট হয় হোক,
আজীবন সনাতন সত্যরক্ষা ভালো।

সংস্তব

স্থায়ী : এক

একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং
যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।

শত নামে এক, তুমি কদ্‌মস্‌-কন্যার বাহুলীন,
বজ্রবন্ত জিউসের শিশু ইতালিয়া-প্রাণবায়ু।
রহস্যময়ী এলেউসিনিয়া তোমার চরণে ঝরে,
তোমার সকাশে ইসমেনাসের জল
ব'য়ে-ব'য়ে যায় র'য়ে-র'য়ে ছলোছল,
মোহনিয়া সেই মেয়েদের মাতা থেবা নগরীর 'পরে
মাটিতে লুকানো ড্রাগনের দাঁত—এ-সবই তোমার তরে॥

অন্তরা : এক

তোমার জন্য দাবানল জলে দুই চূড়া গিরিভঙ্গে
কোরুসিয়া যত নর্তকী নাচে উতল জলতরঙ্গে,

আরোহ ছন্দে রণিত তাদের চরণের কিঙ্কিণী,
নিম্নে বিনীতা কাস্তালিয়ার স্বচ্ছ স্রোতস্বিনী।
তোমার লাস্যে নুসা পাহাড়ের অঙ্গে
আঙুরগুচ্ছ বেয়ে-বেয়ে ওঠে সারাদিন সারাদিনই,
আঙুরগুচ্ছ ঢুলে-ঢুলে পড়ে অন্তরীপের অঙ্কে,
অপর্যাপ্ত পুষ্পস্তবক স্তোত্রসঞ্চারিণী,
এ-পথ ও-পথ অঞ্জলি দেয় তোমার মহাজীবনকে ॥

স্থায়ী : দুই

তীর্থের সেরা থেবাই নগরী তোমার প্রিয়,
তারে ভালোবাসো তুমি ও তোমার জননী জিউসজায়া,
তারি পাশে এসো, হেরো তার মুখে দুর্দিন ফেলে ছায়া,
তোরণে-তোরণে অভয়মন্ত্র দিয়ো,
চকিতে মেটাও ব্যথিতের ব্যথা তৃষিতের অশনায়া,
পার্নাসিয়ার পর্বতচূড়ে তুমি যে পার্নাসীয়,
গর্জমুখর জলপথ জুড়ে মূর্ত তোমার মায়া।

অন্তরা : দুই

অগ্নিবর্ষী তারাপুঞ্জের আলোড়িত সমতানে
তুমি অগ্রণী হে রাজরাজেশ্বর,
হে অধিনায়ক, সমবেত গানে-গানে
ঝরাও অঝোর নৈশিকী নির্ঝর—
বন্দে সবাই জিউসের সন্তানে ;
তুমি এসো, আর মাতুক তোমার মত্ত যতেক চর
সারারাত গীতিনৃত্যনাট্যে নায়কের সম্মানে।

[একজন বার্তাবহ প্রবেশ করলো]

তোমরা যারা বার্তাবহ কাদ্‌মস্ নগরীতে থাকো, তারা শোনো,
তোমরা যারা আম্ফিয়ন-নাগরিকবৃন্দ, তারা শোনো,

মানুষের জীবনের মজবুত ভিত্তি আছে কিনা,
বলতে পারবো না। তবে এটা ঠিক, ভাগ্য নামে এক
অদ্ভুত খেয়াল আছে, সে নাচায় সুখী ও দুঃখীরে,
কার কী কপাল কেউ কোনোদিন বলতে পারে না।
শত্রুর কবল থেকে ক্রেয়োন যখন এ-শহর
বাঁচিয়ে সারাটা রাজ্য সাবধান মুঠিতে নিলেন,
পিতার গৌরবে রাজসিংহাসন আলো হয়েছিলো।
তিনি আজ সর্বহারা—সেই তিনি। যে-জন নিজেকে
মন্দভাগা করে সে যে বেঁচে আছে ব'লেই ধরি না,
সে আসলে মারা গেছে: যদি ইচ্ছা করো ঘর ভ'রে
ধনরত্ন জমা করো, জমা করো, যতো ইচ্ছা করো,
রাজার পোশাক প'রে যতো ইচ্ছা রাজা সাজো তবু
যে-রাজ্যে আনন্দ নেই, ছায়া রাজ্য। সুখের বদলে
ছায়ারাজত্বের ছায়া কিনবো ব'লে ভুলেও ভেবো না।

সূত্রধার। এনেছো কী দুঃসংবাদ ? রাজার বাড়ির সর্বনাশ ?
বার্তাবহ। মৃত্যুসংবাদ, কিন্তু যে মেরেছে সে রয়েছে বেঁচে।
সূত্রধার। কে কাকে মেরেছে, বলো ; কোন সে-জল্লাদ ? কে মরেছে ?
বার্তাবহ। আইমোন মৃত, কিন্তু আগন্তুক মারেনি তো তাঁকে !
সূত্রধার। আততায়ী তাহ'লে কি তাঁর পিতা, না তিনি নিজেই ?
বার্তাবহ। পিতৃকর্মে ক্ষুণ্ণ হ'য়ে আত্মহত্যা করেছেন তিনি।
সূত্রধার। ভাবিকথকের কথা ফ'লে গেলো অক্ষরে-অক্ষরে !
বার্তাবহ। যা-ই হোক, এর পর কী কর্তব্য, সেটাই ভাবুন।
সূত্রধার। কিন্তু এ কী, ঐ দেখি ক্রেয়োনের রানী ইউরুদিকে
এই দিকে আসছেন, দ্বারলগ্না দুর্ভাগিনী রানী—
অকারণে, নাকি তিনি আইমোনের কথা শুনেছেন ?

[ইউরুদিকের প্রবেশ]

ইউরুদিকে

ওগো নাগরিকবৃন্দ, আপনাদের কথার গুঞ্জন
কানে আসছিলো, আমি পাল্লাস দেবীর পূজা নিয়ে
মন্দিরে চলেছিলাম, সেইক্ষণে। দরজার শিকল
যেই না খুলেছি অমনি অন্দরমহল থেকে এসে
চাপা শব্দ কানে বিঁধলো, আচমকা আতঙ্কে সংজ্ঞাহারা
মাথা ঘুরে একেবারে প'ড়ে গেছি দাসীদের হাতে :
কিন্তু কী বলছিলেন, সমস্ত বলুন। বহুদিন
আমি দুঃখসহা, আমি সব দুঃখ সইতে পারবো।

বার্তাবহ। মহারানী, সে-ভার নিলাম আমি, যা দেখেছি সবই
নিবেদন করি, আমি এক বর্ণ কমাবো না তার।
একটু গল্পের রং চড়াবো না, সেই রূপকথা
মিথ্যা কথা হবে। তাই সত্য কথা সবচেয়ে ভালো।
মহারাজ যাচ্ছিলেন পাহাড়ের চুড়োয়, যেখানে
মড়া পোলুনাইকেস প'ড়ে ছিলো, কুকুরের দল
ছিঁড়ে-খুঁড়ে গেছে তাকে। প্লুতো, পাতালের যম আর
ত্রিপথেশ্বরী হার্, এই দুই দেবতার কাছে
পোলুনাইকেসের নামে প্রার্থনা করতে বসলাম :
তারপর মৃতদেহ জলে ধুয়ে পাশের বনের
গাছ থেকে ডাল কেটে ছড়ানো মাংসের টুকরোগুলি
জড়ো ক'রে চিতা সাজালাম, শেষে ছাইয়ের উপরে
মাতৃভূমি থেবানগরীর মাটি ছড়িয়ে দিলাম।
তারপর, একটু না-জিরিয়েই খুঁজতে গেলাম
রাজকুমারীর জন্য পাথুরে গালিচা-পাতা ঘর—
যেখানে মরণ তার ঘরনীর জন্য অপেক্ষায়

ওৎ পেতে ছিলো, সেই গুহাগর্তে। আমাদের মধ্যে
একজন শুনতে পেলো কে যেন ককিয়ে উঠলো জোরে,
সে তখনই ক্রেয়োনকে ডেকে আনলো, বাতাসে কে যেন
কেঁদে যাচ্ছে পাষাণব্যথার ভারে, সেই স্বর ধ'রে
সামনে গিয়ে আমাদের মহারাজা ডুকরে উঠলেন—
"হা অদৃষ্ট! বুক কাঁপছে সর্বনাশের আশঙ্কায়।
এমন ভীষণ রাস্তা এ-জীবনে কখনো হাঁটিনি।
এ নিশ্চয়ই রাজপুত্র আইমোনের কান্নার স্বর!
ওরে ও প্রহরী, চল ;—পাথর সরিয়ে গুহামুখে,
দেখি সত্যি আইমোনের গলার আওয়াজ কিনা, নাকি
স্বর্গ থেকে দেবতারা মোরে করে ব্যঙ্গকৌতুক।"
—সঙ্গে-সঙ্গে ছুটে গেছি আমরা সবাই, তারপর
শেষ গুহাগর্তে যেই পৌছলাম, থমকে গেলাম,
পরনে তসরশাড়ি গলায় দড়ির ফাঁস হ'য়ে
মেয়েটিকে ঘিরে আছে, ঝুঁকে সে-মেয়েটি ঝুলে আছে,
আর তার কাঁধে তাকে জড়িয়ে কাঁদছেন আইমোন,
চিরতরে শেষ মিলনের ছিন্ন গাঁঠছড়া ধ'রে
অবলা বধূর কাছে পিতৃভয়ে ভাগ্যহত স্বামী।
রাজা সব দেখলেন, আর্তস্বরে ব'লে উঠলেন :
"এ তুই কী করেছিস, আইমোন? তোর মনে কী ছিলো?
ঘটেছে কী দুর্ঘটনা? আয়, আয়, বাইরে চ'লে আয়,
আমি তোর পিতা, তোর কাছে তোরই প্রাণভিক্ষা করি।"
শুনেও রাজার ছেলে তীব্র ঘৃণাভরে তাঁর দিকে
তাকালেন, রাজার মুখের 'পরে থুতু ফেললেন,
নিঃশব্দে ছোরার বাঁটের ভাঁজে হাত রাখতেই
রাজা পিছু হটলেন, ছোরাটার টিপ ফসকে গেলো,

৩

রাগে ক্ষোভে রাজপুত্র অমনি ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন
ছোরাটার মুখে, বুক ফেটে রক্ত ঝলকে-ঝলকে
ছুটে এলো, তিনি তবু শ্বাস টেনে কাঁপতে-কাঁপতে
বধূকে বুকের মধ্যে ক্ষতস্থানে জড়িয়ে ধরলেন
অবশ দু'হাতে, রক্ত অঝোরে ফ্যাকাশে গাল বেয়ে
পড়তে লাগলো···তাঁর মৃত্যু ঠিক এই ভাবে হ'লো।
মৃত্যু ও মিলন হ'লো একাকার, একটি দম্পতি
উৎসব করার জন্য রাত্রির বাসরে গেলো চ'লে···
যে এ সব ঘটনার প্রত্যক্ষ দর্শক, সে-ই বোঝে
মানুষের দুঃখের কারণ তার অদূরদর্শিতা।

[ইউরুদিকের নিষ্ক্রমণ]

সূত্রধার। এ কী! মহারানী দেখি কোনো কথা না-ব'লে হঠাৎ
চ'লে গিয়েছেন, কেউ বলতে পারো কেন গিয়েছেন?

বার্তাবহ। আমারও অবাক ঠেকছে, তবে, মনে হয়, মহারানী
শোকে মোহমান তবু লোকচক্ষে তাঁর সে-দুঃখ
দেখাতে চান না, তাই চুপি-চুপি কাঁদতে গেছেন।
তাঁর সঙ্গে ঘরের দাসীরা শুধু আড়ালে কাঁদবে,
ভেঙে পড়লেও তিনি রাজরানী, শান্ত, গরবিনী।

সূত্রধার। কী জানি, নিজে তো আমি চরম দুটোই ভয় করি,
মৌন নিথরতা কিংবা বুক-ফাটা কান্নার মূঢ়তা।

বার্তাবহ। যা হোক, এখন সব জানা যাবে। বাড়ির ভিতরে
দেখে আসি কী ক'রে যে মহারানী এত বড়ো শোক
মুখ বুজে সইছেন। মহাশয়, ঠিক বলেছেন,
বোবা নিথরতা পাথরের মতো বুক চেপে বসে।

[প্রস্থান]

সংস্তব

হেরো, হেরো ঐ রাজাও বিফলকাম,
দু'হাতে বহেন নিজের দুঃখভার,
হেরো চঞ্চল মানুষের পরিণাম,
স্বেচ্ছাচারিতা ক্ষয় করে সংসার।

[রক্ষীসহ ক্রেয়োনের প্রবেশ, আইমোনের
মৃতদেহ ক্রেয়োন বহন করছেন।]

ক্রেয়োনের গান

স্থায়ী : এক

অন্ধ চিতে বুনেছিলাম পাপের পরে পাপ,
এখন পরিতাপ,
শক্তিমান—সে বুঝি বাঁধে? সর্বশক্তিমান—
সে বুঝি হানে? তোমরা ছাখো বিচিত্র বিধান।
তোমরা ছাখো—ঘাতক পিতা, নিহত সন্তান!
মৃত্যু নিলো যৌবনের প্রাণ,
এ যেন যুবা নবজাতক সম,
নিশ্বাসের পবন হ'লো নিশ্চুপ পাষাণ,
আমারি পাপ, নিরপরাধ বিগত শিশু মম।

সূত্রধার। বিলম্বিত, মহারাজ, সত্যপথে এসেছেন আজ।

ক্রেয়োনের গান

স্থায়ী : দুই

এখন শুধু রুক্ষ পথ, পারিনে যেতে আর,
বিনত শিরে বহন করি অভিশাপের ভার,
ক্লান্তি নামে ক্লান্তি ছায় দিনান্তে আমার,
দেবতা রাখে আমারে তার পরুষ পদতলে,

অন্ধকার, অন্ধকার, শুধু অন্ধকার,
মিথ্যা হ'লো সকল শ্রম, দিন গেলো বিফলে।

[বার্তাবহের প্রবেশ]

বার্তাবহ। প্রভু, বুকভরা দুঃখে আজ আপনি ব্যথার মালিক,
একটি ব্যথার ভার আপনার দু'হাতে এখন,
আরেকটি আপনার অট্টালিকায়, অপেক্ষায়।

ক্রেয়োন। কোন দুর্ঘটনা? আর কোন সর্বনাশ বাকি আছে?

বার্তাবহ। আমাদের মহারানী, রাজপুত্র আইমোন-মাতা
স্বর্গতা এখন, তিনি সদ্যোমৃতা, দুঃখের আঘাতে।

ক্রেয়োনের গান

অন্তরা : এক

তোমার সাথে কে পারে হাইদাস্‌,
কালান্তক তুমি যে যম পাতালদ্বাম্পতি,
অসন্তোষে কাড়বে কেন আমার নিশ্বাস?
কীর্তিনাশা, এনেছো তুমি এ-কোন দুর্গতি!
মৃত যে-জন, আবার তার প্রতি
নিদয় কেন হানো মরণ-পাশ?
করুণাহীন, এখনো সংহরো,
মরণে কেন আরো মরণ সংকলন করো,
নিয়েছো কেন নারীর প্রাণ, দুঃখে কেন বাড়াও সন্ত্রাস?

বার্তাবহ। দেখুন নিজের চোখে। খুললো প্রাসাদসিংহদ্বার।

[উন্মুক্ত বেদী দেখা যাচ্ছে, ইউরুদিকের মৃতদেহ বেদীতে শায়িত]

ক্রেয়োনের গান

অন্তরা : দুই

বলো কী কাজ এখনো বাকি আর?
কোন কাহিনী এখনো অকথিত?

বাহুতে মোর কুমার সুকুমার
মৃত!
চোখের পরে পুঞ্জীভূত
মরণ জমে। কুমার গেলো! জননী গেলো তার!

বার্তাবহ। ওখানে বেদীর মধ্যে তীক্ষ্ণ ছুরিতে বক্ষ বিঁধে
রাজকুমারের মাতা, রাজরানী। চোখের পাতায়
পূর্বমৃত মেগরিয়াসের জন্য কালো চোখে কেঁদে
তারপর আইমোনের নাম নিয়ে কান্না তাঁর!
সবশেষে পুত্রঘাতী রাজার উদ্দেশে অভিশাপ।

ক্রেয়োনের গান

স্থায়ী : তিন

শঙ্কায় আমি স্তব্ধ অসাড়!
সুতীক্ষ্ণ ছোরা হাতে আছে কার?
কাছে এসে নাও জীবন আমার।
হায়, হায়, আমি কেন বেঁচে আর?
যন্ত্রণা সার, যন্ত্রণা সার।

বার্তাবহ। হয়তো এটাই তিনি চেয়েছেন মৃত্যুর সময়:
"যার জন্যে আমার দু-ছেলে গেছে, প্রতিফল পাক্‌।"

সূত্রধার। কী ভাবে বরণ ক'রে মৃত্যুকে নিলেন মহারানী?

বার্তাবহ। যেই শুনলেন তাঁর পুত্রের মরণে কান্নারোল,
অমনি বুকের মাঝে ছোরাটাকে বসিয়ে দিলেন।

ক্রেয়োনের গান

স্থায়ী : চার

আমার এ-পাপ, আমার এ-শোক,
আরোপ কোরো না নিরপরাধে,
আমিই আমার পুত্রঘাতক,

এই ধরণীর শেষ সীমাতে
নিয়ে যাও মোরে। আমি পলাতক
জন্মদিনেই মৃত্যুফাঁদে !

সূত্রধার। আপনি ভালোই বলেছেন, ঘোর দুঃসময় এলে
যা হবার সেটাই তো অতি দ্রুত হ'য়ে যাওয়া ভালো।

ক্রেয়োনের গান
অন্তরা : তিন

নিয়তি, তোমায় স্বাগত অপার,
মোর শিরে হানো চিরবিরতি,
আনো অন্তিম রাত্রি আমার,
সেই তো আমার পরমাগতি,
দেখতে দিয়ো না প্রত্যূষা আর।

সূত্রধার। কালকের কথা কাল ; আজো কিছু করণীয় কিনা,
ভাবতে হবে। এর বেশি আমাদের চিন্তনীয় নয়।

ক্রেয়োন। মিশেছে আমার কণ্ঠ সবার মিলিত প্রার্থনায়।

সূত্রধার। প্রার্থনা এখন থাক। অনিবার্য অদৃষ্টের থেকে
পৃথিবীর মানুষের একতিল অব্যাহতি নেই।

ক্রেয়োনের গান
অন্তরা : চার

মানবজন্ম গেলো পরমাদে,
এমন জীবন অবসান হোক,
পত্নীহন্তা পুত্রঘাতক—
কে তারে ক্ষমিবে ? নিজেরি হাতে
নিজে মরি আমি। অসহ অমোঘ
তমিস্রভার নিয়েছি মাথে।

[রক্ষীসহ ক্রেয়োনের নিষ্ক্রমণ]

সংস্তব

মানুষের কাছে প্রজ্ঞার চেয়ে মহত্তর
আর-কিছু নেই। বিধাতার বাণী সগৌরবে
নিত্য ধ্বনিছে, সেইখানে মাথা নোয়াতে হবে।
মুখর দম্ভ প্রভুর অনল এড়ালো কবে ?
মহানির্বাণে দর্প হরো,
তার আগে তুমি বৃদ্ধেরে করো জ্ঞানবৃদ্ধ, গোধূলিনভে ॥

ডাকটিকিটে বিপিন পালের মুখ

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

আমি আমার ভালোবাসা পাঠিয়েছিলাম তোমার কাছে,
হে সম্রাজ্ঞী, যেমন অশথডাল
অশথডালকে ভালোবেসে অনায়াসে দাবি জানায়—
কিন্তু তোমার সাপেক্ষ দেশকাল।

তবে আমার ভালোবাসা দেশকালাতীত ধ্যানধারণা ?
করিনে সেই পল্লববিস্তার ;
খুব বেশি দূর যাইনি আমি, আমার শুধু সীমান্ত এই
এদিক-ওদিক বাংলা ও বিহার—

ছুটি হ'লে দেওঘরে যাই, তখন আমার সঙ্গে থাকেন
পথের বন্ধু চারজন পাঁচজন,
এই দেওঘর আগে ছিলো বাংলাদেশের, আজ বিহারের ;
(ছুরি চালান লর্ড কার্জন ?)

বাংলাদেশের মধ্য থেকেই তোমার চিঠি এসেছে আজ,
ডাকটিকিটে বিপিন পালের মুখ,
কিন্তু তুমি চোরা চাবুক মেরেছো ঐ চিঠির মধ্যে,
বিদেশিনীর আঙ্গিকে চাবুক।

চৌকাঠে তাই থমকে আছি, মায়ের দেয়া মোটা কাপড়
ঢেকেছে আজ আমার কঙ্কাল,
ঘরোয়া এই ঘরের ভিতর আমার পাশে স্পষ্টভাষী
ডাকটিকিটের বিপিনচন্দ্র পাল॥

দুটি অপ্রাকৃত কবিতা

তারাপদ রায়

সাইকেল, গাধা এবং ধোপার কাহিনী

'একটা সাইকেল পেলে যাওয়া যেতো
ধোপাদের উজ্জ্বল দোকানে।...'
ধোপার বাতিল, মৃত গাধা
অন্তরীক্ষে হেসেছিলো এইটুকু শুনে।
সে ছিলো অনেক কাল
মনিবের নিত্যসঙ্গী ভাঁটিতে, দোকানে।
সে জানে, ভালোই জানে
উজ্জ্বলতা, কী যে তার মানে,
বিশেষত ধোপার দোকানে॥

গোরস্থান

'মোল্লার ইজ্জৎ নেই, গোলাম-বাদ্‌শারও...'
এই নিয়ে হাসাহাসি ক'রে
খেঁকশেয়ালের তিন তরুণ শাবক
অন্ধকারে গোরস্থানে নিস্তব্ধতা ফেলে চ'লে গেলো।

মাঝরাতে আশশ্যাওড়ার ঝোপ থেকে
উঠে এলো হলুদ করুণ চাঁদ বাদামি আকাশে
সঙ্গে এক শীর্ণ চামচিকে।

কবরে মাটির নিচে পাশ ফিরে শুতে কষ্ট হ'লো ;
ফজল গুণ্ডার আত্মা জানলো না
তার কালরজনীর বিবি
আজো চোখে সুর্মা এঁকেছে॥

তিনটি কবিতা

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

কোনো দার্শনিক কবিকে

তুমিও জেনেছো শীত ভোরবেলা হিমেল হাওয়ায়,
বিলোল তৃষ্ণার ছলে নামঞ্জুর ঠোঁটের কাকলি,
তবে কেন স্তোক দাও, দর্শন উজাড় করো অমুক সভায়—
যেন হতবাক ছিলে, এইমাত্র জেনেছো সকলই।

ভাবি, কেন চোখ দিলে; ঐ ভাবে শিস দিয়ে গেলে
গ্রামের ভাঁড়ের দলে এতদিন রঙিন মেলায়
পাখির পালক চুলে হরবোলা হতেম বিকেলে—
কেন শ্লেট হাতে নিয়ে ডাক দিলে আরেক খেলায়?

জানো, স্নায়ু তীব্র কত। একভাবে তপ্তজল ঢালে
মুদি, কি পরম জ্ঞানী, (বাজারের ক্লান্ত লেনদেনও),
ভুলেছো, কেমন রোদ কমবেশি মেখেছি সকালে—
যদি সব মনে থাকে, তবে আর পংক্তি লেখা কেন॥

সম্পর্ক

সবাই গুছিয়ে নেয় : মেধাবী, কি নিতান্ত অবোধ,
অনন্তের ধ্যান চোখে তুলে নেয় মুহূর্তের মেকি—
কিন্তু, যে-লোকটা তার কোনোদিন বোঝেনি আমোদ,
অজস্রের হাহাকারে তার কোনো স্বপ্ন ছিঁড়েছে কি?

* * *

ছিলো কি রাজার হালে? ঘর, ফুল, পাথর, অথবা
আস্ত মানুষ যার ভাঁড়ারের কৌটো ভ'রে থাকে—
কিন্তু বাহবা দিলে আসরের অন্ধকারে বোবা
সে খোঁজে নিজের দুর্গ, চোখ ভাবে গাছের পাতাকে।

কোথাও পৌঁছবে কিনা, সে এখনও নিজেই জানে না—
শব্দ ছাড়া কিছু নেই, শব্দে তার স্বোপার্জিত ক্ষমা,
জয়, পরাজয়, গ্লানি, বাচালের উচ্ছ্বসিত ফেনা,…
সমস্ত ফুটিয়ে নেয়, অল্প আঁচে, একটি উপমা॥

অপেক্ষা

একটা কথা আমায় জানতে হবে
ওরা আমায় পাহাড় থেকে
গড়িয়ে ঠেলে দিলো কেন?
ঠেলে যদি দিলোই, তবে হাওয়াও কেন অমন মৃদু ভ্রমর,
ঘুরে-ঘুরে, মা গো, আমায় ঘিরে-ঘিরে সুরের মতো ওড়ে।

নইলে, ঐ পূর্বপুরুষ সাতটি তারার চোখে ঢ'লে
ঘুমের ছলে আমায় ডেকেছিলেন; তবু, সেদিন
যাইনি, আমায় জেনে নিতে হবেই ব'লে—
কেন ওরা পাহাড় থেকে, পাহাড়তলির বাড়ি থেকে
আমায় অমন অতর্কিতে ঠেলে দিলো।

একটা কথা আমায় জানতে হবে।
দু-তিনটে লোক অমন ক'রে তাকায় কেন ভিড়ে,
কেমন ক'রে জানে আমার রক্তে কোনো আগুন আছে কিনা—

পরখ ক'রে দেখতে যদি ভালো লাগে,
ওরা আমার পাঁজর ছেড়ে, আমার পথের ধুলো ছুঁয়ে
অট্টহাসি ক'রে উঠলো কেন—
একটা কথা আমায় জানতে হবে।

বুকে অনেক দুঃখ কিন্তু আমার কথা কাউকে বলিনি—
ধূর্ত চোখে ছোরা জ্বলবে ভেবে এখন রাত্রে ব'সে আছি,
ম'রে যেতে-যেতেও দেখবো, কোনো নদীর জলে এসে
ওদের ছায়া লজ্জা হ'য়ে কাঁপে কিনা—
লুটোয় কিনা কোনো নদীর বিশাল নীল ছায়া।

একটা কথা আমায় জানতে হবে।
কেমন ক'রে জানে ওরা, এখানে শেষ ওখানে তার শুরু,
কোনো ঘরের দেয়াল বেয়ে লতা উঠছে কিনা—

একটা কথা আমায় জানতে হবে।

দুটি সনেট

স্তেফান মালার্মে

তোমার গল্পে প্রবেশাধিকার পাওয়া…

(M'introduire dans ton histoire...)

তোমার গল্পে প্রবেশাধিকার পাওয়া
—যেন সচকিত বীরের সতর্কতা
নগ্নচরণ হ'য়ে, তার অন্যথা
কিঞ্চিৎ সেই জমি ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যাওয়া

যেখানে অনেক হিমবাহ-ভাঙা হাওয়া—
জানি না সে-পাপ, তাতে কৌশলপ্রথা
থাকুক, করে না তোমার অনন্যতা
আমাকে রুদ্ধ। আমি হেসে জিতে যাওয়া।

বলো, যদি আমি না হই আনন্দিত,
পদ্মরাগ ও বজ্রে আবর্তিত
এ-অগ্নিমুখ হাওয়াকে কী ক'রে রত

দেখি অরাজক ছড়ানো রাজ্যে, যাতে
সে-মৃত্যুমুখ রাজকীয়তার মতো
আমার সন্ধ্যারথের চাকায় মাতে।

সে এক অলকগুচ্ছ
(La Chevelure...)

সে এক অলকগুচ্ছ, অগ্নিশিখ উচ্চ বাসনার
সুদূর প্রতীচী যেন মুক্ত করে সর্ব আবরণ
প্রচিত (বলি, সে যেন মৃত্যু এক রাজক্ষমতার)
জয়মৌলি ভ্র'তে তার উত্তাপের মাটি সনাতন।

অস্বর্ণাভ তবু, তাই দীর্ঘশ্বাস! এ-জীবন্ত মেঘ
অর্চিস্ময় সম্ভাবনা সর্বদাই রাখে অন্তরীন
মূলত যেখানে শুধু এক পাবে প্রবাহ-আবেগ
রত্নময় চোখে, হোক উৎসাহী বা ছলনারঙিন।

স্পর্শভীরু নায়কের উলঙ্গতা প্রকাশিত ক'রে
তাকে যা না গতিময় তারা কিংবা অর্চি তর্জনীর
আনে না তবুও শুধু সরলার্থে সে-মেয়ের পরে
সগৌরব শিরোশোভা, অর্চিস্ময়, প্রবঞ্চিতাটির

চুনিতে রোপণ হলে যতো প্রতিপালিত সন্দেহ
যেন এক আনন্দিত রক্ষয়িতা আলোকের দেহ।

অনুবাদ: প্রণব চট্টোপাধ্যায়

দুটি কবিতা

তরুণ সান্যাল

প্রতিহারীর বিলাপ

দীর্ঘ দেবদারু গাছ জঙ্ঘায় তোমার,
স্তনযুগে ক্ষিপ্র ফণিমনসার কাঁটা,
পাটভাঙা নীল শাড়ি ছিঁড়ে নেয় ত্বক, সমারোহে
একে অন্যে জলাঞ্জলি দেয়, চায় মূল্য উপমার—
আমি আছি দুঃখের প্রলয়ে।

দূরে-দূরে ছায়াচ্ছন্ন কুঞ্জ, ওরা কামনার মধ্যরাত্রি হাতে
সমুদ্রের ভূকম্পনে দ্বীপ—
লক্ষ প্রদীপের শিখা দাবানল-জ্বালানো আঙুলে
স্বর্গের দুয়ার তুমি, আমি প্রতিহারী
ঐ কুঞ্জে কীট আছে, সেও আমি, যৌবনের ফুলে
ঘিরে আছে দশ পাপড়ি, আমার নখের তরবারি।

এখন রক্তের গাঢ় অন্ধকারে ঘুম ফেরে জোনাকি আলোর
উত্তীর্ণ তীর্থের দিকে প্রসারিত ব্যাপ্ত করতল—
(আমায় ফেলো না এই শূন্য প্রান্তরের পথে যেতে
'হাওয়া হবে পিপাসায় জল')।

আমি অন্তরালে আছি গুপ্ত ঘাতকের মনে, দ্বারী
কে যায় মহলে, যাও, পাতা, ফুলে ফলে গন্ধে নারী॥

অশ্রু

কোথাও তো জল নেই, কিন্তু জলধারা
এই ভাখো করতলে, এই ভাখো জল,
আমার জন্মের আগে কতবার সূর্য উঠেছিলো
কতবার মেঘ হ'লো স্রোত, হ'লো আকাশগঙ্গার চলাচল,
আমার সে-দুটি আয়না দুটি করতল।

প্রিয় গান, প্রিয়তম সুর, এক নারী, একটি বেহালা,
শেষরাতে চাঁদ-ওঠা শুদ্ধতার সুরা
আমার চোখের ঘন বিশৃঙ্খল অরণ্য, মরণ
প্রান্তরের শিশিরে বিছানো—
আমি পেতে চাই ব'লে, কণ্ঠে দোলে কলঙ্কের মালা।

সপ্তর্ষি দেখি না, ঐ কালপুরুষের খড়্গ, আমি
রোদের বর্ণালি আর মৃত তারাদের কমণ্ডলু
ধারণ করেছি চোখে, বুকে যথাক্রমে—
যেতে চাই কালের সংগমে,
যেখানে নির্বাক শিলা ভূত, বর্তমান ও আগামী—

কোথাও তো জল নেই, করতল,
আমার দর্পণ করতল॥

উনগারেত্তির কবিতা

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

উনিশ শতকের শেষ থেকেই য়ুরোপের কবিতায় পালা-বদল শুরু হ'লো। তথ্যবিস্তার, লোকরঞ্জন, রাজনীতি—ইত্যাকার পুণ্যার্জন ছাড়াও কবিতার যে অন্য লক্ষ্য থাকতে পারে, এবং সে-লক্ষ্য যে কম কাম্য নয়, এ-বিষয়ে একমত হলেন অনেকে। বস্তুত, এই পালা-বদলের মূলে ছিলো বিশুদ্ধতার প্রেরণা: কবিতাকে বিশুদ্ধ হ'তে হবে, যা বর্জনীয় তা নির্দ্বিধায় পরিত্যাজ্য, গড়নে খাটো হোক, আকারে-প্রকারে গতকালের মেদলালিত্য না-থাকুক—তাকে নির্ভার হ'তে হবে, নির্বহুল, প্রয়োজনবোধে নিরলংকার। এডগার পো দীর্ঘ কবিতার জাত মেরেছিলেন; শুধু তা-ই নয়, তিনি বুঝেছিলেন যে-কোনো শিল্পকর্মের পক্ষে রহস্যারোপ এবং প্রতীকধর্মের প্রয়োজনীয়তা কতখানি। অর্থাৎ সেই সব লক্ষণ, যার ফলে কবিতার দৈর্ঘ্য বাড়ে না, ঘনত্ব বাড়ে, এবং ইঙ্গিতের খোরাকে আমাদের কল্পনাশক্তি লাভবান হয়। পো প্রথম শ্রেণীর কেন দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিও যদি না-হন, তাতে কিছু এসে যায় না, সাগর-পারের একটা দেশ যখন তাঁকে সামনে রেখে কবিতায় প্রায় যুগান্তর নিয়ে এলো, তখন তাঁর ঐতিহাসিক মূল্য অবশ্যস্বীকার্য। যাকে দীর্ঘ কবিতা বলে, ফ্রান্সের প্রতীকী কবিরা সেখান থেকে গা বাঁচিয়ে চলতেন, কিন্তু ছোটো কবিতাই যে লিখতে হবে, এ-রকম কোনো জেদ ছিলো না তাঁদের। কার্যত, মোটামুটি দীর্ঘ কবিতা তাঁরা অনেকেই রচনা ক'রে গেছেন। কিন্তু ফিতে-মাপা কবিতার আকারটাই এখানে সবচেয়ে বড়ো কথা নয়, আমাদের জানবার কথা হ'লো যে—কী ভাবে রোমান্টিক আতিশয্য এবং উচ্ছ্বাসকে পরিত্যাগ করতে শিখলেন কবিরা, শিখলেন যে শব্দশুদ্ধি এবং উপমাসৃষ্টিই কবির প্রাথমিক কর্তব্য, নিসর্গ শুধু বর্ণনার বিষয়বস্তু নয়—বরং উপমার উৎস, প্রতীকের জননী। ফলত, কবিতার শরীর আর নড়বড়ে থাকলো না; একটু বা রোগা হ'লো, একটু সংহত, কিন্তু শৈথিল্যরহিত, এবং যথাসাধ্য বিশুদ্ধ। আবার পার্নেসিয়ানদের

পদ্যের মতো আকারসর্বস্ব নয়, মালার্মে কবিতাকে শক্ত ফ্রেমের মধ্যে এঁটেও ছড়িয়ে দিলেন, ভের্লেনে শব্দ আর প্রতীক গুঞ্জিত হ'য়ে উঠলো।

বিশ শতকের ইতালীয় কবিতায় ফরাসী কবিতার, বিশেষত ফরাসী সিম্বলিস্ট কবিতার প্রভাব লক্ষ্য ক'রে ঐতিহ্যধারক কোনো-কোনো ইতালীয় সমালোচক যে-আক্ষেপ করেছেন, তাতে আমরা সায় দিতে পারি না। কেননা, ফরাসী কবিতা থেকে ইতালির কবিরা সেই গুণগুলিই বেছে নিয়েছেন, যা আমরা এইমাত্র আলোচনা করেছি, এবং খুব সংক্ষেপে, যাকে বলা যায়: বিশুদ্ধ কবিতার প্রতি আগ্রহ। বলা বাহুল্য, অন্য যে-কোনো দেশের মতো ইতালিতে এই আধুনিক কবিরা অবহেলিত এবং তাঁদের যে 'আলোছায়ার কবি' বলা হয়, তার কারণ প্রধানত এই যে তাঁদের কাব্যচর্চায় পূর্বসূরীর প্রাচুর্য বা প্রভূত ঔজ্জ্বল্য নেই, কার্‌দুচ্চির শ্রান্তিহারক আশাবাদ নেই, এমনকি দান্নুন্‌ৎসিয়োর আলংকারিক উচ্ছ্বাস পর্যন্ত বহুলাংশে অনুপস্থিত। অন্যদিকে, আমি যাঁদের কথা এই মুহূর্তে মনে রাখছি—সেই উনগারেত্তি, মনতালে, বা কাসিমোদোর সঙ্গে আধুনিক ইতালির চাঞ্চল্যকর কবি ফিলিপ্পো মারিনেত্তির কোনো সম্পর্ক নেই। কিংবা, তাঁর সেই ফিউচারিস্ট ইস্তাহারের সঙ্গে, যার মূলমন্ত্র ছিলো যন্ত্র, যুদ্ধ, আর গতির জয়গান, এবং যার প্রথম লাইন শুরু হয়েছিলো এইভাবে, "স্পর্ধা, দুঃসাহস, আর বিদ্রোহ—এই হচ্ছে কবিতার সারাৎসার"। কিন্তু উনিশ শো বারো সালে, ফিউচারিস্ট ইস্তাহার বেরোনোর তিন বছর পরে, সম্পূর্ণ অন্য রকম একটি ইস্তাহারে একে-একে স্বাক্ষর পড়লো কয়েকটি কবির। উনগারেত্তির এই ইস্তাহারে জোর দেয়া হ'লো শব্দের ওপর, শব্দের মুক্তির ওপর; স্থির হ'লো, পংক্তিবিন্যাসে ব্যাকরণের নিয়মই যে মানতে হবে, তার কোনো মানে নেই। শব্দচেতনা, উপমার প্রতি যত্ন, পংক্তিবিন্যাসে স্বাধীনতা—এ-সমস্তই উনগারেত্তির কবিতায় প্রাপ্য, এবং সমস্ত কিছুই প্রকারান্তরে ফরাসী প্রতীকী কবিতার প্রতি প্রযোজ্য। কিন্তু বাইরের দিক থেকে একাধিক উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য সত্ত্বেও, ফরাসী সিম্বলিস্টদের বিশুদ্ধ কবিতার ধারণা থেকে উনগারেত্তির নিজস্ব ধারণাটি স্বতন্ত্র। জীবনের সঙ্গে

শিল্পের পার্থক্য, জীবনকে প্রকৃতিকে শিল্পের উপকরণ হিসেবে গ্রহণ, কৃত্রিমের বন্দনা, জীবনচর্চার স্পর্শে শিল্পের সম্মানহানির আশঙ্কা—সব কিছুই, কোনো-না-কোনো ভাবে, ফরাসী সিম্বলিস্ট কবিতায় উপস্থিত। মালার্মের এরদিয়া এবং তাঁর ধাত্রী যথাক্রমে শিল্প এবং জীবনের প্রতীক—ঘুরে-ঘুরে, একটু অন্য ভাবে, এই বিপরীতের প্রতীক তাঁর কবিতায় ধরা পড়েছে। জীবিতার স্তন উপেক্ষা ক'রে মালার্মে আমাজনীয় স্তনের বন্দনা করেছেন শুধু এই কারণে যে দ্বিতীয়টি মৃত, অ-প্রাকৃতিক, বিশুদ্ধ, এবং শিল্পের কাছাকাছি।

কিন্তু উনগারেত্তির 'একটি মানুষের জীবন',* যেখানে তাঁর চারটি বইয়ের কবিতা সংকলিত হয়েছে, তার ভিত্তিভূমি স্বতন্ত্র। জীবন এবং শিল্প, প্রকৃতি এবং শিল্প সম্বন্ধে ফরাসী প্রতীকী কবিরা যে-ধারণা পোষণ করতেন, উনগারেত্তি তা করেন না। এ-বিষয়ে আদৌ কোনো ধারণা তিনি সচেতনভাবে পোষণ কিনা, সে-সম্পর্কেও কোনো কৌতূহল জাগে না আমাদের। তিনি বিশুদ্ধতার চর্চা করেন সোজাসুজি ব'লে দেবার কৌশলে। অনুবাদের সাহায্যে প'ড়েও মনে হয়—প্রত্যক্ষতাই তাঁর বিশুদ্ধতা। দু'একটি মুহূর্ত, একটি মূড, আর তার চারপাশের ছেঁড়া-ছেঁড়া ঘটনার মধ্যে বহুদূর থেকে একটি দীর্ঘ আলো এসে পড়লো—উনগারেত্তির কবিতা প'ড়ে এ-রকম অনুভূতি হয়।

প্রথম বইটি থেকে সংকলিত কবিতাগুলিতে 'আমি' শব্দটি বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিতীয় বই থেকে 'আমি'-র সংখ্যা কমতে শুরু করেছে—কিন্তু কখনোই বিলুপ্ত হয়নি। তিনি যে মূলত লিরিক কবি, একটি বিশেষ অবস্থায় বিশেষ পরিবেশে একটি বিশেষ 'আমি'—এই ছবিটি কখনো-কখনো একটি পুরো কবিতা হয়েছে (যেমন, 'সন্ধ্যা', 'সকাল'), কখনো-কখনো একটি কবিতার অংশ হয়েছে (যেমন, 'আমি একজন প্রাণী', 'নদীরা')। 'তীর্থযাত্রা' কবিতায় তিনি স্বয়ং নিজেকেই সম্বোধন করেছেন—এবং প্রায় চীনে কবিতার ধরনে বা পাউণ্ডের কোনো-কোনো ছোটো কবিতার মতো তাঁর এই

*Life of a Man: Giuseppe Ungaretti, a version with an introduction by Allen Mandelbaum Hamish Hamilton, London and New Direction, New York. Bilingual.

কবিতাগুলিতে তুলির ছোটো-ছোটো টানের পর অনেকটা জায়গা যেন নির্বিবেক খালি প'ড়ে থাকে। কিন্তু চীনে কবিতা সাধারণত যেমন একটি অপরিমিত আলস্য এবং মধুর অবসাদে শেষ হয়, উনগারেত্তির কবিতাপাঠের অনুভূতি সর্বত্র এ-রকম নয়। বরং যা উদ্দীপ্ত করে, চকিত করে—এমন উপকরণই বেশি।

উনগারেত্তির কোনো-কোনো কবিতার আকার লক্ষ্য ক'রে চমকে উঠতে হয়। দু'লাইন, তিন লাইন, কখনো-কখনো এক লাইনের কবিতা। 'I illumine me / with immensity'—একটি সম্পূর্ণ কবিতা ; 'Of other floods I hear a dove'—অন্য একটি কবিতা, এবং এ-ধরনের উদাহরণ এখানেই শেষ নয়। প্রথম চোখে পড়বার মতো বৈশিষ্ট্য তাঁর কোনো-কোনো কবিতার এই আকারহ্রস্বতা হ'তে পারে, কিন্তু তাঁর ভালো কবিতাগুলো, সৌভাগ্যত, দীর্ঘতর। কবিতাকে সংহত, সংযত, এবং ইঙ্গিতময় করবার দিকে আমরা উৎসাহী, কিন্তু এই দু'লাইন এক লাইনের এপিগ্রামকে ঠিক কবিতা বলা যায় কিনা সে-বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করা যেতে পারে। বিশেষত, উনগারেত্তির কোনো কবিতা যখন মন্তব্যেই শেষ হয়েছে। 'Of other floods I hear a dove'—বাইবেল, এবং বাইবেলীয় পুরাণের ওপর একটি মন্তব্য। সুন্দর, কিন্তু একে কবিতা বলবো কেন?

আলোচ্য গ্রন্থে বাইবেলের ঘটনার উল্লেখ আছে, শেষ অংশে প্রায় সমগ্র 'ঈনিড' প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে, ভূমিকা লেখক আলেন ম্যাণ্ডেলবম এ-বিষয়ে গুরুগম্ভীর মন্তব্যও করেছেন। উনগারেত্তির কবিতা হয়তো স্থানে-স্থানে দুর্বোধ্য, তৎসত্ত্বেও এ-কথা বলা যাবে না যে তাঁর কবিতার দুর্বোধ্যতার কারণ কোনো গোপন উল্লেখ, বা লুক্কায়িত শাস্ত্র। কবিতা দুর্বোধ হয় সাধারণত দুটি কারণে। এক, যখন কবির কোনো স্বতন্ত্র নিয়মাবদ্ধ জগৎ লুকিয়ে থাকে কবিতাটিতে, যেখানে অর্থোদ্ধারের একটি চাবি সংগ্রহ না-করলে আমাদের হোঁচট খাবার আশঙ্কা পদে-পদে। যেমন, ইংরেজি ভাষার মেটাফিজিকাল কবিতা। আবার, এমনও হ'তে আরে, কবিতাগুলি

দেখতে-শুনতে অত্যন্ত সরল, কোনো আগে-থেকে-ভেবে-নেয়া নিয়মের জগৎ নেই সেখানে যেজন্যে কোনো চাবি খুঁজে নিতে হবে, অথচ কিছুতেই—অন্তত বার-বার না-পড়ার আগে—যার অর্থ ধরা দিতে চায় না। যদি প্রথম শ্রেণীকে অর্থগত দুর্বোধ্যতা বলা যায়, দ্বিতীয় শ্রেণীকে কী বলবো? অনুভূতিগত দুর্বোধ্যতা? ধর্মশাস্ত্র, এবং ক্লাসিকাল সাহিত্যের ইতস্তত উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও উনগারেত্তির কবিতার দুর্বোধ্যতা এই দ্বিতীয় শ্রেণীর।

'খুব অল্প জ্বরে মসৃণ, এ-রকম কাচ যেন রাখালের হাত দুটি' (দ্বীপ), বা 'ক্লান্ত এক ভুরুর মতো রাত ফিরছে মুঠোর গর্তে' (প্রতিটি ধূসর)—এ-ধরনের পংক্তিকে সুবোধ্য বলবার কোনো উপায় নেই, এবং এই পংক্তির ব্যাখ্যা কোনো শাস্ত্রৈষণার দ্বারা সম্ভব নয়। এই উপমার লক্ষ্য আমাদের অনুভূতি।

উপমারও প্রকৃতি আগাগোড়া এক রকম থাকেনি। প্রথম দিকের উপমার ইম্প্রেশনিজম, ও আর্দ্রতা কেটে গিয়ে যেন ক্রমশ শক্ত, কঠিন এক পৃথিবী উন্মোচিত হয়েছে তাঁর শেষ দিকের কবিতায়। কবিতাগুলো প'ড়ে মনে হয় তিনি যেন খোদাই ক'রে-ক'রে লিখছেন, এবং সমস্ত কবিতার একটা শক্ত, পাথুরে ভাব এমনভাবে জায়গা জুড়ে থাকে যে কোনো-কোনো পংক্তিকে স্থানে-স্থানে গুরুভার মনে হয়। 'মাটি', 'পাথর'—এই স্পর্শসহ পদার্থগুলো উল্লেখযোগ্যভাবে স্থান নিয়েছে তাঁর কবিতায়, এবং স্পর্শসহ কাঠিন্যের প্রতি উনগারেত্তির ঝোঁক কখনো রিলকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় আমাদের, কখনো বা সেজানের। এবং, সমস্ত বইটা শেষ ক'রে উঠে শুধু মনে হয় যে; এখানে এমন একজন কবির সন্ধান পাওয়া গেলো যিনি প্রত্যেকটি শব্দ ব্যবহার করতে বহুবার চিন্তা করেছেন, এবং 'Between one flower gathered and the other given the inexpressible Null' ('চিরন্তন') কবিতাটি তাঁর প্রত্যেক কবিতাতেই ঐকটু-একটু ক'রে আছে, অর্থাৎ সেই শব্দটি আছে, যেটি ঈশ্বরদত্ত, অমোঘ, নির্মল, এবং অন্যটি—যাকে কাঠখড় পুড়িয়ে সংগ্রহ করতে হয়েছে। ক্রোচে-কথিত 'বিশুদ্ধ স্বজ্ঞা', যা সব-কিছুকে এফোঁড়-ওফোঁড় ক'রে একটি উজ্জ্বলতায় উপস্থিত হ'তে চায়, উনগারেত্তির কবিতায় তা দেখতে

পাইনি বললে ভুল হবে। বস্তুত, 'জাহাজডুবির পর একটি ছিটকে-আসা নেকড়ে', 'হাওয়ায় গুঞ্জিত পাথরগুলোর ওপর চিতাবাঘের মতো তুমি', 'জ্বলন্ত নীরবতার মতো প্রেম,' 'আগুন-চোখের সেই নেকড়ে যা একটি বোঁটার মতো সমস্ত নগ্ন নির্জনকে ধ'রে রাখে,' অর্থাৎ—উনগারেত্তির উপমার সমস্ত সংসার যেন বিশেষ একভাবে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে ছিলো। আমরা, একবার, এক মুহূর্তে তাদের যথাস্থানে দেখতে পেলাম।

এই সংকলনে উনগারেত্তির চারটি গ্রন্থ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। প্রথম গ্রন্থের নাম 'আনন্দ', দ্বিতীয়টির—'সময়ের চেতনা বা বেদনা', তৃতীয়টির—'বিষাদ', শেষ গ্রন্থটির নাম—'প্রতিশ্রুত দেশ', এবং সংকলনটির নাম, 'একটি মানুষের জীবন'। সার্থকনামা। শেষ গ্রন্থটির 'কোরাস…' এবং অন্যান্য কবিতা সত্যিই তাৎপর্যময়। ঈনিস, যিনি সুন্দর, এবং ঈপ্সিত দেশের স্বপ্নই যাঁকে চিরকাল উৎসাহ জুগিয়ে চলে—উনগারেত্তির শেষ দিকের কবিতায় তিনি একজন প্রধান প্রতীক। উনগারেত্তিও বিশুদ্ধতমের স্বপ্ন দেখেন, শব্দগুলোকে ছাঁকতে-ছাঁকতে এমন এক জায়গায় পৌঁছে যান—যার পরে শুধু অপেক্ষা করে—

'Gleam unseen of the dazzled
Spaces where the stars
Pass immemorable life
Wild with the weight of solitude.'

বইখানার অনুবাদক মার্কিন, মুদ্রাকর ইতালিয়ান, আমেরিকা, ইংলণ্ড ও ইতালিতে একসঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। ইংরেজি ভাষায় উনগারেত্তি এই প্রথম অধিগম্য হলেন, এবং যদিও কিছু দেরি হ'লো, অনুবাদক ও প্রকাশক ব্যাপারে ভাগ্য তাঁর সহায় হয়েছে। অনুবাদে কোথাও আড়ষ্টতা নেই, কোনো-কোনো কবিতা প'ড়ে মনে হয় তা ইংরেজি ভাষারই আধুনিক কবিতা। বইখানা পেপ্যার-ব্যাকে বের করার জন্য আমরা প্রকাশককে অনুরোধ জানাই।

পাস্‌টেরনাক-এর প্রসঙ্গে

অমিয় চক্রবর্তী

[বুদ্ধদেব বসুকে লিখিত পত্র]

প্রিয়বরেষু

আপনার চিঠি পাওয়ামাত্র পেপার-ব্যাক্‌গুলি অর্ডার দিয়েছিলাম। সব বই এসেছে; একত্র কাল রওনা ক'রে দেব। সামান্য উপহারস্বরূপ আপনাকে কিছু সদ্যপ্রকাশিত বা অধুনা মুদ্রিত গ্রন্থ পাঠিয়েছি। আপনি গ্রহণ করবেন। সঙ্গে রইল পাস্টেরনাক-এর "আত্মজীবনী" সংবলিত ক্ষুদ্র রচনাসংগ্রহ।

পাস্টেরনাক-এর গদ্যসংকলনে পেলাম উৎকৃষ্ট শিল্পের নিদর্শন। হয়তো বইটা আপনি পূর্বেই পড়েছেন। ভ্রামণিক চিত্র ভোলবার নয়—যেমন ভেনিসের অনুভব-দৃশ্য—সব সুদ্ধ বড়ো আশ্চর্য এবং যথার্থ। শুধু ভাব নয়, আবির্ভাব। আর্শির কাচে বিশিষ্ট একটি মনের নিভৃত বার্তার সঙ্গে প্রতিফলিত হয়েছে বাহিরের সূক্ষ্ম চলচ্ছবি। ধরনটা মনে করিয়ে দেয় Kafka বা Rilke-র একটা দিক। যেখানে তাঁরা ডুব-সাঁতারি। ডাঙার ঘটনা জলের তল থেকে দেখেন অথচ অবতরঙ্গে মেলানো পটে খুঁটিনাটি বাস্তবের ভিড়। কখনো যে সরাসরি রাস্তাঘাটের সংবাদ ধরা পড়ে না তা নয়, কিন্তু সলিল থেকে ওঠা চুল-চেরা ক্যামেরার দলিল এঁরা পেশ করেন প্রতিভার বিকল্পে। কথাবার্তা কখনো ঘনধারা, এবং জরুরি; কখনো জড়োয়া মেঘে অন্তর্হিত; আকাশের পরিচয়ে তাদের উদ্দেশ্যবিচার সম্ভব, বক্তব্য হিসাবে ততটা নয়। পাস্টেরনাক্‌ও বিচিত্র ভঙ্গীর অনুসারে ভোগ্য, ভাব্য, স্পর্শিত বা দর্শনীয়কে তুলির টানে ঐক্য দিয়েছেন, মন-কেমনের প্রেক্ষিতে তাদের গূঢ় সত্তা ধরা পড়ে, কখনো পড়ে না। স্মৃতির সুতো অদ্ভুত, যা হয়নি তাও যেন বাঁধা হল; যা ছিল বা আছে তার পারম্পর্য খুঁজতে হবে শিল্পীর দারুণ ইচ্ছায়, কালের বাহিরে। আগন্তুকের চুলে বা কণ্ঠের ধ্বনিতে প্রমাণিত হল বিদীর্ণ ভুলে-যাওয়া সংকট, কেউ জানে না ঠিক কী হল, লেখকও নয়, কিন্তু স্বীকৃত হল

নির্ঘাত সত্য। গল্পের ধারা বইছে ঐতিহাসিক ক্রমান্বয়ে নয়, মর্জির সমন্বয়ে। মধ্যে যদি জোর তুষার প'ড়ে থাকে তাহ'লে বাড়ির বা রাস্তার নাম ঠিকানা পর্যন্ত আদৌ বদ্‌লে যাবে, হয়তো রঙের বদল বেদনার চেয়ে বড়ো পরিবর্তন, ঐ শহরে থাকা সইল না। অথচ তলে-তলে যেন যুক্তির চেয়ে বড়ো যুক্তি ক্রিয়াশীল, অনিবার্য হ'য়ে দেখা দেয়, হয়তো প্রতীক হ'য়ে। মার্বুর্গে অধ্যয়ন-কালে পাস্টেরনাক্ জর্মান দর্শনের বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন, অথচ সরকারিভাবে Existentialismএর পশ্চিমী অস্তীতি-তত্ত্ব দেখা দেবার পূর্বেই তাঁর লেখায় ছুঁয়েছিল আধুনিক জর্মান এবং ফরাসী শিল্পদর্শনের প্রাথমিকতা।

বই থেকে নেয়া, বা কাল্পনিক আরো উদাহরণ। ন্যায়ের যুক্তি পাখা মেলে উড়ে গেছে, মুক্তি ঠেকল তিনটে নোনা লাল ফলে, গাছের তলায় ছড়ানো। এরা আছে, এই। ভালো ক'রে ঠাহর হলে মন যে কোনো-কিছুতে যুক্ত হয়, তাতেই সম্বন্ধের তৃপ্তি উছলিয়ে ওঠে। গ্র্যাণ্ড ক্যানালের বিখ্যাত জল দেখলেন রুষীয় কবি, প্রাচীন মলিন অথচ তার মসৃণ প্রবাহ সন্ধ্যায় জ্ব'লে উঠল ইতালির তারা, ধরা দিল গণ্ডোলার বিহ্বল ফোটোগ্রাফ। কত যুগের মহান সভ্যতা প্রক্ষিপ্ত কোনো একটি মুহূর্তকে অবলম্বন ক'রে দৈবে দেখা দেয়, এবং বিশেষ নির্ভর যেন এই দূরাগত কবির চোখে। যা মনে হয় আকস্মিক, বা অকিঞ্চিৎকর তারই উপরে পাস্টেরনাক-এর ঝোঁক; তিনি উদ্ধার পেয়েছেন হঠাৎ সংলগ্নতায়। ঝর্নার শব্দ বা স্রোত তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধু, সাংঘাতিক অবস্থায় তাঁকে বহুবার আশ্রয় দিয়েছে (স্বজীবনীতে; ডাক্তার জিভাগো উপন্যাসে); মর্মরজালে বেঁধেছে চুরমার অথবা ঠিকরে-পড়া বর্তমানকে। না-হ'লে ট্রেনযাত্রীর মহাদুঃখ, অন্যমনস্ক বড়ো-বড়ো গাছ, রক্ষা করা যেত না। খিদের গেলাস, চিরুনি, পুঁটুলি-ভরা বাসনার উদ্বেগ অতীতের ঝড়ে অথবা নব্য প্রলয়ে তছনছ হ'য়ে চৈতন্যে হারাতো। অনির্দেশ সন্ধান আছে প্ল্যাটফর্মের পাশে দরিদ্রা দোকানি-মেয়েদের চীজ্ বা সসেজ্ বিক্রির আশায়, যার প্রান্তে ঘন অরণ্য। যুদ্ধের অশ্লীলতায় বা সামরিক ক্রেতার জন্তু-বাক্যে ও ব্যবহারে প্ল্যাটফর্মের কোণে সেই কেনা-বেচার

অপমৃত্যু ঘটল না। তার একটা কারণ তখনো ঝর্নার ধ্বনিতে একটি দিন জেগে আছে।

বলা বাহুল্য, এই দিকটাই শিল্পী পাস্টেরনাক-এর সম্পূর্ণ প্রাক্-জিভাগো পরিচয় নয়, কিন্তু তাঁর অনেকখানি মিল নব্বুইয়ে-পাওয়া (এবং কিছু আধুনিক) পশ্চিম-য়ুরোপের সঙ্গে। সেই য়ুরোপ যা গভীর, অথচ অত্যন্ত ডুবে-যাওয়া; যা স্নায়ুর ভারে আচ্ছন্ন অথচ শিল্পে যার পরিচ্ছন্ন মূর্তির অভাব নেই; যেখানে যুগ-সন্ধির চেয়ে যুগ-সন্ধ্যার প্রাদুর্ভাব।

মাত্রা নিয়ে কথা। বোঝা যায় এই ধরনের একান্ত আত্মকেন্দ্রিক লেখকের পক্ষে উৎকেন্দ্রিক হবার বাধা কম। ভাগ্যক্রমে রাশিয়ায় এঁর জন্ম, প্যারিসের গলিতে নয়; তাই সাইবেরিয়ার দিগন্ত-জোড়া টুন্ড্রা, জনসংঘের দোল এঁর পৃষ্ঠায় হঠাৎ অবতীর্ণ হয়। টলস্টয় টুর্গেনিভের ইনি সগোত্র তাও বোঝা যায়, কিন্তু কতক্ষণ? শেষ পর্যন্ত ইনি ভয়ার্ত; শুধু বহির্গত কারণে নয়, আত্মস্বভাবের বশে।

কোথায় যেন দুই জগতের মিল ঘটেনি এই যুগশেষ-বিলাসীদের শিল্পে। যা উজ্জ্বল অথচ প্রাচীন, যা আগামী অথচ সূর্যসম্ভাবী তার সংগম যেন এঁরা চৈতন্যের সাধনায় জানেন নি। হয়তো সংকীর্ণ অর্থে চৈতন্যসাধন—কেবলমাত্র যা মনস্তাত্ত্বিক, বা সৌন্দর্যপিপাসায় অবসরহীন—মানুষের পূর্ণ দৃষ্টিকে ব্যাহত করে। এইখানে রবীন্দ্রনাথ বা গ্যেটের প্রতিভা অন্যতর। অনুভূতির সূক্ষ্মতম তারে কবি কালিদাস বা শেলি ধরেছিলেন অপরাজেয় মানবচিত্তের ভবিষ্যৎ। দুঃসাধ্য জাতীয়, অথবা মহাজাতীয় বিপর্যয়-পারগামী উজ্জীবনকে পাস্টেরনাক এখনো গূঢ় অভিজ্ঞতায় স্বীকার করতে পারলেন না। তর্জমায় কবিতার বিচার হয় না, তাই তাঁর কাব্যের প্রসঙ্গ এখানে বহির্গত। কিন্তু তাঁর নতুন বা পুরোনো গদ্যের ঝলমলে পরিচয়ে আজ পর্যন্ত চারিত্রের ঔদার্য প্রসন্ন হ'য়ে দেখা দেয়নি অনাগত, বা সমাগতের বৃহৎ জগতে। যেখানে দগ্ধ বাসনা, আত্ম-রতি বা বিরতির চেয়ে বড়ো সম্বন্ধের অধিকারী মানুষ পথ খুঁজছে, সেই মানুষের শিল্প-নির্ভর অন্যত্র। প্রাত্যহিক আলো এমনকি

ধুলোর সংসারে আছে সেই অন্নজল, যা নিরন্ত আত্ম-জর্জর হৃদ্‌গত সাহিত্য দুর্লভ্য।

বিশ্বপ্রকৃতি দাঁড়িয়ে আছে প্রাণের আয়তনে সম্পৃক্ত, অথচ বিপুল অপার তৃণতম থেকে সৌরতর সেই প্রতিষ্ঠা। সাহিত্যের অনেকখানি মূলধন সেখানে। কিন্তু ইতিহাসের তুমুল বিবর্তনে কোটি অগ্রহের প্রকাশরূপী নাট্যে পর্বে-পর্বে যে জনানীর যাত্রা খুলে যাচ্ছে, তাও বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্গত। সেখানেও কখনো প্রতিহত স্ববিরোধী, কখনো দ্রুত অভিযানী জনস্রোতে সাহিত্যের মহাধন খুঁজে নিতে হয়। শিল্পী এই ত্যাগের বীর্যের ঐতিহাসিক মানবিকতাকে অস্বীকার করলে অনেকখানি বঞ্চিত হন; পাস্টেরনাক-এর মতো শ্রেষ্ঠ লেখক এই স্বনির্বাসন মেনে নেবেন তা মনে করা যায় না। যদি জবাবদিহি আসে কোনো রাষ্ট্রিক ঘটনার যোগে তাহ'লে বোঝা যাবে শিল্পর দিক থেকে পূরো উত্তর দেওয়া হল না।

বুঝতে পারছেন "ডাক্তার জিভাগো"র প্রসঙ্গ এড়াতে পারিনি। শৈল্পিক বিবিধ অভাব ত্রুটি সত্ত্বেও এত মহান শক্তিশালী রচনা যে-কোনো যুগেই আন্দোলন তুলত। কিন্তু এই অর্ধ-পোলিটিকার নোবেল-প্রাইজের যুগে (যেখানে জেনারেল মার্শাল শান্তির বক্‌শিস পান, মহাত্মা গান্ধীর নাম পর্যন্ত ওঠে না) পাস্টেরনাক বিপর্যস্ত হলেন উভয় পক্ষের মল্লদের হাতে। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের রুক্ষেরা তাঁর নামকে টেনেছে বারুদ-ভরা বাক্যের মিথ্যায়। কোনো পক্ষেরই জিৎ হবে না ঐ বইয়ের জোরে। কারণ যদিও তিনি রুশ বিপ্লবের দাহ-চিত্র এঁকেছেন—শাদা-লাল কাকেও সমর্থন না-ক'রে—শেষ পর্যন্ত তাঁর শিল্প নিভৃতচারী, এমনকি সংকুচিত; ধীর নৈঃশব্দ্যে তাঁকে শোনা যায়। অবাক কাণ্ড এই যে সুচারু শিল্পীকে নিয়ে ঘনিয়ে উঠল অব্যবসায়ীদের ঝড়। যাঁরা লেখক বা রুচিশীল পাঠক তাঁরা এই বাগ্‌-যুদ্ধে বিরত হ'লে ভালো করতেন, এখন উপায় নেই। কৌতুকের বিষয় এই যে নানা দেশে রেডিও এবং হলদে-কাগজি পত্রিকায় যাঁরা সাক্ষাৎ ব্রহ্মবাক্য বিতরণ করছেন তাঁরা রুক্ষের ব্যাখ্যায়

ক-উচ্চারণ জানেন না, জিহ্বাগ্রে জিভাগো তাঁদের কাছে নামমাত্র, কিংবা কলঙ্কের উদ্ধত চিহ্ন।

বইখানি আদ্যোপান্ত ভালো ক'রে প'ড়ে দেখেছি। যথাযথ আলোচনা পত্রে অসাধ্য, কিন্তু শীর্ষস্থানীয় কোনো আধুনিক বইয়ের প্রতিক্রিয়া হৃদয়ে এত আঘাত, এত অনির্বচনীয় ধন্যতা, এত নৈরাশ্য এবং ক্ষোভ একই সঙ্গে জাগিয়ে তুলবে ভাবিনি—শুধু সেইটুকু বলতে চাই। আমার ধারণা বইখানির বিশ্বজোড়া ফল মোটের উপর সোভিয়েটের সপক্ষেই মর্যাদা বাড়াবে, যদিও ঠিক বলতে পারি না। তার একটা কারণ এই যে গল্পের সব চেয়ে প্রচ্ছন্ন অথচ স্মরণীয় পুরুষ চরিত্রের মধ্যে প্রধান বোধ হয় স্ট্রেল্‌নিখভ। অথচ তিনি সোভিয়েট কর্মী। তাঁর স্বভাবজাত কঠিন বীর্য হঠাৎ জ্ব'লে উঠল চরম ত্যাগের মহিমায়, যদিও তারও চেয়ে মহিমার জন্য চাই বাঁচবার কল্যাণসাধনা। তুলনায় ডাক্তার জিভাগোকে অতি বাক্যশীল এবং বিলুব্ধ মননজীবী ব'লে ভ্রম করা পাঠকের পক্ষে আশ্চর্য নয়। মনে পড়ছে স্ট্রেল্‌নিখভের শেষ জীবনরাত্রি। অবিস্মরণীয় লারিসা-র সম্পর্কে দুই পুরুষকেই শিল্পী ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন, কিন্তু নতুন কালের উদ্যোগী বীরের প্রতি মানুষের বেশি আকর্ষণ, বিশেষ ক'রে যখন তা অপ্রত্যাশিত ক্ষমা এবং করুণায় দেখা দেয়। লারিসা-র চোখে স্ট্রেল্‌নিখভের মূর্তি চিরদিনের মতো সাহিত্যে আঁকা রইল।

পাস্টেরনাক-এর সৃষ্টিশীল মনকে জিভাগোর সঙ্গে একীভূত করা সুবিচার নয়, কিন্তু মূলত এই আত্ম-বিভক্ত, জটিল, স্ববিলাসী ডাক্তারকে তিনি বড়ো জায়গা দিয়েছেন। সেই জায়গা আমরাও দিতে রাজি, কিন্তু যদৃচ্ছাচারী অসম জীবনের অন্য নানা দিক আমরা লক্ষ্য না-ক'রে পারি না। মারিনা-র প্রতি বৃদ্ধ জিভাগোর ব্যবহার ধিক্কারের যোগ্য বললে কম বলা হয়। কতকগুলো পুরোনো মতামত লেখবার বিরাট দায়িত্ব নিয়ে এই লেখকবীর ডাক্তার সংসারকে পায়ে মাড়িয়ে যাবেন, অথচ লোকেরা যশোগান করবে এমনটা আশা করা যায় না। বায়রনী বৃত্তিকে আর্টের মূল্যে আজ কেউ বেচতে গেলে ব্যর্থ হবেন, এমনকি স্বয়ং পাস্টেরনাক-ও। জানি, জিভাগোর ঐ অবস্থা

তার পতনের চিহ্ন ব'লেই আঁকা হয়েছে এবং এক পক্ষের সমালোচকেরা খুশি হ'য়ে ঘোষণা করছেন এই পতনের (এবং বিশ্বজোড়া যত কিছু পাপের) একমাত্র কারণ বিশেষ একটি রাষ্ট্র। কিন্তু এই ধরনের যুক্তিকে গ্রাহ্য করতে নেই। আর্টের সঙ্গে সমগ্র মানুষের এবং সমাজের যে-যোগসূত্র আছে তার উজ্জ্বলতর পরিচয় পাস্টেরনাক কোনোদিন লেখায় ব্যক্ত করবেন আশা রইল।

পলিটিক্সের দিক থেকেও পাঠকমাত্রই বুঝবেন অন্ধ বিপ্লবই রুষ আন্দোলনের বা অন্য কোনো জাতীয় আন্দোলনের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা নয়। কল্যাণে বিজ্ঞানে শিল্পে মানুষ এগিয়ে গেছে, বিপ্লবকালের এবং পরবর্তী কালের শত-শত অবর্ণনীয় অমার্জনীয় পাপ সত্ত্বেও। আবার বলি, অমার্জনীয়, কেননা কোনো উদ্দেশ্যেই বিভীষিকা অত্যাচার বর্বরতা আমরা মানি না। কিন্তু এই ব্যাপার একটি কোনো দেশের স্কন্ধে চাপিয়ে আমরা উদ্ধার পাবো না। পাস্টেরনাক-এর ঠিক সেই ইচ্ছা ছিল না, যা তিনি নিজের জীবনের বিশেষ ঘের দিয়ে জেনেছেন তাই নিয়েই লেখা তাঁর বই। কিন্তু ইতিহাসের ব্যাপকতর জ্ঞান কোথাও ফুটিয়ে তুললে তিনি ভালো করতেন। ফরাসী বিপ্লবে, আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে অথবা এশিয়ার বহু "ধর্মযুদ্ধে" পাপের রক্তবন্যা ব'য়ে গেছে। পাস্টেরনাক-এর বুলি বজ্র হ'য়ে সকল বর্বরতাকে বিদ্ধ করলে নানা পক্ষ হ'তে ঘোর আপত্তি উঠত জানি—হয়তো দেশে দেশে তাঁকে ধিক্কৃত স্থান দিত—কিন্তু স্বাধীন সাহিত্যবিচারের পক্ষ হ'তে আমরা আপত্তি জানাবার দলে নই। আমরা অর্থে ভারতীয় নয়, সকল দেশের সেই আমরা, যারা এখনো রাষ্ট্রিক আঁধিতে সম্পূর্ণ দৃষ্টি হারাই নি। এই সব তীব্র প্রসঙ্গে শুধু ব্যক্তিবিশেষের নয়, বহুজনীন সমাজের অন্য আরেকটা দিক উদ্ঘাটিত হ'লে জিভাগো-গ্রন্থের মর্যাদা বাড়ত। আপন দেশের উল্লেখে সেই অপরাজেয় কল্যাণশক্তির নূতন পরিচয় জানালে ক্ষতি কি ? নৃশংসতার বিরুদ্ধে, ব্যক্তিগত অস্বাধীনতার বিরুদ্ধে বর্ষিত শিল্পবাক্য কোনো তথ্যের স্বীকারে দুর্বল হ'ত না, প্রবলতর হ'ত, কেননা "সার্বিক রাষ্ট্র"-যন্ত্রের ফাটলে কোথাও একটু মনুষ্যত্ব মাথা তুলেছে, সেই মনুষ্যত্ব থেমে নেই ছড়িয়ে যাচ্ছে এই কথা বলার দ্বারা অসত্য বা অন্যায়ের সমর্থন করা

হয় না। এই সহজ সত্যটি মহা প্রতিভার আলোয় দৃপ্ত হ'য়ে ওঠেনি ব'লে পাস্টেরনাক-এর প্রতি অসীম শ্রদ্ধাশীল পাঠকের মনও ক্ষুণ্ণ হয়।

খৃষ্টধর্মের ব্যাখ্যাতারূপে ডাক্তার জিভাগোর ব্যবহার অতি বিচিত্র। চরিত্র বা আচরণের ক্ষেত্রে ন্যু টেস্টামেণ্ট কেবল আপ্তবাক্যের মতো শূন্যে ঝুলে আছে, বারংবার শ্লোকোচ্চারণ চলেছে কিন্তু একান্ত স্বার্থপরতা, দুর্বল মননের ক্রিয়াকাণ্ড তারই ছায়ায় লালিত হল, যেমন শুনেছি জুয়ো-খেলার সঙ্গে-সঙ্গে তিব্বতী প্রার্থনাচক্র আবর্তিত হ'ত। মোক্ষের এই উৎকৃষ্ট উদাহরণ ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পশ্চিমী ধার্মিক অনায়াসে গ্রহণ করেছেন, জিভাগোর খৃষ্টধার্মিকতার উপর কত ভজন উপদেশ আমরা শুনলাম তার ঠিক নেই—অথচ যথার্থ খৃষ্ট-ধর্মীদের কথা আলাদা। তাঁরা ঠাণ্ডা-গরম কোনো হত্যাকাণ্ডের সপক্ষে নন। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও এই শুভ্রতা বিশ্বের প্রত্যেক দেশেই ছড়ানো। কিন্তু খবরের কাগজে সেই খবর নেই কেন। যতদূর মনে পড়ছে ভারতবর্ষের কোনো কাগজে জিভাগো গ্রন্থ বিষয়ে পশ্চিমের প্রতিধ্বনি বা তারই সমধ্বনি ছাড়া অন্য কিছু শুনিনি। আমার দূর কানে ঠিক আওয়াজ মাতৃভূমি থেকে এসে পৌঁছয়নি, এই আশ্বাস চিঠিতে ব্যক্ত করি।

হাওয়াই-ডাকের দীর্ঘ পত্রে হু-হু ক'রে যা-কিছু শিখে ফেললাম তা বইয়ের আসল মর্মকে বাদ দিয়ে রচিত। স্তব্ধ হ'য়ে যাই যখন লারিসার কথা ভাবি। জিভাগোর জীবনের উচ্চ শিখরে-শিখরে যে-আগুন আলো হ'য়ে উঠল, নত হ'য়ে উন্নত হ'য়ে তাকে পাঠকের নমস্কার জানাই। অন্য কোনো চিঠিতে হয়তো সেই চিরন্তন দীপ্তির পরিচয়ক্ষেত্রে নামব, যেখানে পাস্টেরনাক-এর রচনা মৃত্যুহীন। জিভাগোর মৃত্যুর অপ্রত্যাশিত পরমুহূর্তে সেই অমরতা দেখতে পাই। লারিসার কয়েকটি কথায় শিল্পের মন্ত্রোচ্চারণ হল, জীবনে যার শেষ নেই। তার পরে তার নিজের নামহীন অনির্দেশ এবং মৃত্যুর সম্ভবপর ঘটনা যেন মৃত্যুর অধিকারের বাহিরে। যেখানে পাস্টেরনাক আমাদের নিয়ে দাঁড়ালেন শিল্প সেই অঙ্গনের চতুর্দিকে, তার তলে, তার ঊর্ধ্বে।

জীবনে-জীবনে বিস্তৃত আলো দেখা গেল, হয় তা বহু গৃহদীপের, নয়তো আকাশের গ্রহমালার।

পাস্টেরনাক-এর কাব্যের প্রসঙ্গ তুলব না বলেছিলাম, যদিও ইংরিজি তর্জমার বন্ধ কাচের জানলা দিয়ে যা দেখেছি তাতেও মুগ্ধ হয়েছি। জালি-কাজ-করা ছায়ায় আলোয়, কাচের ছাঁকনিতে উদ্ধৃত কতটুকু কী দেখেছি তা যাচাই করবার সাহস নেই। কিন্তু পাস্টেরনাক আসলে কবি। যদিও তাঁর গল্পে চরিত্রসৃষ্টি, ঘটনার আবহরচনার শক্তি অসামান্য, শেষ পর্যন্ত গদ্যেও যেখানে তিনি কবির যথার্থ অবসর পেয়েছেন সেই সব মুহূর্তেই তিনি জয়ী। তাঁর জয়লাভ সেখানে সকলের সঙ্গে এক হ'য়ে, হোক তা মানুষ, বা সংসার বা পৃথিবীর অন্য কোনো দান। এই অর্থে তিনি বলেছেন—

"The nameless ones are part of me
Children also, the trees, and stay-at-homes,
All these are victors over me—
And therein lies my sole victory."

বস্টন, ম্যাসাচুসেটস
১৮ ডিসেম্বর ৫৮

স্বপ্নেরও ভিতরে

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বপ্নেরও ভিতরে ঘোরে সেই এক জটিল বেড়াল
তীক্ষ্ণ নখের ধার গোপনে যে চোরাই রেশমে
লুকিয়ে হঠাৎ আসে বর্ণচোরা চটুল আলোয়
যেখানে, আমার প্রাণে, সক্ষম তরীও কিনা টাল
সামলাতে না-পেরে ঘোরে রক্তে, স্রোতে : নির্বোধ নিয়মে
বিপজ্জনক স্মৃতি বারে-বারে ছিটোয় বিলয়।

ছিলা টান হ'য়ে ছিলো ; সে এসে, ছদ্মবেশে, দিলো
স্পন্দনে হিংসুক স্বর, স্বেচ্ছাচারী রক্তে সুর, ফুল
ফুটে উঠলো অন্ধকারে, ন'ড়ে-ওঠা অলংকার কূল
ছাপিয়ে, উঠলো বেজে, আর মৃদু একরোখা আলো
অভিমানে ম'রে গেলো, যেহেতু নকল চাঁদমারি
লক্ষ্য ক'রে ছুটে গেলো ভ্রষ্ট তীর অস্থির দেমাকে :
যেন কোনো কুয়াশায় ঠিক পথ না-চিনে না-দেখে
যে-দেশে পৌঁছনো গেলো তারও রাজা বেড়াল, শিকারি।

সংসারী বৌদ্ধ

দীপক মজুমদার

আবার আশাবরী তোমার স্মৃতি
চিবুকে দাঁতে জিভে নেশা
বিলাসী আলো তার ক্ষমা ও প্রীতি
রাত্রি আবরণে মেশা।

দূরের হাঁসগুলি এখনো চ'লে যায়
বিদেশী সূর্যের চোখে
এ কোন উল্লাস! ওপাশে মৃত চাঁদ
ঝড়ের মন্দিরে ও কে!

ভুলেছি সব তবু তুই চোখে
প্রতিটি ছায়া কেন কাঁপে
আমারই পদপাত এই বুকে
শ্রাবক যৌবন যাপে।

বন্ধু, আমলিন জ্যোৎস্না
সেও তো স্বপ্নের ভাষা।
তোমার চুম্বনে লব্ধ
চিবুকে দাঁতে জিভে নেশা।

রাত্রি প্রবাসের তারাহীন
শূন্যে করুণার শিখা,
নীরব আশ্লেষে প্রতিদিন
জ্বলে কি প্রাজ্ঞের পাখা!

কবিতাভবন, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৯ থেকে প্রকাশিত ও ১৪১ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-১৩ মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস প্রাইভেট লিমিটেড-এ মুদ্রিত।
সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রক: বুদ্ধদেব বসু। সহকারী সম্পাদক: নরেশ গুহ।

KAVITA

(*Poetry*)

Vol. 23, No. 2

Yearly Rs. 4/-, or 6s. 6d. or $ 1. 50
Rupee one per copy

এক টাকা

Published quarterly at Kavitabhavan, 202 Rashbehari Avenue, Calcutta 29, India
Editor & Publisher: BUDDHADEVA BOSE

আদর্শ পথ্য,
পানীয় ও খাদ্য
BARLEY
লিলি
বার্লি
সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ
ও
স্বাস্থ্যপ্রদ
স্বাস্থ্যসম্মত ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত
লিলি বার্লি মিলস্ প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-

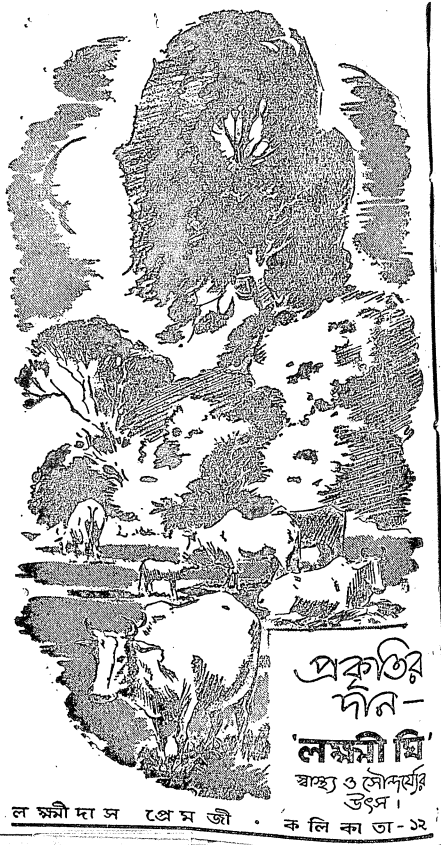

কবিতা

চৈত্র ১৩৬৫

— এই সংখ্যায় —

কবিতা

অমিয় চক্রবর্তী, জ্যোতির্ময় দত্ত, শান্তিকুমার ঘোষ, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, অর্চন দাশগুপ্ত, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী, মণিভূষণ ভট্টাচার্য, সলিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, বংশীধারী দাস, বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবনীতা দেব

সমালোচনা

'যে-আঁধার আলোর অধিক' ... রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী

প্রবন্ধ

শার্ল বোদলেয়ার ও আধুনিক কবিতা ... বুদ্ধদেব বসু

উল্লেখযোগ্য পত্র-পত্রিকা

কথাবার্তা

সমসাময়িক ঘটনাবলী ও সাহিত্য বিষয়ক বাংলা সাপ্তাহিক।
বার্ষিক ৩্ টাকা; ষাণ্মাসিক ১.৫০ টাকা।

উইক্‌লি ওয়েষ্ট বেঙ্গল

সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত ইংরেজি সাপ্তাহিক।
বার্ষিক ৬্ টাকা; ষাণ্মাসিক ৩্ টাকা।

বসুন্ধরা

গ্রামীন অর্থনীতি ও কৃষি বিষয়ক বাংলা মাসিক পত্র।
বার্ষিক ২্ টাকা।

শ্রমিক-বার্তা

শ্রমিক-কল্যাণ সংক্রান্ত বাংলা-হিন্দি পাক্ষিক পত্র।
বার্ষিক ১.৫০ টাকা।

পশ্চিম বংগাল

নেপালী ভাষায় সচিত্র সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র।
বার্ষিক ৩্ টাকা; ষাণ্মাসিক ১.৫০ টাকা।

মগ্‌রেবী বংগাল

উর্দু ভাষায় সচিত্র পাক্ষিক সংবাদপত্র।
বার্ষিক ৩্ টাকা; ষাণ্মাসিক ১.৫০ টাকা।

গ্রাহক হবার জন্য এই ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন—
প্রচার-অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, রাইটার্স বিল্‌ডিংস,
কলিকাতা—১

কবিতার বই

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

কাব্য-সঞ্চয়ন	...	৫.০০
হসন্তিকা	...	১.৫০

বুদ্ধদেব বসু

যে-আঁধার আলোক অধিক		২.৫০
কালিদাসের মেঘদূত		৫.৫০

বিষ্ণু দে

আলেখ্য	...	২.৫০

হুমায়ুন কবির

স্বপ্নসাধ	...	২.০০
সাথী	...	১.৫০

হরপ্রসাদ মিত্র

তিমিরাভিসার	...	১.৫০

মণীন্দ্র রায়

অমিল থেকে মিলে	...	১.৫০

অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়

নিঃসঙ্গ মেঘ	...	২.০০

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

আকাশিনী ও মৃন্ময়ী		২.০০

এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স (প্রাইভেট) লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র
অনূদিত

হুইটম্যানের
শ্রেষ্ঠ কবিতা

গদ্য-কবিতার প্রবর্তক ও আধুনিক কাব্যের ত্রাণকর্তা মহাকবি হুইটম্যানের শ্রেষ্ঠ কবিতার অনুবাদ করেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র

সামনের ছবি সত্যজিৎ রায়ের।

দীপায়ন
প্রকাশনা ভবন

২৮/সি মহিম হালদার স্ট্রীট,
কলিকাতা-২৬

একটি নতুন ধরনের

স্কুল

প্রতিভা বসু
পরিচালিত

শিশুবিতান

১১২/১, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড,
কলকাতা-২৬

নার্সারি থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত
ছাত্রছাত্রী নেয়া হয়

অনুসন্ধানের জন্য টেলিফোন
৪৬-১২০৪

প্রকাশিত হয়েছে

শ্রী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

নারীর উক্তি

"আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে সম্প্রতি যে অভদ্রতার প্রাদুর্ভাব হয়েছে, সেজন্য দুঃখ প্রকাশ না করে থাকা যায় না। সরস্বতীর মন্দিরে প্রবেশ করবার সময়ও কি জুতোজোড়াটার সঙ্গে আমরা বাঙালির স্বভাবসিদ্ধ দলাদলির ভাবটা বাইরে রেখে আসতে পারি নে? অবশ্য সাহিত্যচর্চার যদি কোনো উচ্চ লক্ষ্য থাকে তো সে কেবল লীলাকমলের ব্যজনে অবলীলাক্রমে সাধিত হবে না, তা জানি। অকল্যাণকে তাড়াতে হলে মধ্যে মধ্যে কুলোর বাতাসও দেওয়া চাই। কিন্তু তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম আর মারাত্মক আর যে-কোনো প্রকার ভাষার অস্ত্র সাহিত্যরথী ব্যবহার করুন-না কেন, ইতরতা বা রূঢ়তার অস্ত্রপ্রয়োগ এস্থলে নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। যিনি বাণীর সেবক হবার স্পর্ধা রাখেন, অশুদ্ধ বাণী ব্যবহার করা তাঁর পক্ষে বিশেষরূপে বিসদৃশ নয় কি?"

এই গ্রন্থের অন্তর্গত 'ভদ্রতা' নামক নিবন্ধে লেখিকা উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন; সাহিত্যে সমাজে বা ব্যক্তিগত ব্যবহারে শালীনতার প্রয়োজন কতটা তার খোলাখুলি আলোচনা এতে আছে। তা ছাড়া, 'বর্তমান স্ত্রী-শিক্ষা' 'বিচার' 'সম্বন্ধ' 'আদর্শ' 'পাটেল-বিল' 'বঙ্গনারী—কঃ পন্থা, কি ছিল, কি হতে চলল' ইত্যাদি প্রবন্ধে লেখিকার সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা-লব্ধ সহজ ও সরল অভিমত গ্রন্থটিকে সুখপাঠ্য করেছে।

নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে সকলের অবশ্যপাঠ্য
মূল্য ২.৫০ টাকা

লেখিকার অন্যান্য বই

বাংলার স্ত্রী-আচার
উত্তর পশ্চিম ও পূর্ব বঙ্গের বিবাহ-পূর্ব বিবাহ-কালীন ও বিবাহ-উত্তর স্ত্রী-আচারসমূহের বিবরণ। গ্রন্থশেষে বিবাহের গান সন্নিবিষ্ট।
মূল্য ১.৩০ টাকা

রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণী-সংগম
প্রত্যেক সংগীতরসিকের অবশ্যপাঠ্য বই। মূল্য ০.৮০ নয়া পয়সা

বিশ্বভারতী

৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

লেখকদের বিষয়ে

বরিস পাস্টেরনাক বিষয়ে **অমিয় চক্রবর্তী**-র আর-একটি পত্র, বুদ্ধদেব বসুর উত্তরসমেত, 'কবিতা'র আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। **গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়** গ্যেটের ফাউস্ট-এর একটি অনুবাদে হাত দিয়েছেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্য পর্যায়ে **জ্যোতির্ময় দত্ত**-র প্রথম প্রবন্ধ, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও জীবনানন্দ দাশ' 'কবিতা'র কোনো পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। **বুদ্ধদেব বসু**-র দুটি নতুন উপন্যাস, 'নীলাঞ্জনের খাতা' ও 'শোণপাংশু' যথাক্রমে বেঙ্গল পাব্লিশার্স ও এম. সি. সরকার কর্তৃক আশুপ্রকাশ্য। তাঁর 'শার্ল বোদলেয়ার: তাঁর কবিতা' প্রকাশ করছেন নাভানা; নিউ এজ থেকে 'কালের পুতুল' ও 'রবীন্দ্রনাথ: কথাসাহিত্য'-এর নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে; তাঁর সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা'র নতুন সংস্করণ যন্ত্রস্থ। **মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়** বর্তমানে রেঙ্গুনের বেঙ্গল অ্যাকাডেমিতে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপনা করছেন। **শান্তিকুমার ঘোষ**-এর বর্তমান কর্মস্থল নয়াদিল্লির ইনস্টিট্যুট অব ন্যাশনাল ইকনমিক রিসার্চ।

প্রতিভা বসু

সম্পাদিত বার্ষিকী

বৈশাখী

১৩৬২ ও ১৩৬৪-র সংখ্যা এখনো পাওয়া যাচ্ছে।
শ্রেষ্ঠ আধুনিক লেখকদের গল্প, প্রবন্ধ ও
কবিতার রক্ষণযোগ্য সংকলন।

দাম ২৲ ও ১৷৷০। মাশুল স্বতন্ত্র

প্রকাশক : কবিতাভবন

কবিতা

বর্ষ ২১

ও

বর্ষ ২২-এর

সম্পূর্ণ সেট

পাওয়া যাচ্ছে।

বহু মূল্যবান কবিতা

অনুবাদ-কবিতা

ও

প্রবন্ধের সঞ্চয়ন।

প্রতি সংখ্যা ১৷০

প্রতি সেট পাঁচ টাকা

মাশুল স্বতন্ত্র

কবিতা

ত্রৈমাসিক পত্র

আশ্বিন, পৌষ, চৈত্র ও আষাঢ়ে প্রকাশিত। * আশ্বিনে বর্ষারম্ভ, বৎসরের প্রথম সংখ্যা থেকে গ্রাহক হ'তে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যা এক টাকা, বার্ষিক চার টাকা, রেজিস্টার্ড ডাকে ছয় টাকা, ভি. পি. স্বতন্ত্র। * ষাণ্মাসিক গ্রাহক করা হয় না। * চিঠিপত্রে গ্রাহক-নম্বরের উল্লেখ আবশ্যিক। * ঠিকানা-পরিবর্তনের খবর দয়া ক'রে সঙ্গে-সঙ্গে জানাবেন, নয়তো অপ্রাপ্ত সংখ্যা পুনরায় পাঠাতে আমরা বাধ্য থাকবো না। অল্প সময়ের জন্য হ'লে স্থানীয় ডাকঘরে ব্যবস্থা করাই বাঞ্ছনীয়। * অমনোনীত রচনা ফেরৎ পেতে হ'লে যথাযোগ্য স্ট্যাম্পসমেত ঠিকানা-লেখা খাম পাঠাতে হয়। প্রেরিত রচনার প্রতিলিপি নিজের কাছে সর্বদা রাখবেন, পাণ্ডুলিপি ডাকে কিংবা দৈবাৎ হারিয়ে গেলে আমরা দায়ী থাকবো না। * সমস্ত চিঠিপত্রাদি পাঠাবার ঠিকানা:

কবিতাভবন
২০২ রাসবিহারী এভিনিউ
কলকাতা ২৯

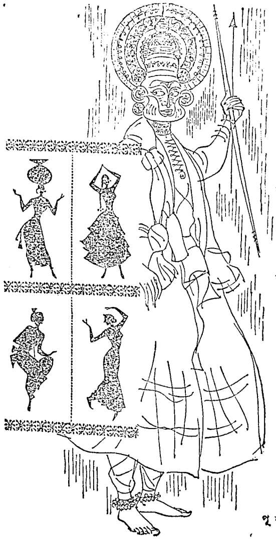

ঐক্য
ও
সমন্বয়ের
সাধনায় ...

বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের—বহুর মধ্যে সমন্বয়-সাধনের সকল সাধনাই আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষের মর্মবাণী। এই মর্মবাণীই নিহিত রয়েছে তার ব্যাপক, বিচিত্র, কখনও বা ভিন্নধর্মী সংস্কৃতি ও শিল্পকলার মধ্যে।

হিমালয়ের যে পার্বত্য পৌরুষ বমন নৃত্যে উদ্দীপিত, সমতলবাসিনী রসকলি-লাঞ্ছিত তরুণীদের রাসনৃত্যে ও মৃদঙ্গের বোলে বা বাউল ও কীর্তনে তা স্তিমিত ও ভাবনত। উড়িষ্যার ছউ বা মধ্য ভারতের লাম্বাডি নৃত্যে, গুজরাটের গরবা বা দক্ষিণ ভারতের ভারতনাট্যম্ ও কথাকলি নৃত্যে এই বিচিত্র ভিন্নধর্মী সংস্কৃতিরই আত্মপ্রকাশ।

যোগাযোগ ব্যবস্থায় এই বিচিত্র, ভিন্নধর্মী সংস্কৃতির ঐক্য ও সমন্বয় সাধনের প্রয়াসই রূপায়িত।

পূর্ব রেলওয়ে

কবিতা

চৈত্র ১৩৬৫

বর্ষ ২৩, সংখ্যা ৩

ক্রমিক সংখ্যা ৯৭

পৃথিবীতে

অমিয় চক্রবর্তী

সবই ঘটেছিল সেই যুগ-অনির্বাণ আয়ুকালে
সবই ঘটেছিল
আয়ুকালে, সেইদিন শীতের সকালে
পৃথিবীতে ঘটেছিল, হঠাৎ দরজা খুলে দিল

পাশের পথিক, বলে "বাইরে এসো, এসো দেখো চেয়ে
উৎসব জানো না বুঝি? বাইরে এসে
দেখো চেয়ে বাজনা-বাজা প্রাণে-সাজা রাঙা রাস্তা বেয়ে
চলেছে মিছিল, এসো, রোদে ঝিলমিল দূর দেশে

দু-মুহূর্ত স্রোতে।" সেই দূর দেশে, আলো-স্রোতে নেমে
চোখে চোখ ঠেকে গেল, ব্রিজের পাথর-কাঁপা ধ্বনি
শিঙা ঢাক খঞ্জনির দ্রুত মগ্ন তালে-তালে থেমে
সমুখ বুকের নীলে মিল মুদ্রা, পেয়েছি তখনি

সেই মাত্রা-স্পর্শ তার—বহু ভিড়ে—উৎসব মিছিল
যার জ্যোতি আয়োজনে অগণ্য গ্রহের কক্ষে-চলা ;
শুভ্র শাঁখে বাজে কান্না, হাসির করুণা যার মিল,
রাঙা রাস্তা প্রাণে-সাজা, দু-মুহূর্তে সেই কথা বলা—

সবই ঘটেছিল ; সেই মহা আয়ুকালে
সবই ঘটেছিল
কোনদিন পৃথিবীতে বন্ধ সেই শীতের সকালে
হোটেলের একা ঘরে, হঠাৎ দরজা খুলে দিল ॥

একজন ইঁদুরের কাহিনী

জ্যোতির্ময় দত্ত

কখনো দেখেছি তাকে, শব্দ শুনে,
স্তব্ধ হ'য়ে যেত যেন নকল বাল্মীক,
আবার মিলিয়ে গেল আচম্বিতে ঘাসে।
স্পষ্টত মূষিক ছিল, অথচ এখন
পাতায় কম্পন মাত্র। বায়ু কিংবা ধোঁয়া। কিংবা ঘাসের নিশ্বাস।

কখনো আশ্চর্য লঘু, চলে না তো, ভাসে।
দূর থেকে মনে হয় বুঝি হরবোলা
উড়ে গেলো ঘাসের আকাশে।
আবার নেশায় বুঁদ তন্দ্রালু হাকিম
দুপুরে ঢুলছে ব'সে স্বপ্নের এজলাশে।

কী যেন কী বুনছিল ঘাসের গোড়ায়—
কোথায় উধাও হ'লো সেই ব্যস্ত চাষা ?
বাতাসে কাঁপছে যার, রোম নয়, মসৃণ রেশম
কোনো জংলি নৃপতির সে অলস রানী ?
মায়া। দেখছো না যোগাসনে ধ্যানমগ্ন মুনি।

সেদিন দু'জনে পথে আচমকা হ'লো চোখাচোখি ;
চোখ নয়, মৌমাছি বসেছিলো মুখে
সে-দৃষ্টি হঠাৎ যেন কামড়ালো বুকে ;
আমাকে অবশ ক'রে সম্মোহনে জড়িয়ে শরীর,
পলকে উধাও হ'লো, ডুবে গেলো ঘাসের পুকুরে।

তখন ভেবেছি তাকে বৃদ্ধ জাদুকর।
অতিরিক্ত নেশা ক'রে মন্ত্র ফুঁকে-ফুঁকে,
একদা বর্ষার রাতে চেয়েছিলো হ'য়ে যেতে
গরম পশুর বুকে নরম শাবক,
চেয়েছিলো হ'য়ে যেতে গাভী কিংবা সুঘ্রাণ শূকর।

একলা ধুনির আঁচে, গ্রাম থেকে দূরে,
বর্ষায় নেশার ঘোরে ভেবেছিলো ঝোঁকের মাথায়
কী হবে জাদুর বলে যদি তাতে না জোটে আরাম,
এমনি প্রত্যেক রাতে হৃদয়ে ভাবনা যদি খায় কুরে-কুরে?
এর চেয়ে ভালো হ'তো বকের নরম বুকে গেলে।

খেয়ালের বশে তাই হ'য়ে গেছে নিতান্ত ইঁদুর;
মাটির শরীর ছুঁয়ে সারাদিন আছে।
হে প্রভু, হয়েছো সুখী? দেহে পাও পশুর আরাম?
এমন অস্থির তবু; ধাক্কা দিয়ে কে যেন ছুটোয়?
এখনো পিছনে তবে আছে সেই চিন্তার কুকুর?

কারাগার দেহ তার, কুঠুরির ঘুলঘুলি চোখ;
কয়েদে পুরেছে তাকে শয়তান রাজা।
ঝিমোতে গেলেই তাকে মারছে চাবুক,
তৃষ্ণায় কাতর হ'লে সেঁকছে আগুনে—
সেদিন থমকে গেছি, দৃষ্টি নয়, আর্তনাদ শুনে।

ছায়া

শান্তিকুমার ঘোষ

(Michel Geoghegan-কে)

শুধু সাঁচ্চা নীল আকাশ বিঁধেছে গম্বুজের চূড়া।
মিনারেট-মিনারের ছন্দ:
ভারি প্রতিধ্বনি ঘুরে-ঘুরে ফিরে আসে শুভ্র স্তূপে।
সুগন্ধি আস্বচ্ছ
কী সৌন্দর্য লালন করছে অস্তসূর্য রোজ।

জলে তাজমহলের প্রিয় ছায়া দুলিয়ে ভেঙো না তুমি॥

প্রতিভাসের মুক্তি

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

তোমাকে নেবো না জেনো স্ফীত লাল এমন বিকেলে
পড়ন্ত বেলায় আমি একা হেঁটে যাবো, দুঃখ একা।
কিংবা পরবাসে গাঢ় প্রতিশ্রুত অগ্নি কাছে পেলে
তোমার উজ্জ্বল তুচ্ছ ; আমি দুঃখে তবু স্বর্ণরেখা।

আমার তেমন ঘুম দেখনিকো, ব্যর্থ গরবিনী,
বৃষ্টির নিলাজ নৃত্যে…নগ্ন রোদে তীক্ষ্ণ হারপুনে,
বিঁধে যাই, পুড়ে যাই, শব্দপুঞ্জে…বীভৎস আগুনে ;
স্মৃতি ওড়ে, ধুলো জল…কিছুই দেখনি, শরীরিণী।

চিরকাল স্বেচ্ছাচারে মমতা রেখেছি। চৈত্র মাস
বিকেল মানুষ বাড়ি…ফুটপাথে চাঁড়াল বাতাস
অনেক রাত্তিরে, জানি, গান গায়। বিষাক্ত শহরে
ভাঁড়, সং, আরশোলা কিংবা কোনো গণিকার বিবর্ণ বিবরে
আস্থা রাখি চিরকাল…তারা প্রাণ, আমি দূর প্রীতি।
বুকে বড়ো প্রীতি লাগে এই সব দুঃখী হাওয়া, স্মৃতি
মাঝে-মাঝে বৃষ্টি দেয়, এলোমেলো ছেঁড়া হাহাকার
কঠিন কংক্রীটে মারে মেঘ-ফাটা আলোর কুঠার।

আমি আজ অবিশ্বাস…স্বাভাবিক অন্তত এখন
তোমাকে নেবো না এই সিম্ফনির উতল উল্লোলে।
লজ্জিত থাকি না মোটে ; এ তো নয় তেমন যৌবন
একটুকু ছোঁয়া লেগে গ'লে যায় কটাক্ষের ধূর্ত রলরোলে।

ঈশ্বর প্রলাপ মাত্র…ক্রুশবিদ্ধ বেকুব রাখাল
গ্রটেস্ক ছবির মুখ—ঝরেছে দুনিয়াদারি চালে,
কর্কশ ঈশ্বরী নাচে চতুর বাণিজ্যে চিরকাল ;
কিম্ভূত নক্টার্ন ফেরে রেস্তরাঁয়, ইতর দেয়ালে।

ইদানীং কথা বলি সহজিয়া দখিনা সমীরে,
দোকানে বাজারে ঘুরি—কোথায় ঈশ্বর আমি চিনি।
মগ্ন ঢেউয়ে উঠি নামি কাটা-ছেঁড়া ঝড়-দাগা ভিড়ে ;
শিকড়ে সুস্থির আছি, ভয় নেই।—হাসেন হুডিনি॥

হেরমান হেস্‌সে-র দুটি কবিতা

বসন্ত ছিল

ঝোপে-ঝোপে হাওয়া, এবং পাখির গান,
ঊর্ধ্ব আকাশে ঘন নীল সরোবরে
নীরব মেঘের নৌকাটি ভাসমান···
সোনালি চুলের রূপের স্বপ্ন ভরে ;
যৌবনময় দিবসে, স্বপ্ন আমার,
রূপরেখা পায়, আর নভো নীলিমার
দোলনায় দোল খেয়ে
উৎসুক আমি কোমল, স্নিগ্ধ আর
মৃদুতম উত্তাপে,
স্তোত্র ও গান গেয়ে
শুয়ে থাকি, যেন শিশুসন্তান যাপে
কোমল অঙ্কে মা-র।

ফুল, গাছ, পাখি

উজ্জ্বল হও একাই হৃদয়
সময়ের অনুকূল।
সে-নারী ছায়ায় দিন গুনে যায় :
যন্ত্রণা, নীল ফুল।

দুঃখের গাছ এখন বাড়ায়
চারিদিকে তার ডাল,
তাতে গান গায় সবুজ পাতায়
পাখি, বহমান কাল।

যন্ত্রণা-ফুল নীরব নিঝুম
কথা তার লোপ পায়,
গাছ বেড়ে ওঠে স্বর্গের তটে,
পাখি গান গেয়ে যায়।

অনুবাদ : গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

রেখাচিত্র

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

এখনো লাবণ্য তার ঝরে প্রতি অঙ্গের শিখরে—
নরম রোদের মতো, অথবা নদীর মতো—জ্যোৎস্নার ভিতরে।
তবু সে তাপসী, যেন উৎসর্গিত কোনো দেবদাসী,
দেহের বিভঙ্গে লেখা—রিক্ত মন,—দীর্ঘ উপবাসী।

ধীর, শান্ত কথা বলে, চোখে স্নিগ্ধ প্রত্যুষের আলো,
প্রত্যন্তযৌবনা নারী, তবু কেন তাকে লাগে ভালো!
হেমন্তে শস্যের গুচ্ছ, কিংবা লতা—পীতাভ পাতায়
মনে আসে, দেখি তার অপরূপ দেহের আভায়।

বিস্তীর্ণ চিল্কার মতো মন তার, বিক্ষুব্ধ উচ্ছ্বাস
অবিরাম অভিঘাতে ভেঙে যায়; তথাপি উদ্ভাস
যেন স্থির অজন্তার গুহাচিত্র: নির্জন নির্ঝরে
হৃদয়ের উৎসমুখ, কোন অন্ধকারে যেন ঝরে।

আমি তার বিস্মৃতির বাতায়নে নাম ধ'রে ডাকি,
সে তবু দ্যায় না সাড়া; প্রজাগর যন্ত্রণার পাখি।
যৌবনে আকাশলীনা, এখন সে নিজেই আকাশ;
আমার মাটির রাজ্যে ওঠে উষ্ণ হাওয়ার নিশ্বাস।

একটি কবিতা

অর্চন দাশগুপ্ত

পশমিনা রোদে মোড়া ঝকঝকে টারমাক চিরে
ঘাসের সুগোল দ্বীপ, জ্যামিতিক ফুলের কেয়ারি,
গান্ধার মূর্তির মতো স্বাস্থ্যবান ট্রাফিক-পুলিশ।

গাড়ির দুরন্ত স্রোত: অত্যন্ত মসৃণ কাডিলাক—
চশমার কালো কাচে কোনো মুখ ভাবলেশহীন,
অসম্ভব লাল ঠোঁট। অনেক পিছন থেকে আসে
বলদের গাড়ি আর এক ঝুড়ি দেহাতি যৌবন,
জরির জলন্ত বুটি, ঘোমটাতে দূরের সংগীত।

বুদ্ধের মুদ্রায় তোলে শাদা হাত ট্রাফিক-পুলিশ,
সাময়িক শান্তি নামে অকস্মাৎ উজ্জ্বল মিছিলে—
যান্ত্রিক হৃদয়ে শুধু থরোথরো বন্দী গতিবেগ।

ক্রমান্বয়ে কাছে আসে নির্বিকার বলদের গাড়ি,
রাজস্থানি মেয়েদের স্পষ্টতর ফসলের গান।

প্রগল্‌ভ উচ্ছ্বাসে কাঁপে বারান্দায় বুগানভিলিয়া॥

তিনটি কবিতা

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

আলেখ্য

কেশে জানলা খুলে রাখি, চামরের স্বস্তি···এসো, হাওয়া,
লুটাও অতুলনীয় : কাঁপে জ্যোৎস্না গোলাপের বনে।
বাতায়নে চোখ রেখে তুমি যেন বোসো না, গোলাপ,
রূপের অসুখ, তাতে বেদনার দুঃখের মাধুরী।
আমি বহুদিন হ'লো ব'সে আছি ; হেমন্তের ব্যাধি
আমাকে দিয়েছে মৃত পরাগের বিলীন সম্পদ,
ক্ষয়ের অমরাবতী···ঝরা তার, ব্যর্থ ধ্বনি, হাত,
একান্ত মুখের স্বপ্ন, হায় চোখ প্রয়াসে নিরত
খুঁজে পাবে কোনদিন ? না কি ঐ অন্বেষণে তব
মহিমা প্রকাণ্ড হবে ? দুর্গমতা নিশ্চিত জীবনে
শেখায় সম্মান যেন রহস্যরে, যেন ভালোবাসা
আপন হারানো অংশ, গৌরব বা উজ্জ্বল সময়
অতীত, অপ্রাপ্য ; তাই তুমি, প্রেম, পূর্ণের রচনা
আত্মশিল্পে ; তুমি বোসো সম্ভ্রান্ত প্রতিভা পাশে নিয়ে
শিয়রে, চোখের কাছে, আরো নিচে হাঁটুর ফেরানো
চাদর সরিয়ে, কাছে, দৈহিক, দূরত্ব ঢেকে, কাছে—
শোও, জানলা খোলা থাক, বাতায়নে যেয়ো না, গোলাপ ;
বড়ো সুখ, বড়ো দুঃখ এই মিশ্র আলেখ্যের ছায়া।

প্রভাত

কে ডাকলে আমায় ঘুমে, ভূত ? প্রেম, বৈদিক ঘোটকী ?
অর্ধেক ফলের স্বপ্ন পূর্ণ হ'লো, তবু জাগরণে
সন্ধানের হাতে পায়ে আঙুলে জড়ানো সে কি চুল ?

স্বপ্নেরই পুরোনো কূপ, তার গ্রন্থি, নিঃসৃত আঁচল।
জীবনের এক পায়ে লাল কাঁটা, অন্যটি অক্ষত
আপন আনন্দে যাবে একবার পাখির মতন
আকাশে, অনেক দূরে···স্বপ্নে যায় ; যদি ডাক শোনে
অন্তিমে মড়ার মাথা কোলে নিতে ঝাঁপায় সতত।
ভূত ? গ্রীবা দাও, দেহ স্বচ্ছ, নামে বিখ্যাত প্রণয়,
চুম্বন, ভয়াল শয্যা, ঢুকে যাই, উজ্জ্বল উত্তাপে···
রোমে-রোমে, সারা দেহে শুয়ে থাকি, এ-ই প্রেম, সব···
প্রাকৃত সৌন্দর্য ঢোকে, সব মাছ, উন্মত্ত গোধূলি,
সব, সব···সুখ, দুঃখ, পতন, সম্রাট, বেড়ালেরা···
কে ভাঙলে আমার ঘুম, ভূত ? প্রেম ? বৈদিক ঘোটকী ?

দেবদূত

যে-বৃক্ষ নির্মাণ করে সেই বীজ অনব্যবহিত কর হ'তে
তোমাতেই ফিরে যায়, গাঁথা বুকে বাগানের দাগ।
সেই বৃক্ষ তুমি, তব কণিকারে কেমন প্রভেদ
দেবে ; বিস্ময়ের মধ্যে দুই চিত্ত সমভগ্ন ভূমি ?
একদা তুমিই বৃক্ষ, অনুপস্থিতি কি পল্লব ?
শাখায় পাতায় ভরা বৃদ্ধি তার তোমার আভাস···
মনে হয় অদৃশ্যের কোনো পাতা ছুঁলো বনে মেঘ,
কোনোটি নিষ্ক্রান্ত যেন আকাশের অতল নিরিখে।
বুঝি ব্যাপ্ত তব জ্ঞান, মনে হয় জানো না কিছুই
আরো অন্তরঙ্গভাবে ; কোনো পাতা মানুষের মতো
ভোলালো মুখোসে, রূপে, কাল্পনিক নৈরাজ্যে নিজেরে ;
তারপর সুখে মৃত্যু, বুকে পচে সন্নিধান-আশা।
সব, সব জানো তুমি, তোমায় অদেয় কিছু নেই ;

আছো সঙ্গ হ'তে দূরে ; কোথায়, হে জননীজনক
প্রেমের সর্বস্ব ধন ? বাঁধি মোর খড়মূলে পাতা,
সাজাই তোমার বৃক্ষ অনুপম মিলনবিন্যাসে ;
ভুলে থাকি শিল্পে, মোহে, নীচতায়, রুগ্ন জড়দেহী—
কোথা তুমি, কোথা তুমি, হে দেবতা, যদি সখা তার ?

পনেরো বছর পরের জন্য

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

কে কী রকম বেঁচে আছে, জানতে ইচ্ছে করে।
যে-তিনটে লোক সাফল্যের কুড়োল হাতে নিয়ে
শব্দ ক'রে বন কাটতো, তারা এখন কোথায়—
একজন তো রীতিমতো সাজানো সংসারী
গোবরডাঙায় বাড়ি উঠছে মাঝারি দেড়তলা,
অন্য দুজন অঙ্ক কষতে পেরেও যেন দশমিকের ভুলে
শেষের ধাপের করুণ কাটাকুটি।

কিন্তু আমার ব্যঙ্গ করার কী অধিকার আছে ?
আমি বরং কৃতজ্ঞ যে, আঘাত দিতে এসেও ক্রমাগত
ওরা আমায় অন্য কিছু জুগিয়ে এসেছিলো ;
আমি ওদের শাদা কি নীল রঙে
ভাগ করতে জেনেছিলাম। শাদা কি নীল রঙে
কত ইতর দুর্ঘটনা আমার হাতে সুশ্রী হ'লো, ভাবো !

এখন আমি যে-ঘরে যাই, তারও নিজের জয়পতাকা নেই
কেউ ভাবে না, মিহিজামের মহারাজা থাকেন—
কিন্তু আমি অন্ধকারে যে-অবিরল বৃষ্টি শুনে ফিরি
তাকে, আমার রক্তে ছাড়া, অন্য কোথায় হিসেব দিতে হবে !

…'কিছু পেলাম', এই কথাটা জানাতে আর এখন
কোনো মেয়ের কাছে গিয়ে বাচাল হ'তে হয় না নিয়মিত,
শুধু যারা নানা ভাবে আমার জীবন ব্যস্ত রেখেছিলো
ফেরৎ-ট্রেনের টিকিট হাতে পাবার পর থেকেই
তাদের আবার খুঁজতে ভালো লাগে—

তারা এখন কোথায়॥

বুদ্ধদেব বসুর কবিতা: 'যে-আঁধার আলোর অধিক'

রমেন্দ্রকুমার আচার্য চৌধুরী

১

'দময়ন্তী'তে বুদ্ধদেব বহির্জগতের সমস্যায় উদ্বিগ্ন, শ্রেণী-বৈষম্যে ব্যথিত, কল্পনাকে কর্মরথে যুক্ত করতে উৎসুক। তৎকালীন সামাজিক সমস্যা ও ঐতিহাসিক পটপরিবর্তন তাঁর মনে যে-আলোড়ন উপস্থিত করেছিলো তাকেই তিনি রূপান্তরিত করেছিলেন কবিতায়। কিন্তু 'দময়ন্তী' তাঁর কাব্যজগতে একটা সাময়িক উৎক্ষেপ মাত্র—যার আলো আর তাপ অনেক উঁচুতে পৌঁচেছিলো অনেকদূর পর্যন্ত আলোকিত করবার জন্য। 'দ্রৌপদীর শাড়ি' থেকে বুদ্ধদেব আবার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কাব্যধারার সঙ্গে যুক্ত করলেন নিজেকে: প্রেম আর কবিতা, যা প্রথম থেকেই তাঁর প্রিয় ও প্রধান বিষয়বস্তু—এ দুয়ের আনন্দ ও বেদনা-রহস্যের উন্মোচন করলেন কবিতায়। 'যে-আঁধার আলোর অধিক' বইটিতে প্রেমের কবিতা আছে কয়েকটি, কিন্তু বেশির ভাগ কবিতা শিল্পের সময়, লক্ষ্য ও বিশেষ ক'রে নিগূঢ় প্রক্রিয়া সম্বন্ধে। আমাদের অবচেতন ও নির্জ্ঞান মনে যে-অক্ষয় স্মৃতির ঐশ্বর্য সঞ্চিত—সেই অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ ক'রে বুদ্ধদেব শিল্পের প্রক্রিয়া ও উৎসকে বুঝতে চেয়েছেন—এবং সেই সঙ্গে নিজের সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করতে। অর্থাৎ শিল্পীর পক্ষে আত্মোপলব্ধির জন্য প্রয়োজন আত্মস্থ হবার, বহির্জগৎ থেকে নিজেকে প্রত্যাহৃত ক'রে সম্পূর্ণরূপে নিজের মধ্যে ডুবে যাবার, শিল্প-প্রক্রিয়ার প্রত্যেক পর্যায়ে সচেতন থেকে তার প্রত্যেক পরিবর্তন, পরিবর্জন ও সংশ্লেষণের ওপর আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবার। সহজকে নয়, 'মায়াবনবিহারিণী নিমিত্তচেতন হরিণী'কে শিকার করাই তাঁর লক্ষ্য। পোল ভালেরি তাঁর অনেক প্রবন্ধ ও পত্রাবলিতে যা বলেছেন—বিশেষ ক'রে মালার্মে সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলিতে—তার সঙ্গে বুদ্ধদেবের বক্তব্যের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। ভালেরি একটি পত্রে প্রেরণা বা দৈবশক্তির ধারণাকে বাল-সরল অভিহিত ক'রে বলেছেন: 'আমি এ-কথা কখনো

২

বুঝতে পারি না যে, আমরা কেনই বা যতদূর সম্ভব গভীরভাবে আত্মস্থ হবো না।' মালার্মের কবিতার নিখুঁত, সশ্রম শিল্পকর্মের পরিচয় পেয়ে এই কবিই একবার শপথ গ্রহণ করেছিলেন: 'যদি আমি কখনো লিখি, তবে স্বপ্নাবেশে আত্মকর্তৃত্ব হারিয়ে মহৎ কিছু রচনা করবার চেয়ে সম্পূর্ণ সচেতনভাবে ও ও স্বচ্ছতার সঙ্গে নিকৃষ্টতর কিছু রচনা করাও আমার পক্ষে বরণীয় হবে।... কারণ দৃঢ়তার সঙ্গে পরিকল্পিত, বহুবিধ মানসিক সংকটের মধ্যে, বিধিবদ্ধভাবে অন্বেষিত, এবং পূর্বনির্ধারিত কতগুলি শর্তের নির্মম বিশ্লেষণের পর যে-রচনার উদ্ভব, তার মূল্য যা-ই হোক, স্রষ্টার চিত্তকে পরিবর্তিত না-ক'রেই পারে না, এবং তা নিজেকে উপলব্ধি করতে ও পুনর্বিন্যস্ত করতে সাহায্য করে।... পরিশ্রমের ফল, তার জাগতিক আবির্ভাব বা প্রভাব নয়, শুধু মাত্র যে-উপায়ে আমরা লক্ষ্যে পৌঁচেছি তাই আমাদের পক্ষে সার্থক ও শিক্ষাপ্রদ।...শিল্প এবং তার সমস্যা আমাদের গৌরব বৃদ্ধি করে; কিন্তু কাব্যলক্ষ্মী এবং সৌভাগ্য নিতান্তই চঞ্চল, কাছে এসে বারে-বারেই তারা ছেড়ে দিয়ে চ'লে যায়।' একটু বাদেই পরিমার্জনার কঠোরতা, প্রত্যাখ্যাত সমাধান, অস্বীকৃত সম্ভাবনা, অসন্তোষের প্রকৃতি ও শিল্পীর বিবেক প্রভৃতির প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলছেন: 'এখানেই সাহিত্য নীতিশাস্ত্রের সীমানায় পদার্পণ করে, এবং স্বাভাবিক ও পরিকল্পিতের মধ্যে দ্বন্দ্বের অবতারণা ঘটে, আর এখানেই অতি-সহজের প্রতিরোধে বীর এবং শহীদদের আবির্ভাব। কখনো প্রকাশ হয় নৈতিক শক্তির, কখনো বা ভণ্ডামির।'

বুদ্ধদেব বসুর শিল্পতত্ত্বের ভিত্তি আধুনিক মনস্তত্ত্ব এবং কোনো অস্পষ্ট জীবন-দেবতা বা দৈবশক্তি নয়, তাঁর মতে স্মৃতিই সৃষ্টির আরম্ভ ও কারণ। ইয়ুং-এর মতেও এক রহস্যময় রাত্রির জগৎ প্রেত, রাক্ষস ও দেবতার লীলাভূমি, এবং কবির পরাদৃষ্টিতে অন্তর্জগতের এই অন্ধকার অংশই উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে। 'আদিম অভিজ্ঞতাই সৃষ্টির উৎস।' ইয়ুং অন্যত্র আরো স্পষ্ট ক'রে এরই নাম দিয়েছেন 'সামূহিক নির্জ্ঞান' (collective unconscious), অর্থাৎ বংশগতির প্রবাহে গঠিত এক ধরনের মানসিক সংস্কার। মনোজগতের এই

অতলেই মানবসন্তানের আদিম অভিজ্ঞতা স্তরে-স্তরে সঞ্চিত, এবং বুদ্ধদেবের কবিতায় 'প্রাগৈতিহাসিক নীলিমা', 'মাতার গর্ভ', 'মূর্ছার কন্দর' প্রভৃতি শব্দ বা শব্দবন্ধে এই রহস্যময় অন্ধকারেরই একটা বর্ণনা দেবার প্রয়াস দেখি। জাঁ-পল সার্ত-এর একটি তত্ত্বও অনুরূপ কথাই বলে—কিন্তু অন্য ভাবে:

'মানুষের অস্তিত্বের শুরু হয় এক বিশ্বসত্তার অংশরূপে। এ-অবস্থায় তাকে মৌল সত্তা ব'লে অভিহিত করতে পারি। এই মৌল সত্তায় সকল সম্ভাবনাই সুপ্ত থাকে যা ব্যক্তিসত্তা কাজে লাগাতে পারে। ব্যক্তিসত্তা নিয়তই তার মৌল সত্তায় নিহিত সম্ভাবনা থেকে শক্তি আহরণ করছে। মাত্র এ-ভাবেই সে বাঁচতে পারে—চিন্তা বা কাজ করতে পারে, চলতে পারে।' নিজের মৌল সত্তায় নিহিত সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করবার আকাঙ্ক্ষাই বুদ্ধদেবের কবিতায় অভিব্যক্ত, অন্তরালে যে আছে তাকে দেবতা, শয়তান বা 'অন্তর্যামী' যা-ই বলি না কেন, আসলে সে 'নির্জ্ঞান মন'—যে কবির সমস্ত উচ্চারণকে এক গভীর উদ্দেশ্যময়তায় ভ'রে দেয়। কিন্তু স্মৃতির অফুরন্ত ঐশ্বর্যের সামান্য অংশই শিল্পকর্মে প্রকাশিত হ'তে পারে; অথচ শিল্পীর পক্ষে এই গুপ্ত শক্তির মূল্য তাঁর সজ্ঞান অভিজ্ঞতার চেয়ে অনেক বেশি:

'আঁধার তোমার স্বত্ব, কিন্তু তা-ই আলোর অধিক।'

এবং এই অন্ধকার-লোকে কম্পন না-জাগলে কোনো সৃষ্টিই সম্ভব নয়:

'তাই পট শূন্য প'ড়ে থাকে, পাথর নিঃসাড়, বীণা
শুধু বিসংবাদী, যতক্ষণ, তটের উদ্বেল ঢেউ পেরিয়ে, তুমি না
শেখাও সাগর-যাত্রা...'

অতএব, গভীরতম অন্তর্জগৎই শিল্পের প্রকৃত প্রেরণা—ছন্দ, মিল, ধ্বনি, তারই 'প্রতিভূ, প্রবক্তা, দূত'। এই চরম উৎস থেকে শক্তি আহরণ করতে হয় কবিকে—সেজন্য, সহজিয়াদের মতো, তাঁকেও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকে ভুলে গিয়ে পৌঁছতে হবে সমস্ত গতির পারে—'যেখানে মলয়/ ম'রে যায় বরফের ষড়যন্ত্রে' আর সেখানেই সৃষ্টি ক'রে নিতে হবে তাঁর নিজস্ব জগৎ—সচেতনভাবে: 'প্রান্তরে কিছুই নেই; জানালায় পর্দা টেনে দে।' বুদ্ধদেব বসুর মতে

পরোপকার, কোনো কর্মপঙ্ক্তীর অনুসরণ, বা জনগণের উন্মাদন শিল্পকর্মের উদ্দেশ্য নয়। পরোৎকর্ষে পৌঁছনো—একটি নিটোল আপেলের মতো ফ'লে ওঠাই শিল্পীর একমাত্র সাধনা। শিল্পের জাগতিক প্রভাব কিছু থাকলেও (অবশ্যই আছে) সেটা আপতিক—'স্নান, যান, ধানখেতে কিছু এসে যায় না নদীর।' তার আছে শুধু অনবরত অবসান আর আরম্ভ—অতএব, শিল্পীকে আশ্রয় নিতে হবে তাঁর নিজের মধ্যেই, এক 'অনাক্রমণীয় দুর্গে' :

'হও ক্ষীণ, অলক্ষ্য, দুর্গম, আর পুলকে বধির।
যে-সব খবর নিয়ে সেবকেরা উৎসাহে অধীর,
আধ ঘণ্টা নারীর আলস্যে তার ঢের বেশি পাবে।'

পোল ভালেরির একটি রচনায় সুন্দর বর্ণনা আছে কবির এই আত্মমগ্ন অথচ জাগ্রত অবস্থার :

'বুদ্ধি, সতর্কতা স্বপ্নের জন্ম দেয় ;
ঘুমের মধ্যেই স্পষ্ট দেখতে পাই ;
চিত্রকল্প আর ছায়া—তারাই তাকিয়ে থাকে ;
অভাব এবং শূন্যতায় সৃষ্টির উদ্ভব।'

অর্থাৎ শূন্যতার অন্ধকারেই সুষুপ্ত সব সম্ভাবনা—বিপরীত সব অভিজ্ঞতার সঞ্চয়, স্বর্গের পিপাসা আর মর্তের আকর্ষণ ; অতীত এবং ভবিষ্যৎ, শিল্পের কাজ সমস্ত বিভিন্নতা আর বৈপরীত্যের সমন্বয়-সাধন :

'সেতু বাঁধে শ্রমিক সম্প্রতি—
যার কূট কুয়াশায় কেলি করে ঋষি আর ধীবরযুবতী।'

২

'দ্রৌপদীর শাড়ি'-র একটি কবিতায় বুদ্ধদেব দুই পূর্ণিমার তুলনা করতে গিয়ে 'সহজে খুশি হ'তে-না-জানা সমালোচক মন'-এর জন্য অস্বস্তি প্রকাশ করে-ছিলেন। 'কিছুই সহজ নয়, কিছুই সহজ নেই আর'—এই পংক্তির পুনরুক্তির মধ্যেও জীবন ও সৃষ্টি থেকে সহজের বিলুপ্তির জন্য একটি দীর্ঘশ্বাস যেন শোনা

যায়। আসলে, সচেতনভাবে শিল্পকে আয়ত্তে আনতে চাইলেও সহজের প্রতি একটা আকর্ষণ বুদ্ধদেবের আছে, এবং এ-বইয়েরই কয়েকটি কবিতায় আমরা তাঁর পুরাতন আবেগ-প্রাবল্যের পরিচয় পাই। 'দেবযানীর স্মরণে কচ : ২, ৩, 'অনুরাধা', 'প্রেমিকের গান'—এই ক-টি কবিতার সৌরভ অন্তত ত্রিশ বছরের পুরোনো। কিন্তু 'সমর্পণ,' 'যাওয়া-আসা,' 'সমুদ্রের প্রতি'—এই তিনটি কবিতায় প্রেম ও বেদনা এক বিরল ও বিচিত্র সংগীতের রূপ নিয়েছে। বুদ্ধদেব বসু সাধারণত সংরাগ-তীব্রতা ও মিলন বা মিলনাকাঙ্ক্ষার আনন্দকেই ব্যক্ত করেন প্রেমের কবিতায়, কিন্তু এই কবিতাগুলিতে অস্থিরতার সঙ্গে এমন একটি শান্ত রস আছে, যা শেষ পর্যন্ত সমস্ত যন্ত্রণাকে ছাপিয়ে প্রমাণ করে 'দুঃখের সংগীতই এ-জগতে মধুরতম।'

মহাভারতের কাহিনীর রূপান্তরণে বুদ্ধদেব বসুর স্বাতন্ত্র্য এবং শিল্পসম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিই সুপ্রকট। রবীন্দ্রনাথ পৌরাণিক উপাখ্যানের ব্যবহার করেছেন সাধারণত নৈতিক কোনো উদ্দেশ্যে, বুদ্ধদেব শিল্পতত্ত্বের রূপক হিসেবে অথবা অ-নৈতিক কোনো মানবিক সত্যকে রূপ দেবার জন্য। দু-জনেই অবশ্য কচ-চরিত্রকে উন্নত করেছেন : 'যেন ত্রিভুবনে কোথাও উজ্জ্বল। হ'য়ে ফুটে থাকে চিরকাল তার চোখ'—রবীন্দ্রনাথের কচও এ-কথা বলতে পারতো। কিন্তু বুদ্ধদেবের কচ আরো একটু অগ্রসর হয় এবং 'বিদায়-অভিশাপ'-এর কচের সম্পূর্ণ বিপরীত প্রার্থনাই সে উচ্চারণ করে—অর্থাৎ দেবযানীকে বিস্মৃতির বর সে দেয় না, বরং কচের স্মৃতি তার 'চোখের আলো তরল ক'রে দিক' এই মানবিক আকাঙ্ক্ষাই তার কথায় ব্যক্ত। রবীন্দ্রনাথের কচ একজন রক্ত-মাংসহীন আদর্শ মাত্র। প্রেম ও কর্তব্যের দ্বন্দ্বে (যা মহাভারতে নেই) তিনি তীব্রতা সঞ্চার করতে পারেন নি। একটুও হৃদয়-দ্বন্দ্বে বিচলিত না-হ'য়ে বিদায়-কালে মাত্র দুটি পংক্তির সংক্ষিপ্ততায় কচের সদিচ্ছার সপ্রতিভ উচ্চারণে মহৎ ভাবালুতা প্রকাশ পেলেও প্রেমের সুর লাগে নি। কথা ক'টির ক্ষিপ্রতা এবং অনায়াসনৈপুণ্য বরং এক অ-মানবিক ঔদার্যের জন্যই নিষ্ঠুর।

বুদ্ধদেব বসুর ভাষাও নাটকীয়, যন্ত্রণার উপযুক্ত বাহন। সংক্ষিপ্ত কয়েকটি

চিত্রকল্প, ভাঙা-ভাঙা পংক্তি এবং টুকরো-টুকরো কথায় তিনি যে-ভাবে কচের সংরাগরক্ত যন্ত্রণাকে উপস্থিত করেছেন তাতে কচ সত্য ও বিশ্বাসযোগ্য হ'য়ে উঠেছে। অথচ রবীন্দ্রনাথ থেকেই সম্ভবত তিনি সূত্র পেয়েছিলেন; কচের 'বিদ্ধ মৃগসম' কথাতে যা আভাসে ছিলো কিন্তু স্পষ্ট হয়নি, বুদ্ধদেব তাকেই পরিস্ফুট করেছেন। অবশ্য অন্য দুটি কবিতায় নাটকীয় নৈর্ব্যক্তিকতার বিশেষ অসদ্ভাব, যেন কচ ও দেবযানীর ছদ্মবেশে ব্যক্তিগত প্রেমের আকৃতিকে প্রকাশ করাই কবির লক্ষ্য।

এ-সমস্ত ক্ষেত্রে 'কঙ্কাবতী'র সহজ আবেগপ্রবাহের সঙ্গে পাঠকের সাক্ষাৎ ঘটলেও, অধিকাংশ কবিতায় বুদ্ধদেব এক কঠোর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধীন। বস্তুত, ভাষা ও আবেগের উপর ক্রমিক আত্ম-কর্তৃত্ব স্থাপনই তাঁর কাব্য-জীবনের ইতিহাস, এবং এই সূত্রেই বুদ্ধদেব বসুর চরিত্রের পরিমাপ সম্ভব। শিল্প-সম্বন্ধীয় কবিতাগুলিতে কবি হৃদয়াবেগকে এক কঠিন ও সংহত রূপ দিতে সচেষ্ট, 'মরুপথ'-এ সৃষ্টির আনন্দকে চমৎকারভাবে ব্যক্ত করেছেন বস্তু-প্রতিরূপের সাহায্যে:

'তবু স্পর্শ নতুন ঋতুর
বীজাণু ছড়িয়ে দেয়, সিক্ত হাত, কনুইয়ের লোমকূপে ফ'লে ওঠে ফল,
এবং দর্শনস্নিগ্ধ কণ্ঠ ঠেলে ফুটে ওঠে সন্ধ্যার আজান।'

৩

সাম্প্রতিক কালে প্রত্যেক কবিই নিজের ঘর্মের বিনিময়ে জানেন যে এই মুদ্রাযন্ত্রের বহুল প্রসার ও শিক্ষা-বিস্তারের যুগে কবিতার ভাষাকে সপ্রাণ রাখা কী কঠিন সমস্যা, কেননা কোনো একটি শব্দের প্রচলন এখন পূর্বের তুলনায় সহস্রগুণ বেশি। শব্দ অবশ্য ঠিক মুদ্রা নয়, কারণ মুদ্রা হাতে-হাতে ঘুরে ব্যবহারের অযোগ্য হ'য়ে যায়, কিন্তু শব্দ সাময়িকভাবে অপ্রচলিত হ'লেও তার পুনরুজ্জীবন সম্ভব। যেহেতু কাব্য শব্দোপায়ী, প্রত্যেক আত্মসচেতন কবিকেই কবিতার ভাষাকে সজ্ঞানে সৃষ্টি ক'রে নিতে হয়, এবং শব্দ সম্বন্ধে অসন্তোষ

সহজে ঘুচতে চায় না। বুদ্ধদেব বসু প্রত্যেকটি শব্দ, এমনকি ছেদচিহ্ন
সম্বন্ধেও অত্যন্ত সতর্ক, এবং তাঁর কবিতায় যে-বৈশিষ্ট্যটি প্রথমেই পাঠকের
দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটা তার সজীব শব্দপুঞ্জ। অবশ্য 'অসহনীয়', 'সপ্রতিভ',
'গতানুগতিক' প্রভৃতি গদ্যগন্ধী বা আবেগ-দ্যোতনাহীন বিশেষণ, এবং
'সারাৎসার', 'বৃহদরণ্যের মতো তর্কপরায়ণ' প্রভৃতি শব্দ বা শব্দবন্ধের প্রয়োগে
বুদ্ধদেব জীবনানন্দ দাশের অনুগামী, এবং দু-এক জায়গায় জীবনানন্দের
কবিতার সুপরিচিত অংশ অদ্ভুতভাবে রূপান্তরিত হয়েছে নতুন শব্দ বা
শব্দবন্ধে: 'শুনেছি 'অমৃতকণ্ঠে প্রতিপন্ন নিয়মের গান,—এখানে 'অমৃতকণ্ঠ'
শব্দবন্ধটির সৃষ্টি হয়েছে সম্ভবত জীবনানন্দ দাশের 'অমৃতসূর্যে'র 'অমৃত' ও
'কিন্নরকণ্ঠে'র 'কণ্ঠ' কবির মনে সংযুক্ত হ'য়ে গিয়ে। কিন্তু বুদ্ধদেবের
মৌলিকতা অধিকতর প্রকট 'মলয়', 'পুলিন' প্রভৃতি ম্লান কাব্যিক শব্দের
পুনরুজ্জীবনে। একটি সার্থক পংক্তি বিশ্লেষণ করলেই তাঁর কারুকর্ম সম্বন্ধে
আমাদের ধারণা স্পষ্ট হবে।

'কামনার সান্দ্র আবেদনে
জলেছি সম্মত ধূপ হাজার শয্যায়...'

'সান্দ্র' প্রভৃতি দুরূহ তৎসম বিশেষণ আধুনিক কালে সুধীন্দ্রনাথের কবিতা ছাড়া
অন্যত্র বিরল হ'লেও আলিঙ্গনের নিবিড়তা বোঝাবার জন্য এমনি একটি কঠিন
অনুপ্রাস এবং ধ্বনিময় যুক্তবর্ণের প্রয়োজন ছিলো এখানে। শব্দটির অভিধানিক
অর্থ (১) নিবিড়, (২) গাঢ় ও তরল (viscous) এবং কামের প্রসঙ্গে উভয়
অর্থই গ্রাহ্য। 'সম্মত' আর 'ধূপের' সন্নিপাত বুদ্ধদেব বসুর নিজস্ব এবং
অপ্রত্যাশিত; ধূপের মৃদু, কোমল সৌরভের দ্যোতনা আছে এই বিশেষণটিতে।
ধূপের সার্থকতাও বহুবিধ: শুধু যে কামই সুরভিত হ'য়ে উঠেছে এই তুলনায়
তা-ই নয়—এই শব্দটির উদ্ভাসনে সম্পূর্ণরূপে সেই পুরোনো কালটি বেঁচে
উঠেছে যখন কামসেবা নিছক একটা জৈব ব্যাপার না-থেকে রীতিমতো
শিল্পকলায় পরিণত হয়েছিলো—যার পরিচয় আমরা পাই বাৎস্যায়নের
কামসূত্রে।

৪

বুদ্ধদেব বসুর শিল্প-সম্বন্ধীয় কবিতাগুলি কবির বিশেষ অভিজ্ঞতা ও উৎকাঙ্ক্ষাকে ব্যক্ত করলেও বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত নয়। 'মাছের ঝোল', 'বাথরুম', 'ট্র্যামের হাতল' প্রভৃতি দৈনন্দিন বস্তু বা ঘটনা পাশাপাশি বিন্যস্ত হয়েছে 'নক্ষত্র', 'ফুল', 'নীলিমা' প্রভৃতি প্রথাসিদ্ধ সৌন্দর্যের প্রতীক। বাস্তবজীবন ও গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত এমনি অজস্র চিত্রকল্প, অভিজ্ঞতা বা ইতস্তত জীবন-ভাষ্যের জন্য সনেটের ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে কবিতাগুলি একটা ঘনত্ব ও বিস্তার লাভ করেছে; ফলে কবিহৃদয়ের সঙ্গে সাধারণ পাঠকের এক ধরনের সংযোগ-স্থাপন এখানে সম্ভব। এবং বহিরঙ্গের জন্য ততটা নয়, এমনকি বহু মৌলিক মিলের জন্যও নয়, যতটা এই কারণেই সনেট বুদ্ধদেব বসুর হাতে একটা যান্ত্রিক অভ্যাসে পরিণত হ'তে পারে নি। সনেট-রচনায় কবি যে-স্বাধীনতা নিয়েছেন কখনো চোদ্দ বা আঠারো মাত্রার সীমা অতিক্রম ক'রে, কখনো পর্বে 'যখন মরীচিকার' বা 'মৃগয়া, বনভোজন'-এর মতো তিন-পাঁচ বা তিন-দুই-তিন মাত্রার সংস্থানে, অথবা প্রচুর ছেদচিহ্নের ব্যবহারে, যার ফলে কোনো-কোনো লাইন টুকরো-টুকরো হ'য়ে গিয়ে ছন্দের বৈচিত্র্যসাধন করেছে, সেটা অনেকেরই হয়তো মনঃপূত হবে না। কিন্তু বহিরঙ্গের নমনীয়তা সত্ত্বেও সনেটের যা অন্তঃসার, অর্থাৎ ভাবগত ঐক্য, এবং একটিমাত্র ভাবের ক্রমিক বিবর্তন—সেটা সর্বত্রই অক্ষুণ্ণ আছে। 'রাত তিনটের সনেট : ১' কবিতাটির দ্বিতীয় চতুষ্কে কবি অপ্রত্যাশিত ভাবে একটা দ্রুত, উত্তেজিত তর্কের ভঙ্গি এনে ফেলেছেন ('যীশু কি পরোপকারী/ ছিলেন, তোমরা ভাবো?'), অথচ এতৎসত্ত্বেও কেন্দ্রচ্যুতি ঘটে নি, যেহেতু এই পংক্তিগুলি মূল বক্তব্যেরই পরিপোষক। যদিও বুদ্ধদেব বসুর হাতে এই কাব্যরূপটি প্রচলিত রীতি অনুযায়ী প্রেম, নিসর্গ-প্রীতি বা দেশপ্রেমের পরিবর্তে আত্মমগ্ন জটিল চিন্তার বাহন, তবু, যেহেতু কবি হৃদয়াবেগে আন্দোলিত হয়েছেন মস্তিষ্কচালনার বিভিন্ন পর্যায়ে, এই কবিতাগুলি নীরস তাত্ত্বিক আলোচনার পরিবর্তে চিন্তা ও

আবেগের স্ফটিক-কঠিন সমন্বয়ে এক অপরূপ রসসৃষ্টি। উপরন্তু, প্রধান বিষয় শিল্পতত্ত্ব বা প্রেম হ'লেও চিত্রকল্প, প্রতীক বা পটভূমিকারূপে নিসর্গবর্ণনার অভাব নেই তাঁর কবিতায়। অবশ্য এ-বইয়ের প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল অনেক ক্ষেত্রেই বৈদেশিক, এবং একটি কবিতায় 'রবিন' পাখির উল্লেখ দেশীয় পণ্ডিতদের পক্ষে সম্ভবত অস্বস্তিকর। কিন্তু আধুনিক যুগে এ-ধরনের বৈদেশিকতায় আপত্তি করার কোনো কথাই ওঠে না।

'টোয়েলফথ নাইট'-এর নায়িকার মতো কবিতারও জন্ম নাকি একটি নৃত্যচঞ্চল নক্ষত্রের উদ্ভাসে। বুদ্ধদেব বসু কিন্তু স্মৃতিকেই দেবী ব'লে মেনেছেন, তারই আলো আর শিশির ছড়িয়ে আছে তাঁর কবিতায়। তাঁকেই বন্দনা করেছেন তিনি নানা ভাবে—দুঃখে, প্রেমে, হতাশায়। কিন্তু এ-বইয়ের প্রধান সুর নির্বেদের; শান্ত মনে সব কিছু মেনে নিয়ে শিল্পকর্মে ডুবে যাবার, বেদনাকে গানে রূপান্তরিত করবার সাধনাই, কবির পক্ষে, একমাত্র উদ্ধার। 'যে-আঁধার আলোর অধিক'-এ যৌবন আর মধ্যবয়স, অতীত এবং বর্তমান, যেন দাঁড়িয়ে আছে একসঙ্গে—আসন্ন সন্ধ্যার দিকে চোখ রেখে। 'তোমায় আমি রেখে এলাম ঈশ্বরের হাতে।' (এখানে 'ঈশ্বর' শুধুই কি বাক্যালংকার?) এমনি অনেক পংক্তি ঘুরে-ঘুরে মনে আসবে পাঠকের। 'যে-আঁধার আলোর অধিক' এক গুচ্ছ স্মরণীয়তা।

দুটি কবিতা

অস্থির

রমেন্দ্রকুমার আচার্য চৌধুরী

অস্থির হাওয়ায় কাঁপে গাছ, শান্ত ঘর।
সন্তদের দিন নেই—আর সৌম্য মহত্তমদের
ঝলসে গেছে মুখ সেই দানবিক যুদ্ধের আগুনে
যার গল্প করবেন আমাদের আরো দীপ্ত কোনো বংশধর।

জানি এই রক্তাক্ততা হাতে নিয়ে তবু
আমাদের অধিগত বহুবিধ চমকপ্রদ দান :
হেলিকপটারে চ'ড়ে কৃষ্ণ নামে চুপি-চুপি ছাতে,
ফ্লেমিং-কে ধন্যবাদ—যে রেখেছে ফুর্তির সম্মান।

কে তোমার বুকের গাগরি থেকে সুধা চুরি ক'রে
উড়ে গেলো? কুয়াশার কাচে ধীরে স্পষ্টতর বন;
বেছে নাও ঝলোমলো পাখির উৎসাহে তুমি ফের,
মস্ত এক বাড়ি যার, পদস্থ যে, বহু লোকজন।
হ'য়ে যাও প্রজাপতি (এক প্রেম এঁদো জলে মরে)।
কেন তোড়া হাতে নিয়ে সনাতন সত্যশ্রীলতার?
যদি থাকে মনোভাব শুভ্র কিছু অসুস্থতার,
জড় চিত্রে রূপ নাও—ঠাণ্ডা ফল কিংবা কল্‌সি স্থির তার করে।

'সমুদ্রে ছিলো না কিংবা আভাসিত যে-আলোর কথা
কবি আর মরমীরা গান গেয়ে বলেন সহজে,
সে কোথায়?' একটি লোক হেসে উঠলো অন্ধকার যেন,
কাগজের ফুলে যার চিমসে হাত অলৌকিক খোঁজে।

'যদি থাকে'—একজন পানাসক্ত দীর্ণকণ্ঠে বলে,
'তবে কেন জগৎ বদলে যায় যকৃতের ক্রিয়া ভুল হ'লে?'

খাকি-প্যাণ্ট মেয়েটির ক্লান্ত মুখচ্ছবি
ছড়িয়ে দিয়েছে বিষ অন্তহীন দূর নীলিমায়;
সকালে নিস্তেজ সূর্য দীর্ঘসূত্রী লতিফের মতো;
আকাশে মেঘের মতো মূল্য আজ পরিবর্তমান।

রোমাণ্টিক

বৃষস্কন্ধ, অকপট, ৬-১ উঁচু,
হ্রস্বদের পৃথিবীতে যাকে বলা চলে 'একজন'—
রাইফেল কাঁধে নিয়ে মুখোমুখি বুনো হাতি মেরে
পার হ'য়ে যেতো নদী, তারাভরা সেগুনের বন।

ঝলসানো হাঁস, মদ, সবুজ তরকারি, কাঁচা ফল,
এই তার সান্ধ্যভোজ ক্লান্ত হ'য়ে ঘরে ফিরে এলে;
বড়ো-বড়ো অনুভবে চোখ ভ'রে দেখা দিতো জল
ফের রোদ হেসে উঠতো সহজেই মেঘ ভেসে গেলে।

ঝিনুকের হাত নয়—রোমশ নারীর
স্পর্শ তার উদ্ভাসিত প্রিয় ঝংকার;
রঙচঙে জামা প'রে হোমরের গ্রন্থ থেকে বীর
সাম্প্রতিক চলচ্চিত্রে যেন করে দানব শিকার।

তার মুখে গল্প শোনো : বন্ধু তার, শান্ত ভদ্রলোক,
বয়স ত্রিশের কাছে, কবিতার মতো কথা বলে,
শ্যাম্পু-করা চুল, ছুটি ময়নার মতো কালো চোখ,
আত্যন্তিক কল্পনাপ্রবণ তাকে জানতো সকলে।
নবোঢ়ার তাজা বুক, রাত্রিগুলি তার,
ডেকে নিয়ে গিয়েছিলো রোমাঞ্চক ফুলের জগতে
নাইটিঙ্গেল হ'য়ে এক—ছুটি নম্র, কেঁপে-ওঠা হাত
জানালো গভীর ইচ্ছা—রক্তের আলোড়ন—তবু কোনো মতে।

অথচ সে বুঝলো না। শুধু আকস্মিক
প্রেরণায় জানলা খুলে যেন কোনো আশ্চর্য অসুখে
চেয়ে থাকে—চিত্রার্পিত। তারপর সেই রোমান্টিক
এক চামচে জ্যোৎস্না তুলে ধরে তার প্রেমিকার মুখে।

নায়িকা-কে

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

দ্রৌপদী, হেলেন নও, ট্রয় কিংবা কুরুক্ষেত্র আর
কখনো জলবে না রূপে, মহাকাব্য লিখবে না কেউ,
আলোর আসঙ্গে এসে চুপিচুপি ফিরবে অন্ধকার
শরীরের ছুটি তীরে আযৌবন দোলা দেবে ঢেউ।

অভিসারিকার বর্ণ বহুরূপী প্রাণের নির্জনে,
ঐকান্তিক অনুভবে যদিও তা নিতান্ত নিরেট
অবিরল জলধারে হঠাৎ কখনো আনমনে
রক্তের অক্ষরে শুধু লিখে যাবে একটি সনেট।

নগর ঘনায় চোখে—রাত-জাগা নটীর নূপুর
আচ্ছন্ন রোগীর মতো দিনরাত শুনি কান পেতে,
কয়েকটি দুঃস্বপ্ন এসে হত্যা করে বিবর্ণ দুপুর
অতর্কিত দেহমন সমর্পিত তোমার দু'হাতে।

কিছুই অদেয় নেই সমুচিত সুস্থ প্রতিদানে
অঙ্কের নিয়মে ঠিক হিসাব মিলানো দূরে কাছে,
জীবন খেলনা নয়, দুগ্ধপোষ্য শিশুটিও জানে
বোকারা যদিও ভাবে দৃশ্যান্তরে অন্য কিছু আছে॥

কয়েকটি ট্রিওলেট

সলিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

১

মাঝে-মাঝে মনে হয় তুমি এক স্বপ্নের সারস :
কেন যে আমার হাতে উড়ে-উড়ে বন্দী হ'তে এলে !
ছিলে মুক্ত স্বতঃস্ফূর্ত, অন্তহীন ডানার সাহস
কোথায় এনেছে, ছাখো। হায়, তুমি স্বপ্নের সারস !
অথচ আছো তো বেশ। পা ছড়িয়ে ছুই চক্ষু মেলে
পশমের জামা বোনো। নেই রাগ বিদ্বেষ আক্রোশ।
রূঢ় সত্য তবু এই : তুমি এক স্বপ্নের সারস।
কেন যে আমার হাতে উড়ে-উড়ে বন্দী হ'তে এলে !

২

কিছুই মনের মতো নয় !
এমন কি তুমি—তুমিও না।
এ আমার অগাধ বিস্ময় :
কিছুই মনের মতো নয়।
সাগর না, মরুভূমিও না—
হে আমার আশ্চর্য হৃদয় !
কিছুই মনের মতো নয়,
এমন যে তুমি—তুমিও না ॥

৩

শূন্য মন। একলা ঘর। ব্যথার ভার।
অন্য ডালে পাখিরা আজ বাঁধলো বাসা।

স্মৃতির দাঁত চিবিয়ে ছেঁড়ে অন্ধকার।
শূন্য ঘরে একলা মন : ব্যথার ভার।
শাদা-কালোর ছকে যারা খেললো পাশা—
খিলখিলিয়ে রাখলো কালের অঙ্গীকার।
শূন্য ঘরে একলা মন : ব্যথার ভার :
অন্য ডালে পাখিরা আজ বাঁধলো বাসা ॥

৪

হাতে হাতে রাখি, জ্ব'লে ওঠে বিদ্যুৎ—
মেঘে-মেঘে সংঘর্ষ।
ঘুরে-ফিরে আসে প্রাক্-প্রালয়িক দূত :
হাতে হাতে রাখি, জলে ওঠে বিদ্যুৎ।
রক্তে বিপুল হর্ষ :
দ্যুলোক ভূলোক মূর্ছিত, অবলুপ্ত পঞ্চভূত !
হাতে হাতে রাখি, জলে ওঠে বিদ্যুৎ—
মেঘে-মেঘে সংঘর্ষ ॥

৫

বৃষ্টি, বৃষ্টি। অন্ধকার। নির্জন দুপুর।
কঠিন দুয়ার রুদ্ধ। কে ডাকে, কে ডাকে ?
শত শত শতাব্দীর নিঃশব্দ নূপুর !
বৃষ্টি, বৃষ্টি। অন্ধকার। নির্জন দুপুর
করুণ রঙিন মুখ, ম্লান চোখ, আঁকে।
এলোমেলো হাওয়া। চুপ। অতলান্ত সুর।
বৃষ্টি, বৃষ্টি। ছায়াচ্ছন্ন নিষ্ঠুর দুপুর।
রুদ্ধ দ্বার কেঁপে ওঠে : কে ডাকে, কে ডাকে ?

দুটি কবিতা

সরল বৃত্তে

বংশীধারী দাস

সকাল থেকে সন্ধ্যা তার
গড়িয়ে যায় বিলম্বিত লয়ে,
কিছু আলোর সফলতার
অভীপ্সিত সুখী সমন্বয়ে
জীবন তার নিরুদ্বেগ,
লাগে না পালে অবিমৃষ্য হাওয়া;
আকাশে নেই কুটিল মেঘ
দুঃসাহস করে না তাকে ধাওয়া।

ছোট্ট এই বৃত্তটার
সকল রেখা চিনেছে নির্ভুল,
বাইরে গাঢ় অন্ধকার
অথৈ জলে ছাখে না কোনো কূল,
বাইরে যত দ্বন্দ্ব আর
অন্তহীন জটিলতার ভয়,
রাত্রিদিন যন্ত্রণার
আগুনে পুড়ে দেখবে সংশয়।

মোমবাতি

যেহেতু সে চিন্তাশ্রয়ী জীব
চিত্ত তার রক্তের মতন
এবং যেহেতু চিন্তা কখনো অধীন
হয়নি, হবে না কারো, বরং উদ্‌গ্রীব

বাধাহীন
স্বকীয় যুক্তিতে,
ব্যক্তিহীন সমষ্টির কল্যাণগাথায়
আগ্রহী হবে না তার মন।

যেহেতু চিন্তাই তার একমাত্র সাথি
শান্তি নেই মিছিলের ভিড়ে,
ফলত শিবিরে
সে জ্বালাবে অস্তিত্বের শীর্ণ মোমবাতি
নিঃসঙ্গ আঁধারে,
অতন্দ্র প্রহরী হ'য়ে জাগবে সে দ্বারে।

তিনটি কবিতা

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

এখন দুপুরবেলা

কোনো কিছু শব্দ ক'রে বাজে না এখানে ;
ঘড়ি কি জীবন, কিংবা যৌবনের স্তিমিত বিষাদ
কিছুই কাঁপে না ঐ প্রতিবেশী ছায়ার বাগানে।
এখন দুপুরবেলা চতুর্দিকে রৌদ্রের বিস্তার ;
দু' একটা পাখির ডাক যতোদূর আমাদের ডাকে,
তারই সন্নিকটে কেউ ঘুমিয়ে রয়েছে।
আমি তার মুখ দেখে প্রতিদিন সময় জেনেছি।
দেখেছি বিকেলবেলা তার নিত্য প্রসাধনে সেজে
আমাদের নিয়ে গেছে পুরাতন স্বপ্নের প্রাসাদে।
সেখানে যা-কিছু ছিলো, তাদের নিহত বিম্ব আজো
জলের ভিতর মগ্ন গুচ্ছ-গুচ্ছ শ্যাওলার মতো প'ড়ে আছে।
সেই সব মৃতদেহ, যারা একদিন এই বস্তুর জগতে
খণ্ড-খণ্ড ইট কাঠ পাথরের ছায়া হ'য়ে ছিলো,
তাদের সে-সব স্থিতি আজ অন্য মণ্ডলের দিকে।
ক্রমশ সূর্যের তাপ গোধূলির নির্জন প্রান্তরে
এ কী শোকাবহ মূর্তি গ'ড়ে তোলে আমাদের নিঃসঙ্গ প্রবাসে।

এখন দুপুরবেলা, কিন্তু তার অন্য অভিপ্রায়
এখনি উন্মুক্ত হ'য়ে যদি এই প্রকাশ্য আলোকে
হ'তো এক অবিশ্বাস্য মায়াবী দর্পণ,
যেখানে কিছুই আর নগ্ন নয়, তবু সবই নিষ্ঠুর নগ্নতা ;
যেখানে জীবন এক অগ্নিকুণ্ড এবং যৌবন

সহজ রৌদ্রের নিচে সোনা রুপো পিতলের অহংকার নয়,
অথচ প্রকৃত অর্থে একটি দিগন্ত যতোদূরে
তারই সহচররূপে এই সব শূন্য দৃশ্যাবলী
আমাদের আরো দূরে—প্রচ্ছন্ন আঁধারে নিয়ে যাবে।
অন্তত আমরা যেন অন্ধকার দেউলে বারেক
মাছির মতন উড়ে এই দেখি, সময় চলেছে
নদীর স্রোতের প্রায়, কিন্তু তার এপারে ওপারে
আর সব প্রস্তরেরই মতো স্থাণু, নিশ্চল, নীরব হ'য়ে আছে।
ব্যক্তিগতভাবে আমি দেখিনি এমন দৃশ্য, যাকে
বলা যায় অবিস্মরণীয়, তবু এখনো সূর্যাস্ত-সূর্যোদয়ে
গণ্ড-রাঙা-করা সব মেলার পুতুল মনে পড়ে ;
তাদের স্তনের আভা, তাদের চোখের শিখা থেকে
আজো মাঝে-মাঝে এই দুপুরবেলার মুহূর্তেরা
পাখির ঝাঁকের মতো জনপ্রিয় হ'য়ে জেগে ওঠে।

জাগ্রত জীবনে আজ পুঞ্জ-পুঞ্জ শব্দের প্রবাহ
আমাদের আলোড়িত করে। আমাদের ক্ষমা ক'রে
যে-সব আলোর রেণু প্রতিদিন পতঙ্গের পাল
গ্রাস করে, অন্ধকারে এবং কুয়াশাকীর্ণ ভোরে
সেই সব নষ্ট পতঙ্গের মুখ, মৃত্যু ও জীবন
অজস্র রৌদ্রের দিকে উড়ে যেতে-যেতে ফের বলে,
ওরে প্রিয়, স্বপ্ন ছাখ, তোর জন্য ঐ দূরে জলে
আমাদের সম্মিলিত উদ্যমের অগ্নিকুণ্ড, ছাখ,
কেমন দুপুরবেলা খানখান হ'য়ে ভেঙে পড়ে
আবৃত আলোর দিকে, অপরাহ্ণে, প্রেমিকের চোখে।

হে প্রেম, তোমার জন্য ঐ শোনো বাজে
আমাদের সম্মিলিত পাপে এক মন্দিরের মলিন পাষাণ;
দর্পণে চাইনি ফিরে, তবু দুই চোখের উদ্ভাস
চেয়ে ছাখো, চিরকাল জেগে রয় তোমার শিয়রে;
আগুনে ছিলাম, আজ আলোকের দিকে চ'লে যাই—
হে স্বপ্ন, মৃত্যুর ছায়া ; হে আঁধার, হে মহাজীবন।

স্মৃতির আলোয়

দুঃস্বপ্নে একটি সাপ প্রতিদিন আসে এইখানে :
আমার চোখের মাঝে, আমার বুকের মধ্যে তার
নিখুঁত ফণার মুদ্রা নিদ্রাতুর মুখের উপরে।
চতুর্দিক ভ'রে জলে নীল আলো, জলে
অনেক নক্ষত্র, চাঁদ, হিম-জমা প্রকাণ্ড পাহাড়,
আলোয় ছায়ায় মেশা দীর্ঘ, দীর্ঘ গাছ
জ্যোৎস্নায়, স্মৃতির মতো, বিস্মৃতির মতন এখানে;
যেন এই পৃথিবীর নদী-সমুদ্রের সন্নিকটে
একটি নিভৃত দুঃখ দুঃস্বপ্নের ভিতরে দাঁড়িয়ে।

কুণ্ডলী-কাঁপানো এক শরীরের অতর্কিত আভা
ঘুমের ভিতর দিয়ে ভিন্ন-ভিন্ন নদীতে আমাকে
নিয়ে যায় ; আমি স্পষ্ট তার সেই মুখ
আমার মুখের কাছে, আমার বুকের কাছে এনে
নক্ষত্রকে নিভে যেতে বলি ; তার কানে-কানে বলি,
আঁধারের মতো কোনো অনুপম সত্যে উপনীত
হ'য়ে, অথবা না-হ'য়ে, এই প্রাণ

পুড়ুক যে-কোনো এক অগ্নিকুণ্ডে, যেখানে জীবন
জীবনের হত্যাকাণ্ডে হৃদয়ের গুণগান করে।
ঐ পোড়ো মাঠে এক বিনষ্ট হৃদয়,
অজস্র জোনাকি জ্বলে তাকে ঘিরে-ঘিরে,
ঘুরে-ঘুরে নেভে ক্রমে নাম, স্মৃতি আনন্দ ও আলো।

ক্রমশ সুনীল আলো ফিকে হ'য়ে এলো এইখানে;
এখানেই আন্তরিক কোনো আলো অথবা আগুন
কিছুই জ্বলবে না আর বহুকাল ; অথচ অতীতে
একবার দরজা খুলে দিলে কতো রোদ
প'ড়ে থাকতো এই সব বিক্ষত পাষাণে ; সারাদিন
মনেও হ'তো না কেউ মৃত্যুরূপে জাগে অন্য ঘরে,
কিংবা কোনো জানালার রহস্যের আভা
আজো নড়ে-চড়ে এই বিকেলের পর্দার পিছনে।
এই সব ছায়াচ্ছন্ন অতীত হারিয়ে যাবে আজ ;
আজ শুধু মনে হবে, কী যে মনে হবে—হায়, স্মৃতি…
চতুর্দিক ভ'রে জলে নীল আলো, জলে
অনেক নক্ষত্র, চাঁদ, হিম-জমা প্রকাণ্ড পাহাড়,
আলোয় ছায়ায় মেশা দীর্ঘ, দীর্ঘ গাছ
জ্যোৎস্নায়, স্মৃতির মতো, বিস্মৃতির মতন এখানে।

দুঃস্বপ্ন ! একটি সাপ আজ আমায় করেছে দংশন।

বিপুল ধ্বংসের দিকে

বিপুল ধ্বংসের দিকে আছে এক আঁধার গহ্বর ;
জীবন, উপভোগের ফুল মাত্র, কাননের কীট, বুঝি তাও।
তবু সে চতুর উক্তি, দৃষ্টান্ত এবং উঁচু গলা,
কখনো এমন নয়, যার অর্থে সঞ্জীবিত সর্ব সারাৎসার,
নিষিদ্ধ সে-পথ নয় প্রকৃত উপমা, যার মূলে
একটি কেন্দ্রের মুখ, একাধিক আত্মসমর্পণ,
পাপ, ক্লান্তি, মৃত্যুভয়, নৈরাজ্য, বিষাদ সবই আছে ;
আছেন ঈশ্বর তাঁর একাকিত্বে, যেখানে নির্ঝর
প্রতিটি স্ফুলিঙ্গে পূর্ণ আগুনের ফুল নয়,
বরফের শীতলতা নয় ; তবু, তারই বিপরীত উপমান
প্রস্তরফলকরূপে বিজ্ঞাপিত যে-শূন্য মন্দিরে,
ছাখো তার তন্ময়তা শৃঙ্গের গোপন অহংকার।

আলো, আরো আলো চাই চিন্ময় পাষাণে।
প্রতিটি সোপানশ্রেণী চিরকাল আঁধারে আবৃত ;
দেবদারু-বৃক্ষঘন পথে যেতে-যেতে কোনোদিন
বৃষ্টি হবে, এই আশা ; অথবা লোকালয়ের বুকে
রৌদ্রে চমৎকৃত হবে সেই স্বপ্ন, যার শবদেহ
অস্ত্রোপচারের আগে ছিলো অস্থিমাংসের বিপণি।
এখন উন্মুক্ত সবই, যেদিকেই দৃষ্টি ফেরে, দেখবে দৃশ্যাবলী
নিদ্রিত, অথবা অবচেতনের অন্যায় সুযোগে
তোমাকে আকৃষ্ট করে তরঙ্গের বিবিধ মুদ্রায়।
তোমার তৃষিত জিহ্বা লেহনের জন্য ব্যবহৃত,—

এই সত্য সংশয়ের অতীত উদ্যানে, গাছপালায়
প্রচারিত, দ্বিরাচার একাত্মীকরণে উন্মোচিত।

একাগ্র লক্ষ্যের দিকে এখনো আঁধারপুঞ্জ জ্বলে,
এখনো যে-সব মুখ মৃত ব'লে, এ-বিশ্বভুবন
দেখায় দর্পণধৃত অজস্র জীবন, সকলেই জানি,
আমাদের আত্মীয়তা তাদের শরীর নিয়ে ছিলো একদিন।
খণ্ড-খণ্ড পাথরের উপরে এখন অন্য আলো,
জলাশয়ে কী নিবিড় জ্যোৎস্না ভাসমান ;
এই তো সময় যদি মৃত্যুরূপে সোনার হরিণ
আমাদের ডেকে নেয় অরণ্যের ইচ্ছার ভিতরে,
আমরা সবাই নেবো সেই মৃত্যুবরণের পূর্ণ অধিকার।
নগ্নতাই শেষ সত্য, যেহেতু সে—রাত্রির আগুন,
আমাদের শারীরিক উত্তাপে, তৃষ্ণায় সম্মিলিত ;
এবং অপাপবিদ্ধ অঙ্গ জুড়ে দিগ্বিজয়ী তারই সমারোহ।

বিপুল ধ্বংসের দিকে, দিগন্তের দিকে চলে যাই।

চারটি কবিতা

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

'O my luve's like a red, red rose !'

একটি ভীরু গোলাপ কেঁপে ওঠে
ভিজে রোদের শেষ রঙিন শিখায় :
রক্ত বুঝি ছিটিয়ে দিলে কেউ ;
ধূসর ছাই হাওয়ায় লুটোপুটি।

নিস্বনিত বিদ্যুতের রেখা
আকাশ ছিঁড়ে, তোলে অবুঝ ঢেউ—
রুপোর ঘাস কাঁপায় থরোথরো।

প্রবল, শাদা, তৃষ্ণা দিয়ে গড়া
দেয়াল ভেঙে ছিটিয়ে দেবে তারা—
এই পণেই ছদ্মবেশী সিঁড়ি
পেরিয়ে আসে মত্ত বাতাসেরা ;
কপাল ঠোকে বেতাল চীৎকারে
ভুল ঘরের পরদা-ঢাকা দ্বারে।

রানীর মত গোলাপ কেঁপে ওঠে ॥

তাহ'লে, দয়ার ছলে

সব-কিছু কেড়ে নিলো—অন্ধকার, ক্লান্ত অবসর,
গোলাপ, গানের সুর, বিস্মৃতির কবচকুণ্ডল।
তীক্ষ্ণ দাঁত কেটে বসে। বাচাল সমুদ্র উতরোল

যখন, ক্ষুধায় জ্ব'লে, রাশি-রাশি হাঙর মকর
ডুবে-যাওয়া নাবিকেরে ছিঁড়ে ফ্যালে প্রাচীন পুলকে।
তাহ'লে, দয়ার ছলে, শুধু এই নির্বাসন দিলে
যেখানে গোপন ঘরে, দিগন্তের দীপ নিবে গেলে
তৃষ্ণার প্রবল তাপে ঘুম জ্বলে লবণ গন্ধকে।

এ-কথা সবাই বলে, সার সত্য রূপান্তরণ।
কেননা অস্থির দিন, দূর মেঘ, হাওয়া নিরবধি
জোয়ার জাগিয়ে রাখে, চ'লে গেলে কখনো ফেরে না।
প্রতীক্ষা নিরস্ত তবু ; প্রতিধ্বনি করে না করুণা :
লৌকিক যুক্তির জাল অকস্মাৎ ছিঁড়ে ফেলে যদি
সমস্ত ভুবন জুড়ে বেজে ওঠে গাঢ় টেলিফোন ॥

আদি দ্বন্দ্ব

নকল দেয়ালগুলি ভেঙে পড়ে, মাটি সরে পায়ের তলায়,
কোনো কিছু ছিলো না নিজের ব'লে ; বাল্ময় শিখায়
যে-প্রদীপ জ্বলেছিলো, তাও নয়। আর তাই ফুরোনো তুফানে
কাঁপে সে বারংবার, বাসনার গূঢ় অন্তঃসার
জ্বালায়, উনুন যেন ; উন্মাদক ছন্দের নিস্বনে
স্পন্দন, রক্তের দোলা, ইন্দ্রিয়ের প্রার্থিত আঁধার
সনাতন প্রক্রিয়ায় বর্ণ, গন্ধ, স্পর্শের মন্থনে
ফিরে-ফিরে সাধে তারে, কোনোদিন অকূল পাথার
আলো হ'য়ে ওঠে যার পরিশ্রমী প্রবালের লালে।

অনেকে এতেই ভোলে। নিরুপায়, সে আরো, আড়ালে :
কারণ, ছায়ার তলে, কুটিল, গোপন, অলৌকিক

স্মৃতির হলুদ দাঁত ছেঁড়ে, চেরে নির্জীব বিকল
আশা, ভাবা, তৃষ্ণাকে। শুধু তাই এ-দ্বন্দ্ব মৌলিক,
আলো-হ'য়ে-বেজে-ওঠা দেবতার মতো অবিচল ॥

সারা রাত তুমি

সারা রাত তুমি জানালায় টোকা দিলে,
কেঁপে-কেঁপে গেলো বোকা ছিটকিনিগুলি—
বৃষ্টি নামবে এখনি সংগোপনে!
—একদিন তুমি সব-কিছু নিয়েছিলে।

গোলাপ? তাকেও তুমি নিয়েছিলে তুলে।
পুনর্জাগর রাত্রির ভাঁজ খুলে
গন্ধ ছিটিয়ে মর্মরে, নিস্বনে
তাই বাজে হাওয়া, কাঁটা, ক্ষুধা, ডালপালা।

চড়ুয়ের মতো ব্যস্ত, ঝাপসা হাওয়া
পরদা কাঁপায়, বাগান দুলিয়ে দিয়ে
বৃষ্টি ছিটোয় লাজুক অন্ধকারে।
বেদের বাঁশির সুরে শিউরোয় ছায়া,
স্মৃতি জেগে ওঠে গন্ধের বিস্ময়ে,
বাঁধ ভেঙে গেলো বন্যার তোলপাড়ে,
জ্ব'লে ওঠে শিখা : মত্ত লাল গোলাপ ॥

পূর্ণিমা

নবনীতা দেব

দেখেছি গঙ্গায় আমি ব্যর্থ এক চাঁদ ডুবে যেতে।
যদিও বজরা ভ'রে প্রেমিকের কল্লোল স্বনিত,
তারাদের নাভিশ্বাস, সকালের আলোর গুঞ্জন,
সব ধ্বনি গ্রাস ক'রে চাঁদ শুধু শব্দময় হ'লো।

সারা রাত্রি সারা রাত আকাশের বিলোল প্রাসাদে
স্বপ্নচারী শুভ্র চাঁদ সময়ের সংগীত শুনেছে;
তারপর তমোহীন স্বপ্নহীন পরিচ্ছন্ন ভোরে
অকস্মাৎ আত্মদ্রষ্টা বীতস্পৃহ সন্ন্যাসীর মতো
অনুদ্বিগ্ন পূর্ণচাঁদ শূন্য হাতে নেমে গেলো জলে।

শার্ল্ বোদলেয়ার ও আধুনিক কবিতা

'প্রথম দ্রষ্টা তিনি, কবিদের রাজা, এক স ত্য দে ব তা।' কথাগুলো লিখেছিলেন, শতবর্ষের ব্যবধানে কোনো পুস্তকপীড়িত প্রৌঢ় পণ্ডিত নন, তাঁর মৃত্যুর মাত্র চার বছর পরে এক অজাতশ্মশ্রু যুবক, তাঁরই অব্যবহিত পরবর্তী এক কবি, তাঁর প্রথম সন্তানগণের অন্যতম। আর যেহেতু একজন কবির বিষয়ে অন্য এক কবির মন্তব্য, অত্যুক্তি হ'লেও, ভ্রান্ত হ'লেও, মূল্যবান (কেননা কেবল কবিরাই পারেন সংক্রামকভাবে সাড়া দিতে), তাই আমি এই চিরচেনা উদ্ধৃতি দিয়েই আমার এই বহুবিলম্বিত প্রবন্ধ আরম্ভ করছি। যে-পত্রে এই কথাগুলি গ্রথিত আছে তা ছত্রে-ছত্রে বোদলেয়ারে ভারাক্রান্ত; দু-দিন আগে অন্য এক ব্যক্তিকে লেখা দোসর-পত্রটিও তা-ই; আমরা অনুভব করি যে বোদলেয়ারের চিন্ময় সত্তা, হেমন্তের ঝোড়ো হাওয়ার মতো, ব'য়ে চলেছে এই যৌবনকুঞ্জের উপর দিয়ে—কুঁড়ি ঝরিয়ে, বীজ ছড়িয়ে, ফুল ঝরিয়ে, বীজ ছড়িয়ে, মরা পাতার মতো মরা ভাবনাগুলিকে উড়িয়ে দিয়ে কয়েকটি অকালপক্ব রক্তিম ফল ফলিয়ে তুলছে। 'অদৃশ্যকে দেখতে হবে, অশ্রুতকে শুনতে হবে,' 'ইন্দ্রিয়সমূহের বিপুল ও সচেতন বিপর্যয়সাধনের দ্বারা পৌঁছতে হবে অজানায়,' 'জানতে হবে প্রেমের, দুঃখের, উন্মাদনার সবগুলি প্রকরণ,' 'খুঁজতে হবে নিজেকে, সব গরল আত্মসাৎ ক'রে নিতে হবে,' 'পেতে হবে অকথ্য যন্ত্রণা, অলৌকিক শক্তি, হ'তে হবে মহারোগী, মহাদুর্জন, পরম নারকীয়, জ্ঞানীর শিরোমণি। আর এমনি ক'রে অজানায় পৌঁছনো!'—আবার বোদলেয়ারীয় জগতে প্রবেশ করছি আমরা, পান করছি 'ফ্ল্যর দ্যু মাল'-এর সারাৎসার; আমাদের মনে প'ড়ে যাচ্ছে 'প্রতিসাম্য', 'ভ্রমণ' ও 'সিথেরায় যাত্রা', মদ ও মৃত্যুর কবিতাগুচ্ছ; প্রতিধ্বনিত হচ্ছে গদ্যকবিতা ও 'অন্তরঙ্গ ডায়েরি'র সেই সব অংশ (আর কোন অংশই বা তেমন নয়), যেখানে কবি সাহস করেছিলেন আপন আত্মার অনাবরণ উন্মোচনে। আত্মসন্ধান, আত্মপরীক্ষা; দুঃখ, রোগ, মত্ততা; ইন্দ্রিয়সমূহের অতীন্দ্রিয় বিনিময়: সূত্রগুলি সবই বোদলেয়ারের, কিন্তু কণ্ঠস্বর

নতুন, বাচনভঙ্গি নতুন, তাঁর 'শৌখিনতা' বা কৌলীন্য বা ক্লাসিক শিল্পচেতনার পরিবর্তে এখানে আছে এক সদ্য-জেগে-ওঠা সহজ আত্মচেতনা, যার তীব্র চাপে সারা অতীত, রাসীন ও ভিক্তর উগো সুদ্ধ, বন্যার মুখে মস্ত বুড়ো গাছের মতো ধ্ব'সে পড়ছে।

তখন ১৮৭১; ছয় বছর আগে, যখন পর্যন্ত বোদলেয়ার অন্তত শারীরিক অর্থে জীবিত, তেইশ বছরের যুবক মালার্মে একটি গদ্যকবিতায় প্রথম প্রণতি জানিয়েছেন তাঁর গুরুকে, আর প্রায় সমবয়সী ভেরলেন ঘোষণা করেছেন যে 'ফ্ল্যর দ্যু মাল'-এর রচনারীতি 'অলৌকিক শুদ্ধতাসম্পন্ন'। যে-খ্যাতিকে, আঁদ্রে জীদের ভাষায়, তাঁর জীবৎকাল এক পবিত্র স্তব্ধতা দিয়ে ঢেকে রেখেছিলো, তার প্রথম মন্ত্রোচ্চারণ ইতিমধ্যেই শুরু হ'য়ে গেছে। ইতিমধ্যেই ভাবীকাল ছিনিয়ে নিয়েছে সেই নামটিকে, সহজীবীরা যার বানান পর্যন্ত নির্ভুল লেখার প্রয়োজন দ্যাখেননি। পরবর্তী দুই দশকের মধ্যে তাঁকে আবিষ্কার করলেন জে.-কে. উইসমাঁ, ল্যমেৎর, লাফর্গ; আর লণ্ডনে, রাইমার্স ক্লাবের পত্তনের সময়, ইয়েটস অনুভব করলেন যে, বোদলেয়ার ও ভেরলেনের অনুসরণে, 'যা-কিছু কবিতা নয়, তা থেকে মুক্তি দিতে হবে কবিতাকে।' ইয়েটস ফরাশি জানতেন না; তাঁকে আর্থার সাইমন্স প'ড়ে শোনাতেন ফরাশি কবিতা, আর তার স্বকৃত অনুবাদ; আর এমনি ক'রেই, বোদলেয়ারের প্রবর্তিত ধারা থেকে, ইয়েটস তাঁর নিজের কবিতার পক্ষে জরুরি দু-একটা ব্যাপার শিখে নিয়েছিলেন্। ফ্রান্সের অভিঘাতে ইংলণ্ডে আরো প্রত্যক্ষভাবে যা ঘটেছিলো, সেই 'নব্বুই'-যুগের পীতাভ পাংশুতা বিষয়ে এখানে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই; কিন্তু সেই ব্যর্থতাও অন্তত পক্ষে নতুন একটি চেতনার সাক্ষ্য দিচ্ছে। কেননা সেটাই সেই সময়, যখন ইংরেজি ভাষার কোনো-কোনো লেখকের মনে প্রথম এই সত্যটি প্রথম উঁকি দেয় যে টেনিসন থেকে স্যুইনবার্ন পর্যন্ত কবিরা শুধু রোমান্টিকদের চর্বিতচর্বণ ক'রে গেছেন, যে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নতুন ও সপ্রাণ কবিতার জন্য তাকাতে হবে সেই দেশের দিকে, যে-দেশ রাষ্ট্রবিপ্লবের পারম্পর্যে ক্ষতবিক্ষত এবং ঔপনিবেশিক প্রতিযোগিতায়

বহু দূরে পেছিয়ে-থাকা। এ-কথাও স্মর্তব্য যে বিশ শতকের সন্ধিক্ষণে, যখন পর্যন্ত তিমিরলিপ্ত ইংলণ্ডের তটে দুই মার্কিন ত্রাতা এসে পৌছননি, তখনই ইয়েটস ধীরে-ধীরে ইংরেজি ভাষায় আধুনিক কবিতা সম্ভব ক'রে তুলছেন; আর প্রায় একই সময়ে এক কৃশতনু জর্মান ভাষার কবি প্যারিসে ব'সে রচনা করছেন 'মালটে লাউরিডজ ব্রিগ্‌গে' নামক গদ্যগ্রন্থ, যার কোনো-কোনো অংশ বোদলেয়ারের স্তবগান। আর তারপর থেকে পশ্চিমী কবিতায় এমন কিছু ঘটেনি, সত্যি যাতে এসে যায় এমন কিছু ঘটেনি, যার মধ্যে, কোনো-না-কোনো স্তরে বা সূত্রে, বোদলেয়ারের সংক্রাম আমরা দেখতে না পাই। আজকের দিনে কারোরই জানতে বাকি নেই যে তিনি শুধু প্রতীকিতার উৎসস্থল নন, সমগ্রভাবে আধুনিক কবিতার জনয়িতা। অনুভব না-ক'রে উপায় নেই পরবর্তী ফরাশি কবিতায় তাঁর অনুরণন, পরবর্তী পশ্চিমী কাব্যে তাঁর প্রত্যক্ষ বা দূরাগত, কখনো হয়তো অনেক ঘুরে-আসা, কিন্তু নির্ভুলভাবে তাঁরই চিত্তনির্যাস। এবং শুধু কবিতাই নয়, চিত্রকলাও তাঁর বাণে বিদ্ধ হয়েছে; তাঁর কবিতাকে ছবির ভাষায় সৃষ্টি ক'রে নিয়েছেন রদাঁ, রুয়ো ও মাতিসের মতো শিল্পীরা; এবং রদাঁ, তাঁর নিঃসঙ্গ ও অবজ্ঞাত যৌবনে, যে-দুই কবিকে ভেদ ক'রে ধীরে-ধীরে আপন পথটি দেখতে পান, তাঁরা দান্তে ও বোদলেয়ার। ফ্রান্সের প্রথম বিশ্বকবি তিনি, এত বড়ো বৈদেশিক বিস্তার তাঁর আগে অন্য কোনো ফরাশি কবির ঘটেনি। বহু ভাষায় অনুবাদ হয়েছে তাঁর, সাহিত্যিকেরা বংশপরম্পরায় তা ক'রে গেছেন, ইংরেজিতে এক-একটি কবিতার শতাধিক অনুবাদ পর্যন্ত হয়েছে। এই বাংলাদেশেও কোনো-এক লেখক, পঞ্চাশের প্রান্তে এসে, আয়ু ও স্বাস্থ্যের অনিশ্চয়তা জেনেও, তাঁর কবিতার অনুবাদে অনেক ঘণ্টা, সপ্তাহ ও মাস সানন্দে নিবেদন ক'রে দিলেন। আজ, তাঁর জগৎ-জোড়া প্রতিপত্তির দিনে, এই কথাটা মেনে নেয়া অত্যন্ত বেশি সহজ হ'য়ে গেছে যে তিনি 'প্রথম দ্রষ্টা, কবিদের রাজা, সত্য দেবতা।'

২

কিন্তু 'প্রথম' কেন? 'দ্রষ্টা'—সে তো কবির একটি সনাতন ও সাধারণ অভিধা; আত্মিক দৃষ্টি যাঁর নেই তিনি কি কবি হ'তে পারেন? পারেন না তা নয়; অনেকে, শুধু রচনার নৈপুণ্যের বলে, কবিখ্যাতি অর্জন করেছেন: ঈশপের ছন্দোবদ্ধ প্রকরণ লিখে লা ফঁতেন, সুবুদ্ধিকে আঁটো দ্বিপদীর চুড়িদার পরিয়ে আলেকজাণ্ডার পোপ। ঐতিহাসিকেরা, সরকারি সমালোচকেরা, এঁদেরও কবি ব'লে মানতে বাধ্য; কিন্তু যাঁরা নিজেরা দ্রষ্টা, অন্তত কবিতার বিষয়ে দ্রষ্টা, তাঁরা, র‍্যাঁবোর মতোই, এঁদের 'সমিল-পদ্যলেখক' বলেই জানেন। যাকে বলা হয় 'আলোকপ্রাপ্তি', সেই প্রায় অমানুষিক যুক্তিবাদের গুমোট ভেঙে যখন রোমান্টিকতার ঝড় উঠলো, তখনও, হৃদয়ের স্বাধীনতালাভ সত্ত্বেও, কবিতা ঠিক স্বপ্রতিষ্ঠ হ'তে পারলে না, তার দেহে লগ্ন হ'য়ে রইলো আঠারো শতকের অনেক উচ্ছিষ্ট: জ্ঞানের ভার, উপদেশের ভার, হিতৈষণার জঞ্জাল। প্রভেদ এই যে 'আলোকপ্রাপ্ত' কবিরা মাষ্টারি ধরনেই মাষ্টারি করতেন, তাঁদের কবিতা ছিলো শিক্ষিত সালঁর সংলাপ, শ্রোতাদের বিষয়ে সচেতন; আর রোমান্টিকেরা উপদেশ দিতেন মন্ময় ভঙ্গিতে, প্রবক্তার ধরনে, আর তাঁদের কবিতা ছিলো রাখাল, সন্ন্যাসী বা পর্যটকের স্বগতোক্তি। কবিতাকে এবার স্বগতোক্তি হ'তে হবে—সামাজিক আলাপ আর নয়—এই সত্যটি তাঁরা বুঝেছিলেন, কিন্তু 'স্ব' বলতে ঠিক কী বোঝায় তার ধারণায় ভ্রান্তি ছিলো তাঁদের। বলা যেতে পারে যে অকবি ও কবির মধ্যে যা তফাৎ, সেই তফাৎই পোপের সঙ্গে শেলির, এবং লা ফঁতেনের সঙ্গে ভিক্তর উগোর; আমরা মানতে বাধ্য যে রোমান্টিকেরা দ্রষ্টার গুণে দরিদ্র নন, তাঁরাও চেয়েছেন অদৃশ্যকে দেখতে এবং অশ্রুতকে শুনতে; কিন্তু যেহেতু তাঁরা কবিকে ভেবেছিলেন জগতের হিতসাধক, 'অস্বীকৃত বিধানকর্তা', আর কবিতাকে ভেবেছিলেন আবেগের প্রবহণমাত্র, তাই, যা কবিতা নয় এমন অনেক পদার্থের চাপে তাঁদের দৃষ্টিকণিকা শুদ্ধভাবে প্রতিভাত হ'তে পারেনি। জগৎটাকে বদলানো যে কবির কাজ নয়, এই ধারণা গোতিয়ে-র ছিলো, কিন্তু তাঁর নিজের কবিতা মনোমুগ্ধকর

পদ্যের সুর ছাড়িয়ে বেশি উপরে উঠতে পারেনি ব'লে, তাঁকেও পরিহার না-ক'রে তরুণ র‍্যাঁবোর উপায় ছিলো না। উপায় ছিলো না, উগোর উচ্ছ্বাস, লেকঁৎ দ্য লিল্-এর কারুকার্য ও গোতিয়েরের এলাচগন্ধী সন্দেশের মতো উপভোগ্যতার পর, 'ফ্লর দ্যু মাল'-এর কবিকে প্রথম দ্রষ্টা ব'লে ঘোষণা না-ক'রে। র‍্যাঁবো যা বলতে চেয়েছিলেন (প্রায় তাঁর নিজেরই ভাষায় বলছি) তা এই যে রোমান্টিকেরা যা জানতেন না তা বোদলেয়ার জেনেছিলেন—যে কবি বক্তা অথবা প্রবক্তা নন, দ্রষ্টা, অর্থাৎ বিশ্বজগতে লুক্কায়িত সম্বন্ধসমূহের আবিষ্কারক, যে তাঁর স্বকীয় ও অনন্য দৃষ্টির কাছে একান্ত বিনীতভাবে আত্মসমর্পণ করাই তাঁর স্বধর্ম। 'বাগ্মিতার শিরশ্ছেদ করো,' 'আত্মার একটি অবস্থার নামই কবিতা'—ভেরলেন ও মালার্মের পক্ষে এ-রকম কথা বলা সম্ভব হ'তো না যদি না তাঁরা বোদলেয়ারের পরে জন্মাতেন।

রোমান্টিকতার নিন্দা করা আমার অভিপ্রায় নয়, বরং আমি দুর্মরভাবে রোমান্টিকতার পক্ষপাতী। 'রোমান্টিক' বলতে আমি বুঝি—শুধু একটি ঐতিহাসিক আন্দোলন নয়, মানুষের একটি মৌলিক, স্থায়ী ও অবিচ্ছেদ্য চিত্তবৃত্তি। তারই নাম রোমান্টিকতা, যা ব্যক্তি-মানুষকে মুক্তি দান করে, স্বীকার ক'রে নেয়—শুধু ইস্তি-করা এটিকেট-মানা সামাজিক জীবটিকে নয়, নির্ভয়ে মানুষের অবিকল ও সমগ্র ব্যক্তিত্বকে; তার মধ্যে যা-কিছু অযৌক্তিক বা যুক্তির অতীত, অনিশ্চিত, অবৈধ, অন্ধকার ও রহস্যময়, যা-কিছু গোপন, পাপোন্মুখ ও অকথ্য, যা-কিছু গোপন, ঐশ্বরিক ও অনির্বচনীয়—সেই বিশাল ও স্বতোবিরোধময় বিস্ময়ের সামনে, সন্দেহ নেই, মুখোমুখি দাঁড়াবার শক্তির নামই রোমান্টিকতা। এই শক্তি, যা কোনো যুগেই একেবারে রুদ্ধ হ'য়ে থাকেনি কিন্তু কোনো-কোনো যুগে—যেমন শেক্সপীয়রের ইংলণ্ডে—যার বিস্ফোরণ গগনস্পর্শী হয়েছে, তা রুসোর পর থেকে সর্বসাহিত্যের সাধারণ লক্ষণ হ'য়ে উঠলো। আরম্ভ হ'লো ঐতিহাসিক রোমান্টিকতা, বিশ্বসাহিত্যের বিরাট এক ঘটনা, যা মানুষের চিন্তার পরতে-পরতে এমনভাবে প্রবেশ করেছে যে আমরা নির্ভয়ে বলতে পারি যে সমগ্র আধুনিক সাহিত্যই রোমান্টিক; এলিয়ট অথবা

ভালেরীর মতো যাঁরা প্রকরণে বা মতবাদে ক্লাসিকধর্মী তাঁদেরও ভাষাব্যবহার পরীক্ষা করলেই রোমান্টিক অন্বয় বেরিয়ে আসে। কিন্তু উনিশ শতকের প্রথমাংশে রোমান্টিকতার চেহারা ছিলো বন্যার মতো; যেমন তা অনেক বাঁধ ভেঙে দিয়েছিলো তেমনি টেনে তুলেছিলো বহু আবর্জনা; মুছে দিয়েছিলো, উৎসাহের প্রথম নেশায়, অনেক প্রয়োজনীয়-ভেদজ্ঞান, যাকে ভেরলেন বলেছিলেন 'নেহাৎ সাহিত্য', তার সঙ্গে কবিতার পার্থক্যটিকে স্পষ্ট হ'তে দেয়নি। বাকি ছিলো বোদলেয়ারের জন্য এই কাজ—রোমান্টিকতার পরিশোধন ও পরিশীলন; তার সব অবান্তরতা বর্জন ক'রে কবিতাকেই সর্বস্ব ক'রে তুললেন—তিনিই প্রথম। রোমান্টিকদের কবিতা ছিলো কবিত্বমণ্ডিত রচনা, যার কোনো-কোনো পংক্তি বা অংশ কবিতা হ'লেও, অনেক অংশই কবিতা নয়; কিন্তু বোদলেয়ার কবিতা বলতে বুঝলেন এমন রচনা, যার মধ্যে কবিতা ছাড়া কিছুই নেই, যার প্রতিটি পংক্তি ও শব্দ, মিল ও অনুপ্রাস, রসের দ্বারা সমগ্র সুপক্ব ফলটির মতো, কবিতার দ্বারা আক্রান্ত। তাই 'যা-কিছু কবিতা নয় তা থেকে কবিতার মুক্তি'র প্রথম দলিল 'ফ্লর দ্যু মাল', আধুনিক কবিতার জন্মক্ষণ ১৮৫৭।

আমি ভুলিনি যে পূর্ববর্তী অনেক কবিতে আধুনিকতার পূর্বাভাস আছে, তার কোনো-কোনো লক্ষণে তাঁরা সমৃদ্ধ। ইংলণ্ডে ব্লেক, কীটস, কোলরিজ; জর্মানিতে নোভালিস ও হোল্ডার্লিন; ফ্রান্সে নেরভাল ও গোতিয়ে, আমেরিকায় পো এবং হুইটম্যান—এঁদের আদর্শ বা পরামর্শকে, কোনো-না-কোনো দিক থেকে, আধুনিক কবিতার প্রকরণে অথবা মর্মস্থলে ফলপ্রসূ হ'তে দেখেছি আমরা। কিন্তু এঁদের পাশে বোদলেয়ারকে যদি রাখি, আর বোদলেয়ারের কবিতার পাশে তাঁর শিল্প-সমালোচনাকে, তাহ'লে আমরা উপলব্ধি করি যে, বিচ্ছিন্ন ও কিছুটা আকস্মিকভাবে, কবিতার যে-সব নতুন সূত্র এঁরা খুঁজে পেয়েছিলেন, সেগুলিকে যেন এক আশ্চর্য শুভক্ষণে, বোদলেয়ার বেঁধে দিলেন এক অনন্য গুচ্ছে, এমনভাবে সমন্বিত ক'রে দিলেন যাতে তা ভাবীকালের ব্যবহারযোগ্য হ'য়ে উঠলো। এঁরা কী করছেন, এঁদের কৃতির ফলাফল

বা অজ্ঞাতনা কী, সে-বিষয়ে এঁদের চেতনা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে, ক্ষীণ অথবা খণ্ডিত; কিন্তু বোদলেয়ারের চৈতন্য তাঁর নিজের বিষয়ে ও কবিতার বিষয়ে পূর্ণতাপে নিরন্তর ভাস্বর। কোলরিজ কবিতাকে ত্যাগ করলেন, ব্লেক চাইলেন নতুন ধর্মের প্রবর্তক হ'তে, হুইটম্যান নিজেকে ধ'রে নিলেন বিশ্বমৈত্রীর দূতপ্রধান; অগ্রজদের মধ্যে একমাত্র যিনি সন্দেহ করেছিলেন—যদিও কাজে তা ক'রে উঠতে পারেননি—যে সবচেয়ে জরুরি কথা হ'লো কবিতাকে নতুন ক'রে তোলা, তিনি অ্যালান পো। আমরা জানি এই মার্কিন কবির বিষয়ে বোদলেয়ারের উৎসাহ ছিলো সীমাহীন, এবং পূর্বোল্লিখিত কবিদের মধ্যে যাঁরা বিদেশী তাঁদের আর কারো সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটেছিলো কিনা, তা আমরা জানি না। ব্লেক অথবা কোলরিজকে জানলে, মনে হ'তে পারে, তিনি পো-র দ্বারা অত দূর পর্যন্ত মুগ্ধ হতেন না; এবং এমন মতও আমরা শুনেছি যে এই মুগ্ধতার গূঢ় কারণ তাঁর (ও পরে মালার্মের) ইংরেজি ভাষায় যথোচিত জ্ঞানের অভাব। সত্য, বোদলেয়ার পো-র রচনায় অংশত এমন কিছু পড়েছিলেন যা তাতে নেই; কিন্তু তার জন্য দায়ী কি ইংরেজি ভাষায় তাঁর অনভিজ্ঞতা, না কি তাঁর স্পর্শময় কবি-মন, যা অন্য এক সবর্ণ কবিকে নিজের মধ্যে শোষণ ক'রে নিতে উৎসুক? ভাষা এক হ'লেও, একজন কবি অন্য এক কবিকে দিয়ে নিজের কথাই বলিয়ে নিতে চান, ভাবনার কোনো স্তরে মিল দেখলে—বৈসাদৃশ্যগুলি ভুলে গিয়ে—তাঁকে কল্পনা ক'রে নেন নিজেরই বিকল্প ব'লে। আর পো-র বিষয়ে তা-ই করেছিলেন বোদলেয়ার। পো-র মধ্যে তিনি দেখেছিলেন 'সেই আধুনিক কবিকে, যিনি সর্বমানবের হ'য়ে দুঃখ পান'; অর্থাৎ, পো-র মধ্যে নিজেকেই দেখেছিলেন। স্মর্তব্য, তাঁর মনে প্রথম প্রবল নাড়া দিয়েছিলো অ্যালান পো-র দুঃখময় জীবন, আর তিনি অনুবাদ করেছিলেন প্রধানত পো-র গল্পকাহিনী, যার রহস্যময় ইন্দ্রিয়বিলাসে বোদলেয়ারের একাত্মবোধ অনিবার্য ছিলো। কবি হিশেবে দু-জনের মধ্যে তুলনার প্রস্তাব হাস্যকর; অনর্থক, বোদলেয়ারের কবিতায়

পো-র 'প্রভাব' সন্ধান করা*, কেননা পো-র সঙ্গে পরিচয়ের পূর্বেই তিনি অধিকাংশ 'ফ্ল্যর দ্যু মাল' রচনা শেষ করেছিলেন। 'কবিতার মূলসূত্র' প্রবন্ধে পো দু-একটি অভিনব ও আমাদের পক্ষে আদরণীয় কথা বলেছিলেন, কিন্তু তাতেও এমন কিছু নেই যা বোদলেয়ার স্বাধীনভাবে নিজেই আবিষ্কার করেননি। কবিতা দীর্ঘ হ'লে যে আর কবিতা থাকে না—যে-কথা কোলরিজও প্রকারান্তরে বলেছিলেন—তা বোঝার জন্য পো-পঠনের প্রয়োজন ছিলো না তাঁর; 'ফ্ল্যর দ্যু মাল'-এ সনেটের সংখ্যাই তার প্রমাণ দিচ্ছে।

কাব্যকলায় বোদলেয়ারের মহৎ কীর্তি এই যে ক্লাসিক ও রোমান্টিকের চিরাচরিত দ্বৈতকে তিনি লুপ্ত ক'রে দেন। প্রথম কবি তিনি, যাঁকে প'ড়ে আমরা উপলব্ধি করি যে ক্লাসিক ও রোমান্টিকের ধারণা দুটি অমোঘভাবে পরস্পরবিরোধী নয়, বরং পরস্পরের জন্য তৃষিত, এবং একই রচনার মধ্যে দুই ধারার সংশ্লেষ ঘটলে তবেই কবিতার তীব্রতম মুহূর্তটিকে পাওয়া যায়। ছন্দোবন্ধের দার্ঢ্য, মিলের বিস্ময় ও পর্যাপ্তি, নিয়মনিষ্ঠ সনেটের প্রতি অমর আসক্তি তাঁর—এই সবই নির্ভুলভাবে ক্লাসিক লক্ষণ, কিন্তু এই কঠিন রূপকল্পের মধ্যে তিনি সঞ্চারিত করেছিলেন এক দ্বন্দ্বপীড়িত আত্মভেদী চৈতন্যকে—যা রোমান্টিকতার সারাৎসার। আছেন রোমান্টিক ও ক্লাসিক গ্যেটে, রোমান্টিক ও ক্লাসিক রবীন্দ্রনাথ; দুয়ের পার্থক্য—অন্তত অস্পষ্টভাবে—আমরা অনুভব করতে পারি; এঁদের প্রত্যেক রচনায় সম্পূর্ণভাবে কবিদের পাই না। কিন্তু বোদলেয়ারের প্রায় প্রতিটি কবিতা—এবং অনেক গদ্যরচনাও—তাঁর পূর্ণ সত্তাকে ধারণ ক'রে আছে, আর সেইজন্যই তারা এমন প্রাণতপ্ত ও স্পন্দনময়;

* প্রসঙ্গত উল্লেখ না-ক'রে পারছি না যে অ্যালান পো-র কবিতা থেকে প্রত্যক্ষভাবে আহরণ করেছেন একজন আধুনিক বাঙালি কবি: 'বনলতা সেন' ও 'Helen, thy beauty is to me' এ-দুটি কবিতার সাদৃশ্য স্বয়ংপ্রকাশ। 'চুল', 'মুখ', 'সমুদ্র' ও 'ভ্রাম্যমাণ', এ-সবই আক্ষরিক অর্থে অ্যালান পো-র, কিন্তু, যেমন 'হায়, চিল' কবিতায়, তেমনি এ-ক্ষেত্রেও জীবনানন্দ তাঁর উত্তমর্ণকে বহুদূরে অতিক্রম ক'রে গেছেন। জীবনানন্দর প্রথম জিৎ তাঁর নায়িকার স্থানীয়তা ও সমকালীনতায় (ধ্রুপদী সৌন্দর্য পৌরাণিক হেলেনে অপ্রত্যাশিত নয়), এবং দ্বিতীয় ও আরো বড়ো জিৎ উভয় স্তবকের শেষ পংক্তি দুটির আবেগময় আন্দোলনে, যার তুলনায় পো-র শেষ স্তবক বর্ণলিপ্ত পুত্তলির মতো নিষ্প্রাণ।

যিনি প্রথম বার 'ফ্লার দ্যু মাল' পড়ছেন তিনি প্রায় যে-কোনো পৃষ্ঠা খুলেই উত্তীর্ণ হবেন এক অজ্ঞাতপূর্ব, রোমাঞ্চকর যাত্রাপথে। 'আমি বেরিয়েছি অসীমের সন্ধানে—একা আমি, গুরু নেই, নেই কাণ্ডারী বা উপদেষ্টা, পাল পর্যন্ত নেই আমার তরীতে'—এই হ'লো রোমান্টিকতার মর্মকথা; কিন্তু এর উচ্চারণ 'ফ্লার দ্যু মাল'-এ যেমন শুদ্ধ, সংহত ও নির্ভীক, পূর্ববর্তী চিহ্নিত রোমান্টিকদের মধ্যে একজনেরও সে-রকম নয়।

অথচ, নানা দিক থেকে, রোমান্টিকদের সঙ্গে দুস্তর তাঁর ব্যবধান। রোমান্টিকেরা ভালোবেসেছেন গ্রাম ও গ্রাম্যতাকে; তাঁর ছন্দে প্রথম ধরা পড়লো, সব ক্লেদ ও সন্তাপ নিয়ে, আধুনিক নগরজীবনের চঞ্চলতা। প্রকৃতির, নগ্নতার, স্বাভাবিকের পূজক ছিলেন রোমান্টিকেরা, আর বোদলেয়ার বন্দনা করেছেন প্রসাধনের, অলংকারের, কৃত্রিমের, অর্থাৎ শিল্পের, অর্থাৎ চেতনার—তাঁর বিখ্যাত ড্যাণ্ডীজম-এর অর্থই এই। তরুণ রবীন্দ্রনাথ যেখানে বলেন, 'পরো শুধু সৌন্দর্যের নগ্ন আবরণ', সেখানে তরুণ বোদলেয়ারের নায়ক, বহু-বাঞ্ছিতা প্রণয়িণীকে প্রথম বার বিবসনা দেখে, সরোষে প্রতিবাদ করে। রোমান্টিকেরা স্বাভাবিককেই সুন্দর ব'লে—এমনকি ভালো ব'লে—জেনেছেন, কিন্তু বোদলেয়ারের কাছে তা-ই শুধু শ্রদ্ধেয়, যা রচিত, চৈতন্যের দ্বারা শোধিত, চেষ্টা ও সাধনার দ্বারা প্রাপণীয়। যে-কামকূপ নারীকে ভিক্তর উগো মহিমান্বিত করেছেন 'স্বর্গীয় ভাস্করের আঙুলে গড়া আদর্শ কর্দম' ব'লে, তাকে বোদলেয়ার বলেছেন 'প্রোজ্জল ক্লেদ', 'স্বা ভা বি ক ব'লেই ঘৃণ্য'। 'নারী চায় ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল, যৌন কামনার তৃপ্তি—অতএব সে ড্যাণ্ডীর ঠিক বিপরীত' —তাঁর এই বাক্যটি আঠারো-শতকী যুক্তিবাদের যেমন বিরোধী, তাঁর অগ্রজ রোমান্টিকদেরও তেমনি প্রতিকূল। দুই যুগেরই উপাস্য ছিলো প্রকৃতি; কিন্তু যুক্তিবাদীরা প্রকৃতি বলতে বুঝতেন স্বভাবী ও সংগতকে, আর রোমান্টিকেরা স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্তকে। আর উদ্ধৃত উক্তিটির অর্থ এই যে মানুষের মধ্যে সেই অংশই তার মনুষ্যত্বের পরিচয় দেয়, যা স্বভাবের বিরোধী। যে-ভাষা অধিকাংশ মানুষের পক্ষে সংবাদজ্ঞাপনের নির্বিশেষ বাহনমাত্র, কেউ-কেউ,

স্বভাবের বিরোধিতা করে, তাকে রূপান্তরিত করেন ছন্দোবদ্ধ ও চরিত্রবান কবিতায়। যে-সব প্রাকৃত ক্ষুধার তৃপ্তিসাধন অধিকাংশ মানুষের নিত্যকর্ম, কেউ-কেউ, কখনো-কখনো, সেগুলিকে অতিক্রম ক'রে উপবাসী থাকেন বা ব্রহ্মচারী হন। শুধু কবিতা বা সন্ন্যাসই নয়; প্রকৃত পাপও চৈতন্যের ফল; তাই পাপকে বোদলেয়ার—ক্ষমা করেননি, কিন্তু শ্রদ্ধা করেছেন; তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিলো, হুইটম্যানের মতো, পাপবোধহীন পশুদের প্রতি অনুরাগ। তাঁর কাব্যে নারী যেমন জৈবতার, পশু তেমনি মনোহীনতার প্রতীক; একমাত্র যে-পশুকে তিনি ভালোবেসেছিলেন সে গৃহপালিত মার্জার, যার দৃষ্টির বহুলাঙ্গ দ্যুতিকে প্রায় একটি শিল্পকর্ম ব'লে ভুল হ'তে পারে। রোমান্টিক গ্যেটের সব-পেয়েছির দেশ সেখানে, যেখানে নীলিমার নিচে, কালো পল্লবের ফাঁকে-ফাঁকে, জলজল করে সোনালি রঙের কমলালেবু; রবীন্দ্রনাথের, যেখানে প্রণয়ীযুগল আধো-আলোয় ঘুরে বেড়ায় আর 'পাখি তাদের শোনায় গীতি, নদী শোনায় গাথা'; কিন্তু বোদলেয়ার তাঁর প্রিয়াকে নিয়ে যেতে চান এক দর্পণশোভিত সুপ্রসাধিত ওলন্দাজ অন্তঃপুরে, যার জানলা দিয়ে দেখা যাবে—প্রকৃতির দান তরুপল্লব নয়, বুদ্ধির সৃষ্টি অর্ণবপোত। ওঅর্ডস্বার্থ ভজনা করেছেন 'মূক ও নিশ্চেতন বস্তু'কে, রবীন্দ্রনাথ গাছ হ'য়ে জন্মাতে চেয়েছেন; আর বোদলেয়ার ইচ্ছা করেছেন সব উদ্ভিদের উচ্ছেদ, শিল্পিত ধাতু ও প্রস্তরময় এক প্যারিস। একটি পাখির পালক বা ফুলের পাপড়িকে রোমাণ্টিকরা যেমন ক'রে বর্ণনা করেন, তেমনি সপ্রেম মনোযোগ বোদলেয়ার অর্পণ করেন আসবাবপত্রে ও নারীর বেশবাসে; পর্দার বর্ণ ও ঘনতা, রেশম ও সাটিনের স্পর্শ, ধাতুর দীপ্তি, রত্নের রশ্মিময়তা—প্রথম তাঁর কাব্যেই মানুষের আত্মা এ-সবের মধ্যে প্রবেশ করেছিলো। রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যের ধারণাকে মূর্ত করেছিলেন উর্বশীতে, যার নাচের ছন্দে পুরুষের রক্ত 'আত্মহারা' হ'য়ে সাড়া দেয়, আর বোদলেয়ারের সৌন্দর্য এক পাষাণপ্রতিমা, স্ফিংক্সের মতো স্থির ও দুর্বোধ, যে বলে: 'পাছে রেখা স্রস্ত হয়, ঘৃণা করি সব চঞ্চলতা', আর যাকে দেখে কবিরা উদ্বুদ্ধ হন, রতিবিলাসে নয়, 'পাঠে ও কঠিন

চিন্তায়'। 'ইন্দ্রিয়ে যখন আগুন ধরে তখন সৌন্দর্যকে বাহুবন্ধে বেঁধে ভগবানকেই আলিঙ্গন করি আমরা'—এই হ'লো যৌন বৃত্তি বিষয়ে উগোর ধারণা; কিন্তু বোদলেয়ার বলেন যে 'পাপকর্মের চৈতন্যই মহত্তম রতিসুখসার'। আর সর্বোপরি, রোমান্টিকেরা যেখানে কবিকে ভেবেছিলেন আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনের অন্যতম স্থপতি ব'লে, সেখানে বোদলেয়ার কবিকে বললেন পরম ড্যাণ্ডী, যে দর্পণের সামনে দিনযাপন করে ও নিদ্রা যায়। দর্পণের সামনে : তার মানে, আত্মদর্শন ও আত্মপরীক্ষাই কবিকৃত্য; কবির চৈতন্য এমন ক্ষমাহীন যে ঘুমিয়েও তিনি আত্মবিস্মৃত হন না। যে-মধ্য-উনিশ শতক ইংলণ্ডে উপযোগবাদে ধূসর, সেই সময়ে বোদলেয়ার ঘোষণা করেন যে কবি কোনো 'কাজে লাগেন' না, যে বায়রনি বিদ্রোহের দিন গত হয়েছে, পূর্ণ হয়েছে সমাজের সঙ্গে কবির বিচ্ছেদ; প্রতিবাদ করলেও প্রতিবাদের পাত্রকে স্বীকার ক'রে নিতে হয়, একমাত্র যা সহনীয় ও সম্ভব তা উপেক্ষা ও স্বেচ্ছাবৃত নির্বাসন। 'ফ্লার দ্যু মাল' ও 'প্যারিস-স্প্লীন' ভ'রে তাদেরই দেখা পাই আমরা, যারা নির্বাসিত ও নির্যাতিত : বন্দী পশু, বৃদ্ধ ক্লাউন, উন্মাদ নারী, ভিনদেশী বেশ্যা, রোগী, মাতাল ও নাস্তিমানেরা—আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না যে এদের সকলের সঙ্গেই কবির একাত্মবোধ নিবিড়, এবং এরা, এদের বাস্তব আয়তন অক্ষুণ্ণ রেখেও, 'কবি' নামক ধারণাটিরই চিত্রকল্পের কাজ করছে। কবির বিষয়ে যে-বিশেষণটি বোদলেয়ার বার বার ব্যবহার করেছেন তা 'পুণ্যবান' (pious); কিন্তু তাঁর পুণ্য তাঁর কর্মে নয়, চৈতন্যে; সেই বিবেকময়, চৈতন্যময় পুরুষ তিনি, যিনি, ডস্টয়েভস্কির প্রিন্স মিশকিনের মতো, জাগতিক ব্যাপারে একেবারেই অক্ষম, অব্যবহিত পারিপার্শ্বিকেও তিলতম পরিবর্তন যিনি আনতে পারেন না, অথচ নিজের মধ্যে নিখিলবেদনাকে ধারণ করেন। তাঁর কাজ জগৎকে ব[illegible]লানো নয়, জগৎকে অনুভব করা। এবং সেই জ্ঞানের ও অনুভূতির শক্তিতেই তাঁর মহিমা।*

* এই অনুচ্ছেদে আমি পাশ্চাত্ত্য রোমান্টিকদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথেরও নাম করেছি, কেননা যদিও তিনি বোদলেয়ারের চল্লিশ বছর পরে জন্মেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক স্থান ওঅর্ডস্বার্থ, উগো, শেলি প্রভৃতি য়োরোপীয় প্রথম-রোমান্টিকদেরই সঙ্গে।

শুধু রোমান্টিক ও ক্লাসিকের ধারণাকে নয়, আরো কোনো-কোনো বিপরীতকে তিনি মিলিয়েছিলেন : কঠিন ছন্দোবন্ধনের সঙ্গে ভাষার নির্ভার মৌখিকতা, এবং মৌখিকতার সঙ্গে অভিজাত শুদ্ধতাবোধ—যাকে লাফর্গ আখ্যাত করেন একাধারে 'ইয়াঙ্কি' ও 'হিন্দু' ব'লে। মিল ও স্তবকবিন্যাসের নৈপুণ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ রোমান্টিকদের সমকক্ষ; কিন্তু আপন ক্ষমতায় মোহিত হ'য়ে স্তবকসংখ্যা তিনি এমনভাবে বাড়িয়ে চলেন না যাতে রচনার আয়তন বৃদ্ধি পেলেও, কবিতার ক্ষতি হয়। তাঁর রচনায়, উগো বা রবীন্দ্রনাথের তুলনায়, রূপকরণের বৈচিত্র্য কম, আর এতেও বোঝা যায় তাঁর চরিত্র কত নির্লোভ ছিলো, কত বিনয়ী, রোমান্টিক অহমিকা থেকে কত সুদূর। নিরন্তর তাঁর ধ্যানের বিষয় তাঁর কবিতাই—কবিতা-রচনায় উপলক্ষের মতো যা কাজ করে, সেই জীবনীগত ঘটনা নয়—তাই আবেগের নিবিড়তম মুহূর্তেও উচ্ছ্বাসের হাতে ধরা দেন না তিনি, কবির উপরে কবিতাকে স্থাপন করেন। 'সুন্দর জাহাজ' কবিতাটি, যাতে একটি তরণী বা তরুণীর গতিভঙ্গি যেন ইন্দ্রিয়ের কাছে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে, তার মনোমুগ্ধকর দোলাচল, মাত্র দশ স্তবকে সীমিত হ'য়ে, এবং বহু একতাল সনেটের পরে এসে, আমাদের মনের মধ্যে এক অপূর্ব আন্দোলন জাগিয়ে তোলে। যদি 'ফ্লার দ্যু মাল'-এ সনেটের সংখ্যা কম হ'তো, বা স্তবকের বৈচিত্র্য আরো বেশি, তাহ'লে ঠিক এই অভিঘাতটি ঘটতো না; তাহ'লে হয়তো, দক্ষতায় বিস্মিত হ'য়ে কবিতাকে ভালোবাসতে আমরা ভুলে যেতাম। 'ফ্লার দ্যু মাল'-এর কোনো-কোনো লক্ষণ স্পষ্টত আঠারো-শতকী : আবাহন, সম্বোধন, অমূর্তকে ব্যক্তিরূপে কল্পনা—এগুলি বোদলেয়ার বর্জন করেননি (কবিতার পক্ষে একেবারে বর্জন করা সম্ভবও নয়); তবু লক্ষণীয় যে 'O wild west wind' বা 'হে নূতন, এসো তুমি'-র মতো উচ্চস্বর তাঁর কাব্যে একবারও ধ্বনিত হয় না; তাঁর কণ্ঠস্বর নিরন্তর মৃদু, বাচনভঙ্গি স্বগতোক্তির; তিনি যখন বলেন, 'দুঃখ, এসো, হাত রাখো হাতে' তা একটি অন্তরঙ্গ দীর্ঘশ্বাসের মতো শোনায়। 'মতো'-বিদ্বেষী হ'য়ে কবিতায় নূতনত্ব আনতে চাননি তিনি—তাঁর কাব্যে ঐ শব্দের ব্যবহার প্রচুর—উপমাকে অনিবার্য জেনে তিনি উপমাকেই নতুন জন্ম

দিয়েছেন। কী অর্থে নতুন, তার উপলব্ধির জন্য শুধু প্রয়োজন আমাদের পূর্ব-পরিচিত প্রিয় কবিতাগুচ্ছকে মুহূর্তের জন্য স্মরণ করা: শেলির কবিতায় হেমন্ত ঋতু মূর্ত হ'য়ে ওঠে 'প্রেতের মতো পলায়মান, রক্ত, পীত, কৃষ্ণ ও পাণ্ডুবর্ণ রাশি-রাশি ঝরা পাতা'র চিত্রকল্পে; আর বোদলেয়ার, আঁটি-বাঁধা জ্বালানি কাঠ নামাবার শব্দে, শুনতে পান ফাঁসিমঞ্চ নির্মাণের ধ্বনি, কবরে পেরেক ঠোকার শব্দ, কার প্রস্থানের অলক্ষ্য পদপাত। যাকে রবীন্দ্রনাথ আবাহন করেন 'বন্ধু' ও 'জ্যোতির কনকপদ্ম' ব'লে, সেই সূর্য, বোদলেয়ারের কবিতায়, 'উদার রাজার মতো, একা, বিনা পাত্রপারিষদে/আসে সব হাসপাতালে, আর সব বিশাল প্রাসাদে।' প্রভেদ শুধু এখানে নয় যে বোদলেয়ারের ভাষা ও ভঙ্গি অনেক বেশি ঘরোয়া, এবং তিনি অনুকম্পায় বিশ্বস্তর; গভীরতর প্রভেদ এই যে রোমাণ্টিকদের উপমা বর্ণনাধর্মী, আর বোদলেয়ারের উপমা উপমেয়র বিষয়ে যতটা বলে কবির আত্মার বিষয়ে ততোধিক। 'সাবিত্রী' প'ড়ে ধারণা হয়, কোনো-এক কবিকে কাব্যরচনায় প্রেরণা জোগানোই সূর্যের কাজ; কিন্তু বোদলেয়ারের সূর্য খঞ্জকেও 'শিশুর আহ্লাদে' মাতিয়ে তোলে, এবং 'কবির মতো' হীন বস্তুকে মূল্য দেয়, অথচ খড়খড়ির আড়ালে কোনো-এক 'গোপন কাম'কে ব্যাহত করতে পারে না। কবিতাটির বিশেষ আকর্ষণ বিভিন্ন ও ভিন্নধর্মী তথ্যের সমাবেশে, এবং তথ্যগুলিকে পরস্পরে প্রবিষ্ট করার ক্ষমতায়; আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না যে ঐ কবি, রাজা, খঞ্জেরা ও গুপ্ত লম্পট—এদের সকলের মধ্যে বোদলেয়ারই বিরাজমান। চারটি 'বিতৃষ্ণা'য় ও একাধিক 'প্যারিস-চিত্রে' একই প্রক্রিয়া লক্ষ করি আমরা; কবিতার লেখক ও তথ্যের মধ্যে যে ব্যবধান শেলি অথবা রবীন্দ্রনাথে অনুভাব্য, সেটি সরিয়ে দেবার ফলে বোদলেয়ারের উপমাসমূহে আত্মোদ্‌ঘাটনের গুণ বর্তেছে, যেন আত্মার কোনো গোপন স্থলে হঠাৎ আলো ফেলা হ'লো; তাঁর উপমাও এক প্রকার স্বীকারোক্তি। উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত করি 'সুন্দর জাহাজ' কবিতার সেই আশ্চর্য স্তবক:

মহান জঙ্ঘার আঘাতে বসনের আলোড়ন
জাগায় যাতনায় আঁধার বাসনার আবেদন।
যেন রে ডাকিনীরা দু-জনে
গভীর খলে নাড়ে কালিমাঘন এক পাঁচনে।

চলার সময়, বসনের আচ্ছাদনে, পদযুগ যে-ভাবে আন্দোলিত হয়, তার ছবিটি অতিক্রত সিনেমার মতো স্পষ্ট, অথচ উপমাটির মধ্য দিয়ে যা প্রকাশ পেয়েছে তা কবির এই ধারণা যে যৌন কামনা যুগপৎ ভীষণ ও রমণীয়, মদির ও মারাত্মক। তেমনি, 'কবরের মতো গভীর' বাসরশয্যা, 'দরগলমান গ্রেসিআরে'র মতো চুম্বনজনিত নিষ্ঠীবন, বা 'কামুক ঝর্নার মতো' কঙ্কালের 'লেস-বোনা গলবন্ধ'। রতি ও ধ্বংসের একতা বোদলেয়ারের মনে নিত্য-জাগ্রত; মার্লো, রেনেসাঁসের সরল সন্তান, এক অমর পংক্তিতে মানবের এক অমর আকৃতিতে বিধৃত করেন, আর বোদলেয়ার, উনিশ শতকের নষ্ট, পরিশীলিত ও সজ্ঞান প্রতিভূ যাতনাকে বর্জন ক'রে কামনাকে ভাবতে পারেন না। তাঁর কবিতায়, যেন 'make me immortal with a kiss'-এর প্রত্যুত্তরে, গরল ও ছুরিকা বলে:

পারিস তার রাজ্য থেকে পলাতে
আমরা যদি কর্মে করি ত্বরা—
কিন্তু তোরই চুম্বনের জ্বালাতে
বাঁচবে পুনে তোর পিশাচীর মড়া!

৩

যাকে বৈচিত্র্য বলে, বিস্তার বলে, এমনকি সাধারণত মৌলিকতা বলে, তার কিছুই বোদলেয়ারে নেই। ওঅর্ডস্বার্থের মতো, প্রায় পূর্ণ এক শতক পরে, তিনি নতুন একটি কাব্যরীতির প্রবর্তন করেননি; হুইটম্যানের মতো, কবিতার প্রকরণে ও বিষয়বস্তুতে সঞ্চার করেননি অপূর্বতা; গোতিয়ে বা মালার্মের মতো কোনো গোষ্ঠীর গুরু নন তিনি; পাউণ্ড অথবা এলিয়টের মতো, কোনো 'আন্দোলনে'র নায়কও নন। এই মহত্তম ফরাশি কবিকে বিনয়ীতম কবিও বলা যায়; গোতিয়ে ও ভিক্তর উগোকে ভক্তি ক'রে পরিতৃপ্ত তিনি, সাঁ-ব্যভের তুষ্টিসাধনে অনবরত সচেষ্ট, এবং পূর্বসূরিদের অনুসরণে পরিশ্রমী।

স্বল্প তাঁর কাব্যের উপকরণ; মিল, উপমা, চিত্রকল্প, এমনকি শব্দের সংখ্যাও পরিমিত। 'নির্বেদ', 'শূন্যতা', 'গহ্বর'; 'সমুদ্র', 'জাহাজ', 'মাস্তুল'; 'শব', 'কফিন', 'কবর', 'কঙ্কাল'; 'তিক্ত', 'মধুর', 'কৃষ্ণ', 'শীতল', 'সুগন্ধি'; 'ডাইনি', 'পিশাচী', 'স্ফিঙ্কস'; 'গভীর', 'বিলাসী', 'অন্ধকার', 'উজ্জ্বল', 'রহস্যময়'—এ সব শব্দের পৌনঃপুনিক ব্যবহার লক্ষ না-করা অসম্ভব। কোনো পংক্তির শেষে 'mer' (সমুদ্র) বা 'amer' (তিক্ত) থাকলে আমরা প্রায় ধ'রে নিতে পারি যে অন্যটি আসন্ন; 'ténébre' (অন্ধকার) ও 'funébre র (funereal, বাংলায় শোকাবহ বলা যায়) সহবাসেও অভ্যস্ত হ'তে হয়; té-প্রত্যয়ান্ত যে-কোনো বিশেষ্যপদের কাছাকাছি 'volupté'-র (ইন্দ্রিয়বিলাস) ব্যবহারও, তাঁর রচনার সঙ্গে কিছুটা পরিচিত হ'লে, আর আশাতীত থাকে না। আর তাঁর কাব্যের বিষয় হিশেবে যা-কিছু উল্লেখ্য, তার একটি বড়ো অংশ—বিষাদ, বিতৃষ্ণা ও নির্বেদ, কামোন্মাদ ও কামদ্রোহ, ইন্দ্রিয়বিলাস ও 'শয়তানপন্থা', দরিদ্র ও পতিতের জীবন, মৃত্যু ও দূরপ্রয়াণ—এই সবই, উত্তরাধিকারসূত্রে, উগো, গোতিয়ে, সাঁ্যা-ব্যুভের কাছে তিনি পেয়েছিলেন, ইংরেজ রোমান্টিকদের কাছে, পেত্রুস বরেল ও তেয়োফীল ও'নেডির মতো ঐকাহিক কবিদের কাছেও। তিনি, চিত্রকর কঁস্তাঁতাঁ গী-র বন্ধু ও ভক্ত, যিনি সব ফ্যাশনকেই 'মনোমুগ্ধকর' বলেছিলেন, দেখেছিলেন প্রসাধন-কলায় 'মানবাত্মার মহিমার একটি লক্ষণ', সাহিত্যিক ফ্যাশনকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছিলেন: 'ড্যাণ্ডী', 'ছোটো গোষ্ঠী', 'তরুণ ফ্রান্স'—তাঁর বালকবয়সে উচ্ছ্রিত এই সব প্যারিসীয় চলোর্মির বেগেই তাঁর প্রথম আত্মোপলব্ধি; মনে হয় এ-সব গোষ্ঠী ও কবিদের পুঁজিপাটা সব তিনি তুলে নিয়েছিলেন—তাঁদের ইংরেজিয়ানা, বিতৃষ্ণাবোধ, মরণোল্লাস, কিছুই বাদ দেয়নি। হয়তো আরো বেশি বলা যায়: সমগ্র রোমান্টিকতাকেই তিনি আত্মসাৎ ক'রে নেন—তার মধ্যে যা দাগি, ময়লা বা রং-চটা, সব সুদ্ধ, সেই বহুব্যবহৃত স্তূপ থেকেই ছেঁকে তোলেন যে-কবিতা তাঁর ব্যক্তিগত এবং ভবিষ্যতের। তাঁর রচনার সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে বহুনিন্দিত 'ক্লিশে' সম্বন্ধে

আমাদের ধারণা কিছুটা বদলে যায়; আমরা দেখতে পাই যে 'ক্লিশে'কে সভয়ে পরিহার ক'রে চলেন ক্ষুদ্র কবিরা, আর প্রতিভাবানেরা তাকে হাত পেতে নিয়ে রূপান্তরিত করেন। রোমান্টিকতার সূত্রগুলিকে কেমন ক'রে তিনি রূপান্তরিত করেন, আর তাঁর নিজস্ব সংযোজনাই বা কতটুকু, প্রবন্ধের অবশিষ্ট অংশে তা-ই আমার আলোচ্য হবে।

আমি বলতে চাচ্ছি যে ক্লাসিক রীতি সত্ত্বেও—অথবা সেইজন্যেই—বোদলেয়ারই পরম রোমান্টিক, তাঁর কবিতা রোমান্টিকতার—'কামস্কাটকা' নয়—কৈলাস; রোমান্টিক ও আধুনিক কবিতার মধ্যস্থলে তিনি অনন্যভাবে অবস্থিত। তাঁর রচনায় রোমান্টিক উচ্ছ্বাস যেমন নেই, তেমনি নেই আধুনিক দুর্বোধ্যতা; তাঁর প্রতিটি রচনা প্রাঞ্জলতার দৃষ্টান্তস্থল, অথচ ঘন ও গভীর, আকারে ক্ষুদ্র হ'য়েও ইঙ্গিতে দূরপ্রসারী। কোনো দৈব বরপ্রাপ্ত রাজপুত্রের মতো, তিনি যেন সহজেই কবিতাকে সব শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন: গ্যেটের দার্শনিকতা, হাইনের কৌতুক, গোতিয়ের চাপল্য, উগোর গুরু-মশাইগিরি—এই সব সংকট কাটিয়ে তিনি কবিতাকে ক'রে তুলেছেন যুগপৎ নির্ভার ও ভাবনামগ্ন, গম্ভীর, সহৃদয় ও সুপ্রবেশ্য। এবং তাঁর উত্তরসাধকদের মধ্যেও, একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে, এই গুণগুলির সমন্বয় আমরা পাই না; তাঁর তুলনায় ভেরলেন কোমল, র‍্যাঁবো উদ্বেল, এবং মালার্মে নিস্তাপ। কবিতায় সাড়া দিতে পারলেই তাঁর কবিতায় সাড়া দেয়া যায়; কিন্তু মালার্মে ভাষ্যনির্ভর, এলিয়ট পাণ্ডিত্যের মুখাপেক্ষী, এমনকি ইএটস অথবা রিলকেরও কোনো-কোনো শ্রেষ্ঠ রচনা, তাঁদের জীবনী অথবা 'দর্শন' না-জানা পর্যন্ত, চাবি লুকিয়ে রাখে। তর্কাতীত এই কবিদের গৌরব, এবং এও স্বীকার্য যে দুর্বোধ্যতা, বিশেষ এক অর্থে; আধুনিক কবিতার মূল্য বাড়িয়েছে; কিন্তু যে-দুর্বোধ্যতা শুধুমাত্র জ্ঞানার্জনের দ্বারা অতিক্রম্য, তাকে, শেষ পর্যন্ত, কবিতার একটি দুর্বলতা ব'লে আমরা মানতে বাধ্য। তাঁর কবিতার উঁচু মিনারটিকে বোদলেয়ার সোপানহীন ক'রে গড়েননি; তিনি বর্জন করেননি কাহিনীর সূত্র, চিন্তার পারম্পর্য, ব্যাকরণের শৃঙ্খলা: আমাদের মনে রাখতে

হবে যে তাঁর কোনো-কোনো গদ্যকবিতাকে প্রায় ছোটোগল্প বলা যায়, এবং তাঁর প্রারম্ভিক গদ্য প্রসাদগুণে দীপ্যমান। এই গুণটি, আমরা জানি, প্রতিভার অপরিহার্য লক্ষণ নয়, একই লেখকের গদ্যে ও কবিতায় তা সমানভাবে বিরাজ করে না, কিন্তু বোদলেয়ারের কবিতা—এলিয়ট থেকে কিছুটা ভিন্ন অর্থে—তাঁর গদ্যের মতোই সুলিখিত। অর্থাৎ, তাঁর কাব্যে হেঁয়ালি নেই, নেই অতিসূক্ষ্ম সাহিত্যিক বা আত্মজৈবনিক উল্লেখ; তাতে গভীরতরভাবে প্রবেশ করার জন্য যা প্রয়োজন তা মল্লিনাথগণের মন্তব্য নয়, তারই সঙ্গে দীর্ঘতর, নিবিড়তর সহবাস;—তাঁর প্রতিটি কবিতা স্বপ্রতিষ্ঠ ও স্বতোদ্ভাসিত। এবং সেইজন্যেই তাঁর আবেদন আজ বিশ্বব্যাপী।

৪

'রোমান্টিকতা বিশ্বসাহিত্যের এক বিরাট ঘটনা'—আমার এই উক্তির সমর্থনে এবার দু-একটি কথা বলতে চাই। ভাবতে অবাক লাগে যে শিল্পকলা, বহু সৃষ্টিশীল শতাব্দী ধ'রে, এমন কয়েকটি অভিজ্ঞতাকে অস্পৃষ্ট রেখে গেছে, যা মহত্তম অর্থে মানবিক। গ্রীক শিল্পে মৃদুহাস্য নেই; মানব-মুখে সভ্যতার এই আশ্চর্য স্বাক্ষরটি, যাতে বহু বিরোধী ভাব যুগপৎ বা বিভিন্ন সময়ে ব্যক্ত হ'য়ে থাকে, তা খৃষ্টপূর্ব দেহপূজকদের দৃষ্টিতে ধরা দেয়নি। আর যদিও, রীমস ক্যাথিড্রলের 'সহাস্য দেবদূতে'র বহু পূর্বেই বৌদ্ধ ও হিন্দু শিল্পে মৃদুহাসি উদ্ভাসিত হয়েছিলো, অন্য একটি ভাব, যা মৃদুহাসির সহচর ও পরিপূরক, মানবজীবনের বড়ো একটি তথ্য, হিন্দু, গ্রীক, চৈনিক ও খৃষ্টান শিল্পের পূর্ণোদ্যম সত্ত্বেও, যুগের পর যুগ প্রচ্ছন্ন থেকে গিয়েছে। সেই ভাবটির নাম বিষাদ। বিষাদ, যা য়োরোপীয় রেনেসাঁসের একটি আবিষ্কার, যার প্রথম উদাহরণ পেত্রার্কার কবিতায়, তাকে, মানুষের এক জন্মান্তরক্ষণে, দা ভিঞ্চি হাসির মধ্যে দ্রব ক'রে দিলেন; কোনারকের বাদিনীমূর্তির হাস্য যেমন আনন্দময়, তেমনি মোনা লিসার হাসি বিষাদে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট। এমনকি বত্তিচেল্লির ভেনাসের মুখেও আমরা নির্ভুলভাবে বিষাদের আভাস দেখতে পাই, যার জন্যে মনে হয় যে

প্রতীচীর আনুপূর্বিক শিল্পধারায়, প্রেমের দেবী এই প্রথম একটি আত্মা লাভ করলেন। রেমব্রাণ্টের সারি-সারি প্রতিকৃতি, সারি-সারি বিষণ্ণ চোখ খুলে রেখে, আমাদের ভুলতে দেয় না মানুষ কত রহস্যময়; আর শেক্সপীয়র, সাহিত্যে রেনেসাঁসের শ্রেষ্ঠ সন্তান, তাঁর বিশাল অর্কেস্ট্রার মধ্যে একটি মৃদু ও নিঃসঙ্গ বংশীধ্বনি মাঝে-মাঝে শুনতে পাই আমরা—যা ব'লে যায় মানুষের মনে এমন কোনো-কোনো সুর আছে যা কার্যকারণের অতীত। যে-বিষাদ, বেন জনসনের নাটকে, বাত পিত্ত শ্লেষ্মার মতো এক ধাতু বা 'humour' মাত্র, যান্ত্রিক ও বিবর্তনহীন এক উপসর্গ, তাকে শেক্সপীয়র দিলেন প্রাণ, গতি ও আধ্যাত্মিক অর্থ, প্রতিষ্ঠা করলেন মনুষ্যত্বের একটি কুললক্ষণ ব'লে। হ্যামলেট, যাকে সাহিত্যে প্রথম আধুনিক মানুষ বলতে লুব্ধ হই আমরা, তার ব্যাপ্ত বিষাদের তবু একটা কারণ বা উপলক্ষ ছিলো; কিন্তু 'দি মার্চেণ্ট অব ভেনিস'-এর অ্যাণ্টনিও চরিত্র—নাটকের প্রারম্ভেই যে ঘোষণা করে, 'In sooth I know not why I am so sad'—তার বিষয়ে কী ব্যাখ্যা আমরা দিতে পারি? শেক্সপীয়রের আশ্চর্য এক সৃষ্টি এই অ্যাণ্টনিও, হয়তো আরো আশ্চর্য 'অ্যাণ্টনি অ্যাণ্ড ক্লিওপ্যাট্রা'র এনোবার্বস। যে-ঘটনাচক্রে অ্যাণ্টনিও প্রথম থেকে লিপ্ত, তাতে তার নিজের লভ্য বা অংশ বলতে কিছু নেই; য়োরোপীয় খৃষ্টান হ'য়েও, সে যেন বিশুদ্ধভাবে গীতায় উক্ত নিষ্কাম কর্ম ক'রে যাচ্ছে; যেমন সে অবিচলভাবে বন্ধুর জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিতে উদ্যত হ'লো, সেই বন্ধু ও বন্ধুপত্নীর মিলনমোদিত পঞ্চমাঙ্কেও তেমনি অনাসক্ত সে; অন্যেরা যেখানে সুখী বা সন্তপ্ত হয়, শাস্তি বা পুরস্কার লাভ করে, সেই রঙ্গমঞ্চে অ্যাণ্টনিও (নামকরণ অনুসারে যে নাটকের 'নায়ক') যেন অর্ধাচ্ছাদিত এক মূর্তি, তার পা যেন ভূমিস্পর্শ করে না, এক নেপথ্য থেকে আর-এক নেপথ্যে ভেসে যাবার সময়টুকুতে, তাকে বার-বার দেখেও, তার বিষয়ে আমরা কিছুই প্রায় জানতে পারি না: শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বুঝি না তার এই বীর্যনাশক বিষাদের উৎস কোথায়। আর এনোবার্বস যেন উপনিষদের সেই দ্বিতীয় পাখি, যে কর্ম করে না শুধু লক্ষ করে, চৈতন্যের প্রতিভূ সে; ঘটনাবহুল নাটকটির মধ্যে

একমাত্র সে-ই কষ্ট পাচ্ছে নিজের অথবা প্রভুর কর্মফলে নয়, বিবেকের দংশনে; একমাত্র সে-ই নয় দাস অথবা রাজা, বীর অথবা আজ্ঞাবহ; আর সেইজন্যই, কোনো পূর্বচিহ্নিত স্থান নেই ব'লে, তাকে সচেতনভাবে চেষ্টা করতে হয় 'কাহিনীর মধ্যে একটি স্থান অর্জনে'র জন্য। আমরা মনে-মনে বুঝি যে এই স্থানটুকু 'অর্জন' করা তার পক্ষে অসম্ভব—কেননা দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পাপের মধ্যে কোনোটাকেই সে বেছে নিতে পারবে না; কিন্তু তবু, চতুর্থ অঙ্কের সেই অবিস্মরণীয় ক্ষুদ্র দৃশ্যটিতে—যা মনে হয় শেক্সপীয়র তাঁর কলমের এক আঁচড়ে শেষ ক'রে নায়কনায়িকার গ্রন্থিমোচনের দিকে ছুটেছিলেন, অথচ যার মধ্যে মানবাত্মার এক মর্মবেদনা প্রোথিত হ'য়ে আছে—সেই দৃশ্যে তার প্রবেশমাত্র আমরা বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে যাই, কেননা তখন, রোমক কূটনৈতিকের ছদ্মবেশ সরিয়ে ফেলে, সে রেনেসাঁসের প্রতিভূ হ'য়ে দেখা দেয়; সঞ্চার করে, 'O sovereign mistress of true melancholy', চাঁদের উদ্দেশে এই একটি পংক্তি উচ্চারণ ক'রে, আমাদের মনের মধ্যে এমন এক গভীর অনুভূতি, নাটকের ঘটনাসংস্থানে যার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। সে-ক্ষণে এনোবার্বস কি পাগল হ'য়ে গিয়েছিলো, তার মৃত্যু কি স্বাভাবিক না আত্মহত্যা—এই সবই শেক্সপীয়র অস্পষ্ট রেখেছেন ব'লে আমাদের রহস্যবোধ আরো ঘনীভূত হয়; আমরা যেন অনুভব করি যে এই বিষাদ ও মৃত্যুর অর্থ শুধু এনোবার্বসের আত্মশুদ্ধি নয়, নাটকের মুখ্য পাত্রপাত্রীদের পাপের জন্যও প্রায়শ্চিত্ত।

শিল্পকলার পূর্ব-ইতিহাসে আমরা কিছুই খুঁজে পাবো না, যা এই সব নিদর্শনের সঙ্গে তুলনীয়। প্রাচীন সাহিত্যে কষ্ট আছে, আর্তি আছে, মনস্তাপ আছে, কিছু বিষাদ নেই। ধ'রে নিতে হবে যে বিষাদ ভাবটি মানবচিত্তে আবহমান; কিন্তু সে-বিষয়ে চেতনার উন্মেষ ঘটে রেনেসাঁসের যুগে, আর পূর্ণ বিকাশ রোমান্টিকতায়। লা রশফুকো বলেছিলেন যে মানুষ যদি প্রেমের কথা এত না শুনতো তাহ'লে সে প্রেমে পড়তো না। যা সাহিত্যে নেই তা জীবনেও অনুভূত হয় না: রেনেসাঁস-শিল্পে বিষাদের উদ্ভাস দেখে, তবে মানুষ জানতে পারলো যে বিষণ্ণ হওয়া তার স্বভাবের একটি লক্ষণ। এবং এই জ্ঞানকে

যাঁরা চরমে নিয়ে গেলেন, তার সব সম্ভাবনাকে উদ্‌ঘাটন ক'রে দেখালেন যাঁরা, তাঁরাই রোমান্টিকতার প্রবর্তক। রুসো, শাতোব্রিয়াঁ, হেবর্টের, জর্মান 'বিশ্ববিষাদ', বায়রনি জীবনক্লান্তি; অশ্রু, হতাশা, আত্মহত্যা;—এই সবের মধ্য দিয়ে অন্তত এই মহাসত্য প্রতিভাত হ'লো যে ভলতেয়ারি 'ক্ষেত্রকর্ষণ'ই মানবজীবনের শেষ কথা নয়। রোমান্টিক অনুভূতি এতদূর পর্যন্ত পৌঁছলো যেখানে পুলকদেউলের মণিকোঠায় ঘোমটা-পরা বিষাদের দেবী বিরাজ করেন, আর বিষণ্ণতম সংগীতই মধুরতম হ'য়ে ওঠে।

কী এসে যায়, থাকলে তোমার সুমতি?
হও রূপসী, বিষাদময়ী! অশ্রুজল
নতুন রূপে করুক তোমায় শ্রীমতী—('বিষাদগীতিকা')

চারু চোখ দুটি বিষণ্ণতায় ভরা
প্রেয়সী, খুলো না, থাকো আরো কিছুখন! ('ফোয়ারা')

ও-বরতনুতে চুম্বনরাশি দিতাম ঢেলে,
শীতল পা থেকে কালো চুল পর্যন্ত
ছড়িয়ে গভীর সোহাগের মণিরত্ন

বিনা চেষ্টায় যদি এক ফোঁটা অশ্রু ফেলে
কোনো সন্ধ্যায়—নিষ্ঠুরতমা হে রূপবতী!—
ম্লান ক'রে দিতে ঠান্ডা চোখের তীব্র জ্যোতি। ('সে-রাতে ছিলাম...')

বার-বার, বোদলেয়ারের কাব্যে, আমাদের পক্ষে এই সুপরিচিত ধারণাটি ধ্বনিত হয়েছে যে কোনো নির্বিষাদ সত্তা, শুধু যে সুন্দর হ'তে পারে না তা নয়, পূর্ণ মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয় না। 'রূপসী' ও 'বিষাদময়ী' প্রায় সমার্থক, এবং যে-নারী চুম্বনযোগ্য তার চোখ অশ্রুতে মলিন। 'সৌন্দর্য,' একটি 'স্ফুলিঙ্গে' তিনি লিখেছিলেন, 'আনন্দ তার এক ইতরোচিত ভূষণ, কিন্তু বিষণ্ণতা তার মহীয়সী পত্নী। যার সঙ্গে দুঃখের কোনো সম্বন্ধ নেই এমন কোনো সৌন্দর্য আমার ধারণাতীত।' প্রেমের পূর্ণতাও বিষাদসাপেক্ষ, কেননা, 'কখনো তাদের মিলনসুখ এত মধুর হয়নি, যেমন বিষাদে ও ক্ষমায় ভরা সেই রাত্রে—দুঃখে ও মনস্তাপে পরিপ্লুত সেই সুখ।' এবং এ-সব ধারণায় তিনি তাঁর অগ্রজ রোমান্টিকদের সধর্মী।

ক্তিন্তু বোদলেয়ারের অন্বেষণ আরো দূরস্পর্শী, মানবস্বভাবের আরো গভীরে তিনি নেমেছিলেন। রোমাণ্টিকদের বিষাদে বিলাসের একটি অংশ আছে; আছে ব'লে নিন্দা করি না তাঁদের, কেননা বিলাস বস্তুটিকে শুধু সুখের আনুষঙ্গিক ব'লে তাঁরাই ভাবতে পারেন যাঁরা আত্মার রহস্য বিষয়ে অজ্ঞান। তবু এ-কথাও স্বীকার্য যে বায়রনি বিষাদ একেবারে নির্ভান নয়, এবং শেলির খেদময় উক্তিসমূহ একটি বালকোচিত সরলতায় আচ্ছন্ন। শেলি, বায়রন, ওঅর্ডস্বার্থ—এঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত দুঃখের জন্য দায়ী করেছেন অন্য মানুষকে, এবং অন্য মানুষের দুঃখের জন্য রাষ্ট্র বা সমাজকে; তাঁদের রচনার মধ্য দিয়ে প্রায় যেন এই ভাবটি ধরা পড়ে যে তাঁরাই একমাত্র ভালো এবং অন্য সবাই অসাধু। কিন্তু বোদলেয়ার সেই রোমাণ্টিকশ্রেষ্ঠ, যিনি জানেন যে তাঁর যন্ত্রণার কারণ তিনি নিজেই, এবং ডস্টয়েভস্কির নায়কনায়িকাদের মতো, দুঃখকে যিনি মানুষের একটি প্র য়ো জ ন ব'লে অনুভব করেন। অর্থাৎ—আর এটাই রোমাণ্টিকদের সঙ্গে তাঁর মূল পার্থক্য—যে-মানবস্বভাব রোমাণ্টিক মতে সহজাতভাবে শুদ্ধ, তাকে বোদলেয়ার দেখেছিলেন দুর্বারভাবে পাপোন্মুখ ব'লে। 'What man has made of man' তা নিয়ে তিনি ভাবিত নন; তাঁর জিজ্ঞাসা: 'আমি নি জে কে নিয়ে কী করেছি?' ওঅর্ডস্বার্থ, তাঁর নিজের সুবিধেমতো, 'মানুষ' নামক ধারণাটিকে দুই অংশে ভাগ ক'রে নিয়েছেন, এবং নিজের উপর কোনো দায়িত্বই রাখেননি, কিন্তু এই নিশ্চিন্ত আক্ষেপের বদলে আমরা বোদলেয়ারে পাই 'মধ্যরাত্রির পরীক্ষা' বা গদ্যকবিতা 'রাত একটাতে'র মতো রচনায় নিজের প্রতি ক্ষমাহীনতা; পাই, যেন বিশ্বমানবের মর্মপীড়া থেকে উত্থিত এই ক্রন্দনধ্বনি: 'ভগবান, ভগবান, দাও সেই শক্তি ও সাহস, যাতে পারি/দেখে নিতে আমার শরীর মন, বিতৃষ্ণাব্যতীত।' রোমাণ্টিকেরা আত্মকরুণা করেন, বোদলেয়ার আত্মপরীক্ষা; তাঁরা দোষ দেন অন্যদের, তিনি নিজেকে; তাঁরা চান আদর্শ রাষ্ট্র—যার প্রভাবে সাপ পর্যন্ত নির্বিষ হবে—আর তিনি চান প্রার্থনার দ্বারা আত্মশোধন; তাঁরা—ও পরে প্রকৃতিপন্থীরা—যেখানে পূজা করেছেন ইহুদি সুবিচারের ধারণাকে, সেখানে বোদলেয়ার বেদী গড়েছেন

খৃষ্টীয় করুণার জন্য। তাই তাঁর দরিদ্রবিষয়ক কবিতায় উগো অথবা ওঅর্ড-স্বার্থের ভাবালুতা নেই; ঐ কবিদের মতো তিনি ভাবেন না, যে দরিদ্র, বা গ্রাম্য হ'লেই সাধু হবে, বরং তাঁর 'কেক' নামক গদ্যকবিতায় দারিদ্র্যের পৈশাচিকতার এক ভীষণ ছবি এঁকেছেন তিনি। সত্য, 'গরিবের চোখ' গদ্যকবিতায় ধনীর নিঃসাড়তাও দুঃসহ; কিন্তু 'ধনী' ও 'নির্ধন' শব্দ দুটিকে মানুষের অভিজ্ঞান ব'লে কখনোই তিনি স্বীকার করেননি; তাঁর লাল চুলের ভিখারিনীর চোখেও গৃধ্নুতা প্রকাশ পায়, বস্তিবাসী ন্যাকড়া-কুড়ুনিরাও সুরার প্রভাবে বীরত্ব লাভ করে, এবং ক্ষুধিতেরাও মৃত্যুকালে ঈশ্বরের স্বপ্ন ছাখে। আদিপাপে বিশ্বাসী ব'লে, তিনি কদর্যতা বা মহিমায় ধনী-দরিদ্রের সমান অধিকার স্বীকার করেছেন; বুঝেছেন যে শুধু তা-ই সর্বমানবের সাধারণ সম্পত্তি হ'তে পারে যা, সুরা, স্বপ্ন বা ঈশ্বরের মতো, মানুষকে তার দৈহিক অবরোধ থেকে মুক্তি দেয়।

এবং একই কারণে তাঁর বিষাদ পরিণত হয়েছে বিতৃষ্ণায়—শুধু জগতের প্রতি নয়, নিজেরও প্রতি; এবং বিতৃষ্ণা থেকে সঞ্জাত হয়েছে নির্বেদ—সেই বিরাট, বহুকথিত, বোদলেয়ারীয় নির্বেদ—যা 'ব্যাপ্ত হয় অমরত্বে, অন্তহীন যার পরিমাণ।' নির্বেদকে তিনি বলেছেন 'জড়ের সন্তান', যার প্রভাবে 'সময়ের মন্থরতা' অসহ্য হ'য়ে ওঠে, নিজেকে মনে হয় 'নামহীন ত্রাসে পরিবৃত এক শিলাখণ্ড' মাত্র। কিন্তু আসলে—'ফ্ল্যর দ্যু মাল'-এর ছত্রে-ছত্রে তার প্রমাণ আছে—এই নির্বেদেরও উৎসস্থল চেতনার অবলুপ্তি নয়, চেতনার আতিশয্য। চেতনা যার ক্ষীণ, সে-মানুষ তার নির্বেদকে 'অমরতার সমায়তন' ব'লে অনুভব করে না; আড্ডা, নেশা বা যৌনতায় ম'জে তা থেকে অব্যাহতি পায়। 'পশুর মতো ঘুম', চুম্বনলব্ধ 'বলীয়ান বিস্মরণ', 'সময়ের ভয়ংকর ভার থেকে মুক্তি' তাঁর অনায়ত্ত ব'লেই এ-সবের জন্য বোদলেয়ারের প্রার্থনা এমন অবিরাম। সুরা, অহিফেন ও গঞ্জিকা নিয়ে, আমরা জানি, বহুবিধ পরীক্ষা তিনি করেছেন—প্রায়, তাঁর নিজেরই উপর, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা; সে-সবের উদ্দেশ্য চৈতন্যেরই তীক্ষ্ণতা-সাধন; তিনি যেন আকাঙ্ক্ষা করেছেন এমন এক তুরীয় অবস্থা যাতে সময়

পর্যন্ত অজ্ঞাতসারে অতিক্রান্ত হবে না, অনুভূত হবে প্রতিটি মুহূর্তের নিঃসরণ, শ্রুতিগম্য হবে বর্ণ, এবং শব্দ দৃশ্যমান। সফল হয়নি সে-সব পরীক্ষা, হ'তে পারে না—'কৃত্রিম স্বর্গে' তার নিষ্করুণ বিবরণ লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন—কিংবা শুধু সার্থক হয়েছে যন্ত্রণাকে তীব্রতর ক'রে, যে-যন্ত্রণা, অন্য সব অভিজ্ঞান যখন হারিয়ে যায়, চৈতন্যের সর্বশেষ প্রতিভূরূপে দাঁড়িয়ে থাকে। তেমনি, তাঁর পক্ষে যৌনতাও আত্মনির্যাতনেরই একটি উপায়; 'পাপকর্মের চৈতন্য' তার পরম সুখ; যদি তা পাপ হয়—আর বোদলেয়ারের তা-ই বিশ্বাস ছিলো—তাহ'লে তাকে পাপ ব'লে জানতে পারাটাই মনুষ্যত্ব *। 'কঙ্কাল', 'সিথেরায় যাত্রা', 'এক শহীদ', এই সব কবিতায়, নানা ভয়াবহ চিত্রকল্পের সাহায্যে, তিনি তাঁর এই ধারণাটি উপস্থিত করেছেন যে কামনা ও যাতনা অন্যোন্যনির্ভর; কিন্তু এ-বিষয়ে সবচেয়ে নির্মল ও নিষ্ঠুর স্বীকারোক্তি পাই 'আত্ম-প্রতিহিংসা' নামক কবিতাটিতে :

আমিই চাকা, দেহ আমারই দলি!
আঘাত আমি, আর ছুরিকা লাল!
চপেটাঘাত, আর খিন্ন গাল!
আমি জল্লাদ, আমিই বলি।

রোমান্টিক বিষাদে আশা ছিলো; ছিলো, কৃতী যন্ত্র ও উত্তম আইনের দ্বারা প্রণীত স্বর্গরাজ্যের সম্ভাবনা; কবিরা নিজেদের ভাবতে পারতেন নিষ্পাপ হরিণ ও 'পৃথিবী'কে শ্বাপদ ব'লে। কিন্তু বোদলেয়ার যেহেতু নিজেকে একাধারে বলি ও জল্লাদ ব'লে উপলব্ধি করেছেন, তাই তাঁর দুঃখ অনেক বেশি সত্যবাদী, এবং দুশ্চিকিৎস্য।

* ইতিহাসের একটি কৌতুক এই যে যৌনতান্বেষী বোদলেয়ার তাঁর জীবৎকালে—এবং মৃত্যুর পরেও বহুদিন পর্যন্ত—সাধারণের মনে চিত্রিত হয়েছেন যৌনতার একটি 'রাক্ষস' রূপে; অনুরাগী পাঠকরাও তাঁকে 'গণিকালয়ের সন্ত' ব'লে ভুল করেছেন। এও স্মর্তব্য যে পো, কোলরিজ বা ডিকুইন্সির মতো তিনি জীবনের কোনো অধ্যায়েই নেশার দাসত্ব নেননি এবং নেশার প্রভাবে চৈতন্যের কী অবস্থা হয় তার অমন নির্মম বিশ্লেষণ ডিকুইন্সিতেও নেই। ডিকুইন্সির 'কনফেশন্স' প'ড়ে যাঁরা অহিফেনসেবনে লুব্ধ হবেন তাঁদের মোহভংগ হবে 'কৃত্রিম স্বর্গ' পাঠ করলে। বস্তুত, বোদলেয়ারের চরিত্র ছিলো যুগপৎ বিলাসীর ও সন্ন্যাসীর; তাঁর কাব্যের তীব্রতা এই দুয়ের দ্বন্দ্বপ্রসূত।

কিন্তু অচিকিৎস্য নয়। 'প্রগতি'—অর্থাৎ রোমান্টিক, সংস্কারস্পৃহার প্রতিবাদ ক'রে তিনি তাঁর 'উন্মোচিত হৃদয়ে' লিখেছিলেন—'সত্যকার প্রগতির অর্থ নৈতিক প্রগতি, এবং তা সাধিত হ'তে পারে শুধু ব্যক্তির দ্বারা ব্যক্তিরই মধ্যে।' 'সত্যকার সভ্যতা,' একই গ্রন্থে কয়েক পৃষ্ঠা পরে আমরা পড়ি, 'আদি-পাপের লক্ষণহ্রাসেরই নামান্তর।' মানুষের পাপবৃত্তি যদি অমর হয়, তাহ'লে পুণ্যের প্রতি তার আকর্ষণও মৌলিক, এবং পাপলিপ্তি অনিবার্য হ'লে, পুণ্যের দিকে অগ্রগতিও সম্ভব। 'মাতাল হও', একটি গদ্যকবিতায় তাঁর আজ্ঞা শুনি আমরা, 'সুরা, কবিতা, পুণ্য, যার দ্বারাই হোক, মাতাল হও।' 'ভগবান যদি না-ও থাকেন,' 'স্ফুলিঙ্গে'র প্রথম উক্তিটি এই, 'তাহ'লেও ধর্ম কম পবিত্র নয়।' আর 'উন্মোচিত হৃদয়ে', শেষ পর্যন্ত, তাঁর সব অবমাননাকে 'ঈশ্বরের করুণা' ব'লে তিনি অঙ্গীকার করেন, লিপিবদ্ধ করেন এই অভিলাষ যে 'দিনে-দিনে. নিজের ধরনে, মহাপুরুষ ও সন্ত হ'য়ে উঠতে হবে', কেননা 'তা-ই একমাত্র, যাতে এসে যায়।' কেমন ক'রে, পাপ থেকে স'রে এসে, মানুষ পুণ্যের দিকে পা ফেলতে পারে, তাঁর মনে এই চিন্তা ছিলো নিত্যজাগ্রত। কোনো সংঘবদ্ধ উপায়ে, কোনো সামাজিক 'প্রগতি'র দ্বারা তা সাধিত হ'তে পারে না, তা সম্ভব শুধু 'ব্যক্তির দ্বারা ব্যক্তিরই মধ্যে'। অতএব তাঁর 'বিতৃষ্ণা'র পাশে তাঁর 'আদর্শ'কেও স্থাপন করতে হ'লো—একটি না-থাকলে অন্যটির অর্থ থাকে না—রতিপ্রতিমা 'কৃষ্ণ ভেনাস'-এর মুখোমুখি এক 'শ্বেত ভেনাস'কে, ম্যাডোনা যিনি, সরস্বতী ও দেবদূত, ভোগক্লান্ত 'আধ্যাত্মিক উষা'য় মানসপটে যাঁর মূর্তি 'সূর্যের মতো' প্রতিভাত হয়, এবং যাঁর উদ্দেশে, বহু নরক মন্থন করার পর, ধ্বনিত হয় এই নম্র স্তবগান :

প্রিয়তমা, সুন্দরীতমারে—
যে আমার উজ্জ্বল উদ্ধার—
অমৃতের দিব্য প্রতিমারে,
অমৃতেরে করি নমস্কার।

এখানে আমরা যা পাচ্ছি, তা খোঁয়ারির ক্ষণে লম্পটের অনুতাপ নয়, বহু বিপরীতকে যিনি নিজের মধ্যে ধারণ করেন তেমন এক ভাবুক ব্যক্তির মুমুক্ষা।

"অন্তরঙ্গ ডায়েরি'র 'সংশোধক'রূপে এলিয়ট প্রস্তাব করেছেন 'ভিটা নুওভা' ও 'ডিভাইন কমেডি' ; তাঁর কথার আমরা এ-রকম অর্থ করতে পারি যে বোদ-লেয়ারে নরক-পরিক্রমা থাকলেও স্বর্গ নেই, আর সেখানেই তাঁর কাব্যের ঊনতা। কিন্তু নরক, শোধনাগার ও স্বর্গের বিভেদ দান্তের মনে যেমন গাণিতিকভাবে সত্য ছিলো, আধুনিক মানুষ বোদলেয়ারের পক্ষে তেমনটি সম্ভব ছিলো না ; বরং তাঁর বিশেষ গৌরব এখানেই যে, শেক্সপীয়র ও ডস্টয়েভস্কির মতো, তিনি মানবাত্মাকে বহুস্তর ব'লে চিনেছিলেন : ব্যাধি ও স্বাস্থ্য, প্রেম ও ঘৃণা, আনন্দ ও আতঙ্ক, দ্রোহ আর আত্মসমর্পণ—এই বিরোধী ভাবগুলি, তাঁর ধারণায়, পরস্পরসংবদ্ধ শুধু নয়, পরস্পরের পরিপূরক। 'মানবহৃদয় সেই যুদ্ধ-ক্ষেত্র, যেখানে ঈশ্বর ও শয়তানের সংগ্রাম চিরকাল ধ'রে অনুষ্ঠিত হচ্ছে,' দ্‌মিত্রি কারামাজহ্ব-এর এই ঘোষণার পাশেই প্যারিসীয় কবির উচ্চারণ স্মর্তব্য : 'প্রত্যেক মানুষের মধ্যে, নিরন্তর, দুই যুগপৎ আসক্তি কাজ ক'রে যাচ্ছে—একটি ঈশ্বরের, অন্যটি শয়তানের প্রতি।' যে-নারীকে 'অমৃতের প্রতিমা' জ্ঞানে বোদলেয়ার নমস্কার জানিয়েছেন তাঁরই উদ্দেশে যখন তিনি বলেন, 'আনন্দময়ী, তুমি কি জেনেছো যন্ত্রণা ?' তখন ঐ প্রশ্নের পিছনে অনুক্ত কথাটি আমাদের অজানা থাকে না ; তিনি চান 'আনন্দময়ী'ও জানুন কাকে বলে ব্যাধি, দুঃখ ও বিতৃষ্ণা, আর কাকে বলে মৃত্যুভয়, নয় তো তাঁর মানবতা খণ্ডিত থেকে যাবে। এই বৈপরীত্যবোধ, বা বিপরীতের সংযুক্তিবোধের আর-একটি উদাহরণ 'ভ্রমণ' কবিতা—যার রঙ্গমঞ্চ সমগ্র মরজীবন ; ঘাতক যেখানে সপ্রেম, উৎসব শোণিত-গন্ধী, শক্তিমানেরা অবসাদগ্রস্ত এবং সন্ন্যাসীর 'চটের কণ্টক' কামস্রাবী। স্বর্গে সব বৈপরীত্য অবসিত হয় ব'লে, বোদলেয়ারের কাব্যে স্বর্গের উপস্থিতি নেই ; নেই, 'গীতাঞ্জলি'র মতো, ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের উন্মাদনা ; কিন্তু তার সমগ্র দেহ থেকে, মেঘের মধ্য দিয়ে বিদ্যুতের মতো, তীব্র, প্রোজ্জ্বল ও পৌনঃপুনিক, এই সত্যটি বিচ্ছুরিত হচ্ছে যে মানুষ অমৃতকে আকাঙ্ক্ষা করে, এবং সেই আকাঙ্ক্ষাই তার মনুষ্যত্বের পরম অভিজ্ঞান। দান্তের কাব্যে কাঙ্ক্ষিত লোকে পৌঁছনো আছে ; আর বোদলেয়ারে আমরা পাই অলব্ধের জন্য অসহ্য বেদনাবোধ, যা

আমাদের মনে হয় আরো বেশি মানবিক ও মানবিক মনস্তত্ত্বের অনুগামী। বোদলেয়ারের দুঃখ, সর্বশেষ বিচারে, অমৃতের জন্য বিরহবেদনা ছাড়া আর-কিছু নয়—মানুষের সব দুঃখই মূলত তা-ই—আর সেইজন্যই, গভীরতম আধ্যাত্মিক অর্থে, তাঁর দুঃখ মূল্যবান ; শুধু প্রেম বা সৌন্দর্য নয়, তার দ্বারা প্রজ্ঞাও লভ্য। 'হে আমার দুঃখ, তুমি প্রাজ্ঞ হও'—এই পবিত্র দীর্ঘশ্বাস শেলি অথবা বায়রনে আমরা শুনি না, এবং বোদলেয়ারে শুনি ব'লেই আমরা বুঝতে পারি তাঁর দুঃখসাধনা কত সার্থক।

৫

রোমান্টিক বিষাদের চরিত্রলক্ষণ এই যে তা অহেতুসম্ভব। কোনো কারণ যদি নির্দেশ করা গেলো তাহ'লেই ছিন্নমূল হবে সেই বিষাদ, যা, বর্ষার আকাশে মেঘের মতো, অলক্ষ্যে, অগোচরে, স্তরে-স্তরে, সমগ্র সত্তায় ব্যাপ্ত হ'য়ে থাকে। হেতু যে নেই সেটাই তার অস্তিত্বের হেতু। 'আমার মন ভালো নেই।' 'কেন ?' 'জানি না।' 'আমি একজনকে ভালোবাসি।' 'সে কে ?' 'কী ক'রে বলি। আমি কি তাকে দেখেছি ?'—এই যুক্তিরহিত মনস্তত্ত্ব, আরব, বৈষ্ণব ও ত্রুবাদুর মরমীরা যার আভাস দিয়ে গেছেন, য়োরোপের যুক্তি-যুগের অবসানকালে তা সংহত ও বলীয়ানভাবে প্রকাশ পেলো রুসোর সেই প্রখ্যাত বাক্যাংশে, যার অনুকম্পন পরবর্তী বিশ্বসাহিত্যে অবিরল। 'Je ne sais quoi'—আমি জানি না কী—যা শেক্সপীয়রের অ্যান্টনিওতে ইতিপূর্বে আমরা পেয়েছি—এই কথাটি রোমান্টিকতার মূলমন্ত্র। বাঙালি পাঠককে মনে করিয়ে দিতে হবে না যে রবীন্দ্রনাথে 'অকারণ' বিশেষণটি অসংখ্যবার ব্যবহৃত হয়েছে—এক-এক সময় প্রায় অকারণেই ; মনে করিয়ে দিতে হবে না যে 'কী জানি', 'কে জানে', 'না জানি' প্রভৃতি সমাবেশ তাঁর শব্দরচনার মধ্যে সবচেয়ে ক্লান্তিহীন, যে এই অস্পষ্ট ব্যাকুলতাই তাঁর কাব্যকে সেই আস্বাদ দিয়েছে যাকে বিশেষভাবে রাবীন্দ্রিক ব'লে আমরা চিনতে পারি। 'নিশীথে কী কথা ব'লে গেলো/কী জানি, কী জানি'—ঠিক এই রকম সূচিমুখ অস্পষ্টতা

অধিকতর যুক্তিনির্ভর য়োরোপীয় ভাষায় সম্ভব না-হ'লেও, পশ্চিমী রোমান্টিক কাব্যে তুলনীয় মনোভাব আমরা অনেক পেয়েছি। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে মানুষের মনের প্রক্রিয়ায় সত্যি কিছু অহেতুক হয় কিনা, এবং কবিরা যখন তাঁদের পুলক অথবা বিষণ্ণতাকে 'অকারণ' ব'লে ঘোষণা করেন, সেটাকে আমরা আক্ষরিক অর্থে, না কি উৎপ্রেক্ষা হিশেবে গ্রহণ করবো।

রোমান্টিক কবিরা দূরপ্রেমিক; বৈষ্ণব কবিদের মতো, কিন্তু কিছুটা ভিন্ন অর্থে, তাঁরা 'ঘরকে বাহির ও বাহিরকে ঘর' করেছেন—কিংবা কোনোখানেই বাসা বাঁধেননি। পার্নেসিয়ান, সিম্বলিস্ট, প্রি-র‍্যাফেলাইট—নাম যা-ই হোক না—টেনিসন ও ইংরেজ 'চার্টিস্ট'দের বাদ দিয়ে সমগ্র উনিশ শতকের কবিতাই এই লক্ষণদ্বারা আক্রান্ত। যেমন পেত্রার্কার আগে, নিছক কৌতূহলবশত, কেউ কোনো পর্বতে আরোহণ করেনি, তেমনি অন্য কোনো যুগে, নিরন্তর দিগন্তরেখা দেখেও, মানুষ এমন ক'রে দিগন্তকে ভালোবাসেনি, ভালোবাসেনি পাহাড়ের ওপার বা সমুদ্রের অন্য তীর। 'জীবনকেন্দ্রে গ্রামের বদলে নগর, সমাজে স্থিতির বদলে অস্থৈর্য এলে এমনিই হয়'—এই ব্যাখ্যায় তৃপ্ত হ'তে পারি না আমরা, কেননা আথেন্স বা রোমেও নাগরিক জীবন ছিলো, রোমের ছিলো বহু বৈদেশিক সংস্রব, কিন্তু সাহিত্যে এই দূরতৃষ্ণা ছিলো না। কিংবা, রোমান্টিকদের 'বিরুদ্ধে' যীশুর এই অনুজ্ঞা উপস্থিত ক'রেও লাভ নেই যে প্রতিবেশীকে ভালোবাসতে হবে, কেননা নিকটের প্রতি ঈর্ষা যদি মানুষের একটি বৃত্তি হয়, অপরিচিতের প্রতি অবিশ্বাসও তা-ই। রোমান্টিকেরা, সন্দেহ নেই, দূরকে ভালোবেসে মানুষের সংবেদনার পরিধি বাড়িয়ে দিয়েছেন, খুলে দিয়েছেন অসীমের দিকে একটি বাতায়ন। এই দূর, দেশে বা কালে বাস্তব আকার পেয়েছে মাঝে-মাঝে: প্রাচীন গ্রীস, খৃষ্টান মধ্যযুগ, ইটালি, আফ্রিকা, আমেরিকা, ভারত—এরা প্রত্যেকে, কোনো-না-কোনো সময়ে, ধারণ করেছে সেই রোমান্টিক আকাঙ্ক্ষাকে, আসলে যার কোনো আধার নেই। আধার নেই—কেননা ইতিহাসের কোনো অধ্যায়ে, বা কোনো ভৌগোলিক মণ্ডলে, হৃদয়ের 'আদর্শ'কে খুঁজে পাওয়া যায় না, কল্পলোক কল্পনাতেই থেকে যায়; শেষ পর্যন্ত থাকে শুধু গতিবেগ, শুধু

সন্ধান, চাঞ্চল্য, অস্থিরতা। ওভিদের বিখ্যাত উক্তি, 'অজানাকে কেউ ভালোবাসতে পারে না'*—এই ক্লাসিক সূত্রের সম্পূর্ণ প্রতিবাদ ক'রে রোমান্টিকেরা তারই জয়ধ্বনি তুললেন যা অজানা ও অসীম, অনির্ণেয় ও অপ্রাপণীয়। যা সীমিত, তাকে শাতোব্রিয়াঁর নায়ক কোনো মূল্য দেয় না, এক 'অজানা' তাকে নিরন্তর তাড়না করে। 'আমি বাসনায় দগ্ধ হচ্ছিলাম,' রুসো তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'কিন্তু বাসনার কোনো সুস্পষ্ট লক্ষ্য ছিলো না।' এই মনোভাবের চরম পরিণতি কোনখানে তাও রুসোরই একটি মুখের কথায় ধরা পড়েছে: 'যা নেই তা ছাড়া আর-কিছুই সুন্দর নয়।'

শুধু যদি আমরা চিন্তা করি যে রোমান্টিক কাব্যে বায়ু অথবা ঝটিকা কত বার এবং কত বিচিত্রভাবে স্থান পেয়েছে, তাহ'লেই আমাদের সন্দেহ থাকে না যে গতিসাধনা রোমান্টিকতার একটি প্রধান লক্ষণ। ওঅর্ডস্বার্থের 'ইমর্টেলিটি', কোলরিজের 'ডিজেকশন', শেলির 'ওয়েস্ট উইণ্ড' ও রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষশেষ'—এই চারটি প্রতিভূস্বরূপ কবিতা, বাতাসকে অবলম্বন ক'রেই, তাদের আবেগের চাপ সহ্য করতে পেরেছে। অন্যান্য প্রিয় চিত্রকল্পের মধ্যে নৌকো বা জাহাজ উল্লেখ্য, আর স্রোত, নির্ঝর বা নদী। তিনটি যাত্রার কবিতা অক্ষয়ভাবে মুদ্রিত আছে আমাদের মনে: বোদলেয়ারের 'ভ্রমণ', র‍্যাঁবোর 'মাতাল তরণী', ও রবীন্দ্রনাথের 'নিরুদ্দেশ যাত্রা।' নানা রূপে ভ্রমণে আমরা অভিজ্ঞ হয়েছি: স্কটে ঐতিহাসিক, বায়রনে ও শাতোব্রিয়াঁতে ভৌগোলিক, কোলরিজে আধ্যাত্মিক ও অতিপ্রাকৃত, বোদলেয়ারে ভৌগোলিক ও আধ্যাত্মিক। আর রবীন্দ্রনাথের

* ওভিদের 'বিষাদ' কাব্যে যে-কষ্ট প্রকাশ পেয়েছে, বা 'মেঘদূতে'র যক্ষের মুখে যে-অশ্রুল বিলাপ আমরা শুনতে পাই, তার বিষয়ে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে রোমে অথবা অলকায় প্রত্যাবর্তনমাত্র তার চিহ্ন থাকবে না। কিন্তু রোমান্টিক কবি নিজেকে অনুভব করেন আদিস্বর্গ থেকে নির্বাসিত ব'লে—শুধুমাত্র কোনো রাজধানী বা ভুজবন্ধ থেকে নয়। তাই, নিজে লাতিন সংস্কৃতির প্রেমিক ও উত্তরাধিকারী হ'য়েও, বোদলেয়ার বলতে পারেন:

'বঞ্চিত হ'য়ে লাতিন স্বর্গ থেকে
কাঁদবো না।' ('অনুকম্পায়ী ত্রাস')

ওভিদের মতো কোনোদিন কাঁদবো না।' ('অনুকম্পায়ী ত্রাস') ওভিদের মতো কোনোদিন কাঁদবো না।

সব কবিতাকে একত্র ক'রে নিয়ে 'ভ্রমণ' নাম দিলে ভুল হয় না; 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' থেকে 'পূরবী'র 'ঝড়' পর্যন্ত এক অবিরাম আন্দোলনে আমরা প্রস্তুত হচ্ছি; ঢেউ উঠছে, ঢেউ পড়ছে; ঔপনিষদিক ভারত, কালিদাসের কাল, মোগল-পাঠানের ভারত, বহুলক্ষণযুক্ত ভৌগোলিক পৃথিবী—এক-একটি স্তম্ভ রচনা ক'রে দিয়ে একে-একে এরা স'রে যাচ্ছে; আর যা স্থায়ী, যা অনবরত ও অপ্রতিহত, যা তাঁর উদ্‌ভ্রান্তিজনক বৈচিত্র্যের মধ্যে ভক্ত পাঠকের আশ্রয়স্বরূপ, তারই নাম তিনি যৌবনে দিয়েছিলেন 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'। লক্ষণীয়, ঐ কবিতার যাত্রা শুধু নিরুদ্দেশ নয়, রহস্যময় কাণ্ডারিণীটি বিদেশিনী। এবং সেই নারীও 'বিদেশিনী', যাকে—আসলে চেনেন না ব'লেই—কবি চেনেন ব'লে আপন মনে অনুমান করেন, 'শারদপ্রাতে বা মাধবীরাতে' মাঝে-মাঝে যাকে দেখা যায়, আর যার কাছে, শেষ পর্যন্ত, অতিথির অধিক মর্যাদা মেলে না। 'ভুবন ভ্রমিয়া শেষে/এসেছি নূতন দেশে/আমি অতিথি তোমারি দ্বারে/ওগো বিদেশিনী'—এই পংক্তিগুলিতে একাধিক ইঙ্গিত বিস্ফুরিত; 'ভুবনভ্রমণ' শেষ ক'রে যদি 'নূতন' দেশে আসা যায়, তার মানে সেই 'দেশ' পৃথিবীর বাইরে, এবং যা পৃথিবীর বাইরে তার অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দিগ্ধ না-হ'য়ে উপায় নেই। 'আমি অতিথি তোমারি দ্বারে—' অতিথি, অর্থাৎ অস্থায়ী আগন্তুক; এবং সে 'দ্বারে' মাত্র এসে দাঁড়িয়েছে, প্রার্থনা করছে প্রবেশের অধিকার, সে-প্রার্থনা পূরণ ক'রে দ্বার মুক্ত হবে কিনা তাও অনিশ্চিত। এবং, বলা বাহুল্য, 'বিদেশিনী' শব্দটিতেই এক গভীর, গম্ভীর অপরিচয়ের দ্যোতনা আছে; গন্তব্য যেমন অজানা, প্রেমাস্পদাও তেমনি অনির্ণেয়। আমরা অবাক হই না, যখন স্থিতিশীল হিন্দু সমাজকে বিদীর্ণ ক'রে এই কবি বাঁশির মতো ব'লে ওঠেন: 'আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী'; বা, আরো কিছুকাল পরে, ঘোষণা করেন 'ঝঙ্কারসমদমত্ত বলাকা'র উৎকাঙ্ক্ষা: 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।'

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

কবিতাভবন, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৯ থেকে প্রকাশিত ও ১৪১ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-১৩, মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস প্রাইভেট লিমিটেড-এ মুদ্রিত।
সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রক: বুদ্ধদেব বসু

KAVITA

(*Poetry*)

Vol. 23, No. 3

Serial No. 97

Yearly Rs. 4/-, or 6s. 6d. or $ 1. 50

Rupee one per copy

এক টাকা

Published quarterly at Kavitabhavan, 202 Rashbehari Avenue, Calcutta 29, India

Editor & Publisher: BUDDHADEVA BOSE

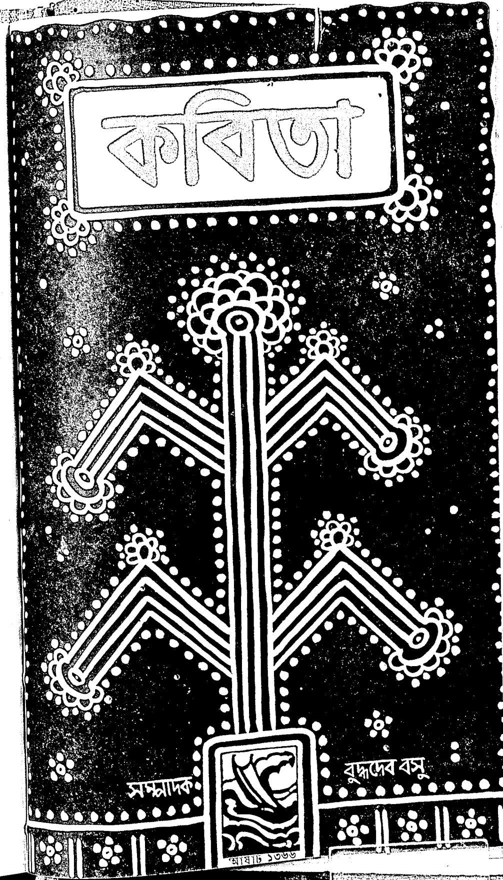
কবিতা
সম্পাদক
বুদ্ধদেব বসু
আষাঢ় ১৩৬৬

কবিতা

আষাঢ়, ১৩৬৬

— এই সংখ্যায় —

বরিস পাস্টেরনাক

প্রসঙ্গে

পত্রবিনিময়

অমিয় চক্রবর্তী ও বুদ্ধদেব বসু

—

শার্ল বোদলেয়ার ও আধুনিক কবিতা

বুদ্ধদেব বসু

—

কবিতা

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, আলোক সরকার, কবিতা সিংহ, তারাপদ রায়, বিকাশ দাশ, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, মণিভূষণ ভট্টাচার্য, রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী, শামসুর রাহমান, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, গোপাল ভৌমিক, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, কমলেশ চক্রবর্তী, অর্চন দাশগুপ্ত

—

অনুবাদ

আতুর র‍্যাঁবোর চারটি কবিতা ... শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

পোল এলুয়ারের তিনটি কবিতা ... গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

—

শিশিরকুমার ভাদুড়ী ... অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু

সুন্দর কেশগুচ্ছ

বেঙ্গল কেমিক্যালের

ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল

কেশমূল সতেজ রাখে ও কেশের শ্রীবৃদ্ধি করে

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা · বোম্বাই · কানপুর

একটি নতুন ধরনের

স্কুল

প্রতিভা বসু

পরিচালিত

শিশুবিতান

১১২/১, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড,

কলকাতা ২৬

নার্সারি থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত

ছাত্রছাত্রী নেয়া হয়

অনুসন্ধানের জন্য টেলিফোন

৪৬-১২০৪

'নাভানা'র বই

জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা টা. ৪·০০

বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা টা. ৪·০০

শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর ॥ বুদ্ধদেব বসু টা. ২·৫০

পালা-বদল ॥ অমিয় চক্রবর্তী টা. ২·০০

কঙ্কাবতী ॥ বুদ্ধদেব বসু টা. ৩·০০

দীপ্তি ত্রিপাঠীর

আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়

পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে।

নাভানা

৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত

আধুনিক বাংলা কবিতা

রবীন্দ্রনাথসহ সাতান্ন জন বিশিষ্ট আধুনিক কবির দু'শো একটি কবিতা এই মনোজ্ঞ সংকলনে সংগৃহীত হয়েছে। আধুনিক কবিতা বিষয়ে বুদ্ধদেব বসুর মূল্যবান ভূমিকাটি গ্রন্থের অন্যতম আকর্ষণ। চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল। দাম—৬·০০

নরেন্দ্র দেব ও রাধারাণী দেবী সম্পাদিত

কাব্য-দীপালি

'কাব্য দীপালি' প্রবীণ ও নবীন সমুদয় বিশিষ্ট কবির সুনির্বাচিত কবিতার বৃহৎ সংকলন-গ্রন্থ। বহুদিন পরে পরিবর্তিত নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল। দাম—৭·০০

সম্প্রতি প্রকাশিত অন্যান্য বই

অন্নদাশঙ্কর রায়
জাপানে ৬·০০

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য
প্রেমতারা ৪·০০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
বীরেশ্বর বিবেকানন্দ ৫·০০

ধীরাজ ভট্টাচার্য
মন নিয়ে খেলা ৫·০০

সুধীরচন্দ্র সরকার
পৌরাণিক অভিধান ৭·০০

রাজশেখর বসু
মহাভারত ১২·০০

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট : কলিকাতা : ১২

কবিতা

বর্ষ ২১

ও

বর্ষ ২২-এর

সম্পূর্ণ সেট

পাওয়া যাচ্ছে।

বহু মূল্যবান কবিতা

অনুবাদ-কবিতা

ও

প্রবন্ধের সঞ্চয়ন।

প্রতি সংখ্যা ১৷০

প্রতি সেট পাঁচ টাকা

মাশুল স্বতন্ত্র

কবিতা

ত্রৈমাসিক পত্র

আশ্বিন, পৌষ, চৈত্র ও আষাঢ়ে প্রকাশিত। * আশ্বিনে বর্ষারম্ভ, বৎসরের প্রথম সংখ্যা থেকে গ্রাহক হ'তে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যা এক টাকা, বার্ষিক চার টাকা, রেজিস্টার্ড ডাকে ছয় টাকা, ভি. পি. স্বতন্ত্র। * ষাণ্মাসিক গ্রাহক করা হয় না। * চিঠিপত্রে গ্রাহক-নম্বরের উল্লেখ আবশ্যিক। * ঠিকানা-পরিবর্তনের খবর দয়া ক'রে সঙ্গে-সঙ্গে জানাবেন, নয়তো অপ্রাপ্ত সংখ্যা পুনরায় পাঠাতে আমরা বাধ্য থাকবো না। অল্প সময়ের জন্য হ'লে স্থানীয় ডাকঘরে ব্যবস্থা করাই বাঞ্ছনীয়। * অমনোনীত রচনা ফেরৎ পেতে হ'লে যথাযোগ্য স্ট্যাম্পসমেত ঠিকানা-লেখা খাম পাঠাতে হয়। প্রেরিত রচনার প্রতিলিপি নিজের কাছে সর্বদা রাখবেন, পাণ্ডুলিপি ডাকে কিংবা দৈবাৎ হারিয়ে গেলে আমরা দায়ী থাকবো না। * সমস্ত চিঠিপত্রাদি পাঠাবার ঠিকানা:

কবিতাভবন

২০২ রাসবিহারী এভিনিউ

কলকাতা ২৯

স্বরবিতান-সূচীপত্র

রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি সন্ধানের পক্ষে অপরিহার্য

রবীন্দ্রসংগীতের সমুদয় স্বরলিপি সংকলন করার জন্য স্বরবিতানের কল্পনা। এ পর্যন্ত প্রকাশিত স্বরবিতানের ছাপ্পান্নটি খণ্ডের কোন্ গ্রন্থে কোন্ গানের স্বরলিপি আছে তা জানার সুবিধার জন্য এই সূচীপত্র প্রকাশিত হল।

মূল্য ০·৩০ নয়া পয়সা।

সাধারণ বুকপোস্টে ০·৪৫ নয়া পয়সা।

রেজেস্ট্রি ডাকে ০·৯৫ নয়া পয়সা।

স্বরবিতান

রবীন্দ্রসংগীতের সমুদয় স্বরলিপি স্বরবিতানগ্রন্থের খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে—

যা পূর্বে গ্রন্থে বা সাময়িক পত্রে মুদ্রিত

যা এখনো পাণ্ডুলিপি-আকারেই বর্তমান

যা প্রামাণিক সূত্রে সংগ্রহ করা সম্ভব

স্বরবিতান-গ্রন্থমালার খণ্ডে খণ্ডে যথোচিত পর্যায়ে তা ছাপা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ছাপ্পান্নটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিটি খণ্ডের মূল্য স্বতন্ত্র।

একত্রে মূল্য ১৭৫·০০ টাকা

চিঠি লিখলে পূর্ণ বিবরণ জানানো হবে

গীতবিতান

তিন খণ্ড গীতবিতানে রবীন্দ্রনাথ-রচিত যাবতীয় গান মুদ্রিত হয়েছে। এই গ্রন্থে উক্ত তিন খণ্ড একত্র গ্রথিত। প্রতিটি গানের প্রথম ছত্রের বর্ণানুক্রমিক সূচী এবং গানগুলির স্বরলিপি স্বরবিতানের কোন্ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে তার নির্দেশ দেওয়া আছে।

রবীন্দ্র-প্রতিকৃতি ও বহু চিত্র সম্বলিত অখণ্ড গীতবিতান কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ১৬·০০ টাকা।

বিশ্বভারতী

৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭।

ঐক্য ও সমন্বয়ের সাধনায় ...

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের—বহুর মধ্যে সমন্বয়-সাধনের সকল সাধনাই আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষের মর্মবাণী। এই মর্মবাণীই নিহিত রয়েছে তার ব্যাপক, বিচিত্র, কখনও বা ভিন্নধর্মী সংস্কৃতি ও শিল্পকলার মধ্যে।

হিমালয়ের যে পার্বত্য পৌরুষ বম্বম নৃত্যে উদ্দীপিত, সমতলবাসিনী রসকলি-লাঞ্ছিত তরুণীদের রাসনৃত্যে ও মৃদঙ্গের বোলে বা বাউল ও কীর্তনে তা স্তিমিত ও ভাবনত। উড়িষ্যার ছউ বা মধ্য ভারতের নাগাড়ি নৃত্যে, গুজরাটের গরবা বা দক্ষিণ ভারতের ভারতনাট্যম্ ও কথাকলি নৃত্যে এই বিচিত্র ভিন্নধর্মী সংস্কৃতিরই আত্মপ্রকাশ।

যোগাযোগ ব্যবস্থায় এই বিচিত্র, ভিন্নধর্মী সংস্কৃতির ঐক্য ও সমন্বয় সাধনের প্রয়াসই রূপায়িত।

পূর্ব রেলওয়ে

কবিতা
আষাঢ় ১৩৬৬
বর্ষ ২৩, সংখ্যা ৭
ক্রমিক সংখ্যা ৯৮

শার্ল বোদলেয়ার ও আধুনিক কবিতা

(পূর্বানুবৃত্তি)

৬

এলিয়টের গুরু নব্যক্লাসিক আর্ভিং বাবিট, কতিপয় বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠ ক'রে, এই গতিস্পৃহাকে 'ঘূর্ণিপূজা' নামে ব্যঙ্গ করেছিলেন। গতি আছে, গন্তব্য নেই; বাসনা আছে, তার আধার নেই; প্রেম আছে, কিন্তু প্রেমের পাত্রকে শনাক্ত করা যায় না—এই ভাবটিতে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন, আধ্যাত্মিকতা নয়, অবমানবিক উন্মাদনা। তিনি লক্ষ করতে ভুলেছিলেন যে গতিস্পৃহা অত্যন্ত তীব্র হ'য়ে উঠলে সেই সঙ্গে স্থিতিলিপ্সা অনিবার্য, এবং রোমান্টিকতার কোনো কোনো চরম মুহূর্তে তা-ই ঘটেছিলো। রবীন্দ্রনাথে—যদি 'গীতাঞ্জলি'-পর্যায় ছেড়েও দিই—এর নিদর্শনের অভাব নেই; 'চিত্রা'য় তিনি সেই সত্তার উপাসক, যা বহির্জগতে বহুবিচিত্র এবং অন্তরে এক ও অন্তরতম; বেদূইনের মাতাল মধ্যাহ্নের অনতিপরেই সন্ধ্যালগ্নে তিনি চান নতশিরে শান্তি ও মৌনতা; তাঁর 'নিষ্ফল কামনা'র দাবদাহের সমান্তর সেই 'ধ্যান', যাতে 'সমস্ত প্রাণ মম/ চাহিয়া রয়েছে নিমেষনিহত একটি নয়ন-সম।'* 'মানসী'র 'ধ্যান' প'ড়ে অসম্ভব নয় বোদলেয়ারের 'স্তোত্র' মনে পড়া, 'চিত্রা'র 'সন্ধ্যা' প'ড়ে 'আত্মহত্যা';

* কথাটাকে 'সরল গদ্যে' বলতে হ'লে আমরা রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণপঞ্জিগুলির দ্বারস্থ হবো: সেখানে গতি ও স্থিতি সাকার হয়েছে য়োরোপে ও ভারতবর্ষে; এবং লেখকের মনে পশ্চিমী জঙ্গমতার প্রতি আকর্ষণ যেমন দুর্বার, তেমনি দূরপনেয় বাংলার নিস্তরঙ্গ গৃহকোণের জন্য আকাঙ্ক্ষা। তাঁর বহু রচনাই এই দুই প্রবল উন্মুখতার দ্বন্দ্বপ্রসূত। হয়তো এমন প্রশ্ন করাও অবান্তর হয় না তাঁর 'বিদেশিনী' কেন 'সিন্ধুপারে' থাকেন, আর 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র তরণীটি কেন পশ্চিমগামী। বোটে বাসকালীন কোনো চোখে-

কিন্তু বোদলেয়ারের কবিতায় সর্বদাই দু-একটি কাঁটা লুকোনো থাকে ব'লে আমরা রক্তপাতে তার বেদনা উপলব্ধি করি, আর রবীন্দ্রনাথ যেহেতু অবিরল-ভাবে মসৃণ ও কমনীয়, তাই, আরামে ম'জে, আমরা অনেক সময় লক্ষ করি না তিনি কী বলছেন। একই কারণে, এই গতি ও স্থিতির দ্বন্দ্ব বোদলেয়ারে অনেক বেশি প্রখর; রবীন্দ্রনাথে দুই বিপরীত ভাবের কবিতাগুলিকে আমরা স্পষ্টভাবে ভাগ ক'রে নিতে পারি, দুয়ের মধ্যে মিশ্রণ ঘটে না, তাঁর মন যখন যেদিকে উন্মুখ হয় তখনকার মতো সেখানেই আত্মসমর্পণ করে; কিন্তু বোদলেয়ার তাঁর সমগ্র রচনায়, আর কখনো বা একই কবিতার মধ্যে, বুঝিয়ে দেন যে তাঁর পক্ষে গতি যেমন নিরন্তর মোহময়, স্থিতিও তেমনি ক্ষমাহীনরূপে আহ্বানকারী, এবং উভয় আকর্ষণ তাঁর মনে যুগপৎ বিরাজমান। 'সিন্ধু ও মানব' কবিতায় অবিরাম আন্দোলনের ছবিটিকে একই সঙ্গে সুন্দর ও মারাত্মক ব'লে আমরা অনুভব করি, একই বিড়াল তাঁর মুগ্ধতা কাড়ে 'মাথার মধ্যে আনাগোনা'র জন্য ও 'ঠাণ্ডার ভয়ে ঘরে থাকে' ব'লে, আর প্যাঁচারা প্রশংসা পায় যেহেতু তারা নিশ্চল ও আত্মদর্শী :

জ্ঞানীর চোখ, তা দেখে যায় খুলে,
হাতের কাছে যা আছে নেয় তুলে,
থামায় গতি, অবুঝ আন্দোলন;

দেখা সূর্যাস্তের স্মৃতি নিশ্চয়ই কাজ করেছে তার মধ্যে, কিন্তু আমরা কি অত্যন্ত নিশ্চিত হ'তে পারি যে কোনো য়োরোপগামী জাহাজের স্মৃতিও কাজ করেনি, বা 'যাত্রা' বলতেই অস্পষ্টভাবে পশ্চিমী গতিধর্ম মনে পড়েনি তাঁর? বাংলা সাহিত্যে প্রথম 'য়োরোপীয়' রবীন্দ্রনাথ—এই সত্যের একটি ঘোষণা হিশেবেও 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' পাঠ করা অসম্ভব নয়। সত্য, বৃদ্ধ বয়সে লেখা 'যাত্রী' গ্রন্থের কয়েক লাইন কবিতায় ('রথীরে কহিল গৃহী উৎকণ্ঠায় উর্ধ্বস্বরে ডাকি') তিনি আক্ষরিকভাবে নিরুদ্দেশ যাত্রার প্রতিবাদ করেছিলেন; কিন্তু সেই রচনা গতির বিরুদ্ধে ততটা নয় যতটা প্রগতি ও প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে; রোমান্টিক গতিপ্রবণতা থেকে তিনি যে কখনোই মুক্ত হননি সমকালীন 'পূরবী' গ্রন্থে তার বহু প্রমাণ আছে। সেই গ্রন্থে ঝ'রে-পড়া শিউলিরা শুধু 'চলো, চলো' বলে, ঝড় বলে 'তুমি পান্থ, আমি পান্থ, জয়, তব জয়।' আর, যেন বৃদ্ধ কবিকে মন্থন ক'রে, উচ্ছিত হয় 'বাসা'র জন্য অভিলাষ। যে-মানুষ বাসা পেয়েছে, সে বাসা নিয়ে কবিতা লেখে না।

এই প্রসঙ্গে বোদলেয়ার ও রবীন্দ্রনাথকে বন্ধনীভুক্ত করেছি ব'লে কেউ যেন না ভাবেন যে এ-দুয়ের বিপুল বৈসাদৃশ্য বিষয়ে আমি চিন্তা করিনি। কিন্তু সেখানেই সাদৃশ্য সবচেয়ে ব্যঞ্জনাময় যেখানে আকারে-প্রকারে শুধু পার্থক্যই ধরা পড়ে।

হায়, মানুষ, ছায়ার মোহে পাগল,
শাস্তি তার এই তো চিরন্তন—
কেবল চায় বদল, বাসা-বদল! ('প্যাঁচারা')

এবং লক্ষণীয় যে বোদলেয়ারের সুন্দরীরা যদিও চঞ্চলা, নর্তকী সাপিনী বা তরঙ্গাহত তরণীর সঙ্গে তুলনীয়, যদিও প্রায়ই আমরা তাদের দেখতে পাই ঠাণ্ডা প্যারিসে অথবা রৌদ্রময় প্রাচ্য পুলিনে পথচারিণীরূপে, তবু তাঁর সৌন্দর্য এক পাষাণপ্রতিমা, স্তব্ধ, হিম ও ধবল, সব আবেগজনিত হৃৎস্পন্দনের অতীত। সুদূরের সেতুবন্ধ তাঁর রূপসীরা, ভ্রমণের উদ্বোধিনী, তাদের সংসর্গে কবি চ'লে যাচ্ছেন 'মোহন মণ্ডলে', শিথিল এশিয়া ও প্রদীপ্ত আফ্রিকায়, 'সুদূর, অনুপস্থিত ও লুপ্তপ্রায়' এক জগতে, কিন্তু সেই সব রূপের যিনি আবহমান অন্তঃসার, তিনি কবিকে বলছেন : 'পাছে রেখা স্রস্ত হয়, ঘৃণা করি সব চঞ্চলতা।' বোঝা যাচ্ছে, গতির অন্তরে স্থির কেন্দ্রের ধারণাটি বস্টনীয় ব্রাহ্মণবংশের একাধিকার নয়, বোদলেয়ারে তা সোচ্চার, এবং যে-নবোদ্গত ভারতীয় কবিকে আর্ভিং বাবিট ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছিলেন, এমনকি সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেও তা সুস্পষ্ট।

'নিরন্তর আমার মনে হয় যে আমি যেখানে আছি সেখানে ছাড়া অন্য যে-কোনো দেশে আমি সুখী হ'তে পারি।' কে বলছেন? রোমান্টিকতার জনক জাঁ-জাক নন, ঐতিহাসিকেরা যাঁকে রোমান্টিকতার অবসান ব'লে চিহ্নিত করেন, সেই শার্ল বোদলেয়ার। কিন্তু, 'যা নেই তা ছাড়া আর-কিছুই সুন্দর নয়', এই কথার প্রতিধ্বনি কি শোনা যাচ্ছে না? কিন্তু একটু অপেক্ষা করা যাক, আর-একবার পড়া যাক সেই গদ্যকবিতাটি, উপরোক্ত পংক্তিটি যার অংশ, বোদলেয়ার যার শিরোনামা দিয়েছিলেন ইংরেজি ভাষায় : 'পৃথিবীর বাইরে যে-কোনোখানে'। 'জীবনটা এক হাসপাতাল যেখানে প্রত্যেক রোগী অবিরাম চায় শয্যা-বদল। কারো ইচ্ছে চুল্লির উল্টোদিকে শুয়ে কষ্ট পায়, কেউ ভাবছে জানলার ধারে গেলে নিশ্চয়ই সেরে উঠবে।' এই মুখবন্ধেই ব'লে দেয়া হ'লো—যা 'প্যাঁচারা' কবিতাতেও বলা আছে—যে মানুষের মনে বাসা-বদলের ইচ্ছেটা যেমন দুর্মর তেমনি

নির্বোধ। অন্য এক ফরাশি বচন মনে প'ড়ে যাচ্ছে আমাদের : 'মানুষের সব দুর্ভাগ্যের একটিই কারণ : সে তার ঘরে টিকতে পারে না।' পাস্কাল, মনে হ'তে পারে, রুসো জন্মাবার অনেক আগেই রুসোর উত্তর লিখে গিয়েছিলেন; কিন্তু আসলে এই দুটি উক্তি পরস্পরের পরিপূরক; আমাদের অভিজ্ঞতায় এই দুটি ভাবই সমান সত্য; আমাদের হৃদয়ের তারা মৌলিক গুণ; আমাদের জীবনে তারা প্রতিবেশী ও পরস্পর-প্রবিষ্ট। এবং বোদলেয়ারের কবিতাটি এই দুই বিপরীতের টানে তীব্র হ'য়ে আছে; দূর, অজানা ও আশ্চর্য যার মধ্যে মূর্ত হ'য়ে উঠলো সেই ভৌগোলিক সুখধামগুলির বর্ণনা আমাদের শুধু প্রস্তুত ক'রে তুলছে সর্বশেষ ও সর্বনাশী বিস্ফোরণটির জন্য : 'যে-কোনোখানে! যে-কোনোখানে! পৃথিবীর বাইরে যে-কোনোখানে!' কিন্তু—কোথায়? পৃথিবীর বাইরে না-গেলে যার তৃপ্তি নেই তার তৃষ্ণা কোথায় মিটবে?

একটি গম্ভীর ও ভয়াবহ শব্দ আমাদের ঠেলে উঠে আসছে, হাওয়ায় হানা দিচ্ছে 'ফ্ল্যর দ্য মাল' এর সেই মহান কবিতাগুচ্ছ, যার নামপত্রে কবি লিখে দিয়েছিলেন : মৃত্যু। কী আছে পৃথিবীর বাইরে, জীবনের বাইরে? যে-সব কবি শাস্ত্রসম্মত ঈশ্বরে বিশ্বাসী, বা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে আস্থাবান, এই প্রশ্নের উত্তর তাঁদের কাছে স্বতঃসিদ্ধ। তাঁদের জন্য অপেক্ষা ক'রে আছে স্বর্গরাজ্য, সুরলোক অথবা ব্রহ্মলোক; ব্রাউনিঙের জন্য মৃতা প্রিয়ার বাহুবন্ধ; ব্রাউনিং ও রবীন্দ্রনাথের জন্য সেই সব সাধনা, যা জীবনে সারা হ'তে পারেনি। মৃত্যু মানে আদি উৎসে প্রত্যাবর্তন, অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার পুনর্মিলনের মুহূর্তটির নামই মৃত্যু—এই ধারণার সঙ্গে পরিচয়ের জন্য টেনিসনের 'ক্রসিং দি বার' ও 'গীতাঞ্জলি'র ১১৬ নম্বর কবিতাটি পড়াই যথেষ্ট। এর 'বিরুদ্ধে' আমরা দাঁড় করাতে পারি মরণমোদিত পূর্ব-রোমাণ্টিকদের, যাঁদের কাছে মৃত্যু দেখা দেয় 'নিদ্রার মতো সুন্দর' হ'য়ে, প্রেয়সীর মতো কাঙ্ক্ষণীয়, প্রেম ও মৃত্যুকে যাঁরা সম্পৃক্ত ক'রে, এমনকি প্রায় এক ক'রে দেখেছেন, কিংবা জর্মান কবি প্লাটেন-এর মতো যাঁরা অনুভব করেছেন যে 'একবার সৌন্দর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলে

মৃত্যুর কাছে উৎসর্গিত হতে হয়।'* বোদলেয়ারে দুই দিকেরই লক্ষণ আছে, কিন্তু কোনো দিকেই তিনি পুরোপুরি ধরা দেন না। তাঁর কাছেও মৃত্যু একটি পরম নেশা, কিন্তু সে-নেশা শুধু ইন্দ্রিয়বিলাসের নয়, তাতে মিশে আছে মানবাত্মার দুরন্ত আবিষ্কারধর্মিতা। ধর্মকে পবিত্র ও যীশুকে 'তর্কাতীত দেবতা' ব'লে স্বীকার ক'রেও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি শাস্ত্রোক্ত ধ্রুবলোকের দিকে তাকিয়ে থাকা, বরং 'এক অদ্ভুত মানুষের স্বপ্ন' নামক নিষ্করুণ কবিতায় তিনি রূঢ়ভাবেই বলেছেন যে মৃত্যুর পরে আর-কিছু নেই—কিছুই নেই।

ঘটলো ভীষণ মরণ, এবং সেই উষায়
স্তব্ধ, আবৃত, বিস্ময়হীন আমার মন;—
স'রে গেলো পট, আমি তবু ব'সে প্রত্যাশায়।

কিন্তু—আরো কথা আছে। 'পৃথিবীর বাইরে' একমাত্র যে-সত্য বিষয়ে আমরা নিশ্চিত হ'তে পারি তার বিষয়ে বোদলেয়ারের ভাবনা—বা গবেষণা—আরো বিস্তীর্ণ। নিঃস্বের তা সান্ত্বনা ও ক্ষতিপূরণ, প্রেমিকের পক্ষে পুনরুজ্জীবনের আশা, শিল্পীর পক্ষে এক অতীন্দ্রিয় প্রতিশ্রুতি : এ-সব কবিতায় মৃত্যু যে-আসন পেয়েছে সেখানেই ব্রাউনিং ও রবীন্দ্রনাথ তাঁদের ঈশ্বরকে বসিয়েছেন। 'না-জেনে ধায় তোমার পানে/ সকল ভালোবাসা', 'গীতাঞ্জলি'র এই পংক্তিতে মৃত্যু ও ভগবানকে প্রায় অভিন্ন ক'রে তোলা হয়েছে, কেননা কিছুক্ষণ আগেই কবির প্রার্থনা আমরা শুনেছি : 'ধায় যেন মোর সকল ভালোবাসা/ প্রভু, তোমার পানে, তোমার পানে, তোমার পানে।' টেনিসনের মতো—প্রায় টেনিসনের অনুসরণে—রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তিম যাত্রায় মুক্তিদাতাকেই কর্ণধার ব'লে

* লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথ দুটি মনোভাবেরই অধীন হয়েছেন; কীটসের প্রতিধ্বনি ক'রে জীবনানন্দ দাশ যে-কথা লিখেছিলেন—'মৃত্যুরে ডেকেছি আমি প্রিয়ের অনেক নাম ধ'রে—' তা রবীন্দ্রনাথেরও হ'তে পারতো। 'মরণ' কবিতায় ('অত চুপি-চুপি কেন কথা কও') মৃত্যু প্রেয়সীরূপে কল্পিত; 'গীতাঞ্জলি'তেও এই ভঙ্গি নেই তা নয়, কিন্তু সেখানে মৃত্যুর অর্থ বদলে গেছে। 'ওগো আমার এই জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা/ মরণ, ওগো মরণ, তুমি কও আমারে কথা—' এখানে যা ধরা পড়েছে তা প্রেমের চাপে বিলীন হ'য়ে যাবার আবেগ নয়, ঈশ্বর যে আছেন, এবং মৃত্যুর পরে তাঁর মধ্যে নিমজ্জন সম্ভব, ধর্মের এই দুটি সূত্রই এখানে নিঃশব্দে স্বীকৃত।

ঘোষণা করেছেন; কিন্তু বোদলেয়ারের 'ভ্রমণ' কবিতায়—যাকে বলতে পারি মৃত্যুর মহিমায় উদ্ভাসিত এক জীবনবেদ—মানবজীবনের দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে অভিজ্ঞ হ'তে-হ'তে আমরা অকস্মাৎ মর্মাহত বিস্ময়ে উপলব্ধি করি যে এই মাতাল তরণীর যে হাল ধ'রে আছে সে আর-কেউ নয়—মৃত্যু, বৃদ্ধ, অমর ও সনাতন মৃত্যু। হাইনে তাঁর 'বিকিনি'তে মৃত্যুকে জীবনের গন্তব্যরূপে নির্দেশ করেছিলেন; বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে আমাদের জীবন —তাঁর কবিতাটির মতোই—এক বিরাট ঠাট্টা, যে কায়াকল্পের সন্ধানে বেরোলে কালসদনেই পৌঁছতে হবে। স্বভাবসিদ্ধ ব্যঙ্গপ্রবণতা এড়াতে পারেননি ব'লে হাইনের কবিতাটিকে আমরা একটি নীতিকথারূপে গ্রহণ ক'রে নিশ্চিন্ত হই, কিন্তু বোদলেয়ারে যেহেতু ব্যঙ্গের আভাসমাত্র নেই, তার বদলে আছে 'শহীদ ও ঘাতকে'র আবেশ, তাই তাঁর কবিতাটির অভিঘাত প্রচণ্ড, তা আমাদের নিয়ে যায়—নিশ্চিত মৃত্যুতে নয়—জীবন ও মৃত্যুর এক রহস্যময় সম্বন্ধসাধনে। জীবন ও মৃত্যুর বৈপরীত্যের বদলে বোদলেয়ার লক্ষ করেছেন এ-দুয়ের সহবাসিতা; জন্মের মুহূর্ত থেকে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যু ঘটছে আমাদের, বেঁচে থাকা নামক অবস্থাটাকে মৃত্যুরই একটা প্রক্রিয়া বলা যায়, তাকে আরো একটু কাছে না-টেনে কোনো কিছুই করতে পারি না আমরা, অতএব মৃত্যুই আমাদের সাধের তরণীর কাণ্ডারী। এই কথাটা একটা আদিসত্য, পূর্বযুগেও কবিদের মনে প্রতিভাত হয়নি এমন নয়; কিন্তু বোদলেয়ারে তা এমনভাবে সোচ্চার হয়েছে যে তারপর থেকে এই ধারণাটি আধুনিক চৈতন্যের অংশ হ'য়ে গেছে। বোদলেয়ারে যা রশ্মির মতো নিঃসৃত, তাকে আমরা নক্ষত্রের মতো জ্বলতে দেখি রিলকের কাব্যে, যেখানে মৃত্যু আমাদের অন্তর্ভূত এক বীজ, যাকে আমরা অনবরত লালন ক'রে ফলিয়ে তুলছি, এবং যা সুপক্ক হ'লে আমাদের বিদীর্ণ ক'রে বেরিয়ে আসবে। টমাস মান্-এর গুস্টাফে আশেনবাখ অকস্মাৎ ভ্রমণলালসায় চঞ্চল হ'য়ে উঠলো; জানলো না, তার সত্য বাসনা মৃত্যুর জন্য। এই অতল ও নামহীন লিপ্সাটি জীবনানন্দর আত্মঘাতী যুবকও অনুভব ক'রে গেছে। 'আরো এক বিপন্ন বিস্ময়/ আমাদের অন্তর্গত রক্তের

ভিতরে খেলা করে'; এবং রবীন্দ্রনাথও যৌবনে একবার লিখেছিলেন: 'ওরে মৃত্যু, জানি তুই আমার বক্ষের মাঝে/বেঁধেছিস বাসা।' কিন্তু 'গীতাঞ্জলি'তে রবীন্দ্রনাথ যখন 'জীবনবধূ'কে 'পতিব্রতা' ব'লে চিহ্নিত করলেন, যার সঙ্গে 'একটি শুভ দৃষ্টিপাতে' মৃত্যুর মিলন হবে, তখন, পূর্ববর্তী 'ওগো বর, ওগো বধূ' কবিতাটি স্মরণে রেখে, আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না 'মৃত্যু' এখানে কিসের নামান্তর।

মানুষের মনে সত্যি অকারণ কিছু আছে কিনা, এই প্রশ্নের মুখোমুখি হবার জন্য প্রস্তুত হয়েছি। রোমান্টিকের দুরন্ত বাসনা কিসের জন্য? কিছুতেই কেন তৃপ্তি নেই তার? 'পৃথিবীর বাইরে' কিসের সন্ধানে যেতে যায়? আকাঙ্ক্ষা তার অমেয়র জন্য, পরমের জন্য, অমরতার জন্য। তৃপ্তি নেই, কেননা সংরাগের চরম আনন্দ ও চরম নির্যাতন সহ্য ক'রেও, কাম, কোহল ও দুষ্ক্রিয়ার পরিশ্রমী সোপান পার হ'য়েও, এবং ত্যাগের, দুঃখের, প্রায়শ্চিত্তের কন্টকশয্যা বরণ ক'রেও, সে অমেয়কে, পরমকে, অমরতাকে লাভ করে না। কিন্তু তাই ব'লে আকাঙ্ক্ষা তার নষ্ট হয় না, বন্ধ হয় না সাধনা, নূতন থেকে নূতনতরতে অনবরত চলে তার সন্ধান—তার 'ভ্রমণ'। সেই নূতন, সেই নিত্য অজানা, সেই অবিরল-দূরে-স'রে-যাওয়া দিগন্ত—তারই মধ্যে বোদলেয়ার দেখেছেন মৃত্যুর সার্থকতা ও অন্তঃসার :

হে মৃত্যু, সময় হ'লো! এই দেশ নির্বেদে বিধুর।
এসো, বাঁধি কোমর, নোঙর তুলি, হে মৃত্যু প্রাচীন!
কাণ্ডারী, তুমি তো জানো, অন্ধকার অম্বর সিন্ধুর
অন্তরালে রৌদ্রময় আমাদের প্রাণের পুলিন।

ঢালো সে-গরল তুমি, যাতে আছে উজ্জীবনী বিভা!
জ্বালো সে-অনল, যাতে অতলান্তে খুঁজি নিমজ্জন!
হোক স্বর্গ, অথবা নরক, তাতে এসে যায় কী-বা,
যতক্ষণ অজানার গর্ভে পাই নূতন—নূতন! ('ভ্রমণ')

এই সঙ্গে 'আলোকস্তম্ভ' কবিতার শেষ স্তবকটি পাঠ করলে আমরা বুঝতে পারবো যে বোদলেয়ার—আর এখানেও তিনি ডস্টয়েভস্কির মতো—যাকে মূল্যবান ব'লে জেনেছেন, তা প্রাপ্তি নয়, অমৃতের জন্য আকাঙ্ক্ষা ও অন্বেষণ :

আর কী প্রমাণ আছে ? ভগবান, এ-ই তো পরম,
এ-ই তো নির্ভুল সাক্ষ্য আমাদের দীপ্ত মহিমার,
এই যে আকুল অশ্রু যুগে-যুগে করে পরিশ্রম
অবশেষে লীন হ'তে অসীমের সৈকতে তোমার !

এই 'প্রমাণ'গুলি, পাঠককে মনে করিয়ে দিতে চাই, চিত্রকলার বিবিধ নিদর্শন, রচিত শিল্পকর্ম, চৈতন্যের প্রসূন। কিন্তু রুবেন্স প্রমুখ মহাশিল্পীরা শুধু নন, বোদলেয়ারে এমন কেউ নেই—খুনে, মাতাল, লম্পট কিংবা অভাজন,* কেউ নেই যে চৈতন্যের দ্বারা আক্রান্ত ও পীড়িত নয়, ভাবনা যার অন্ত্রে-তন্ত্রে দংশন করেনি, কিংবা যার বিবেকের ভার প্রতিভূ-কবি বহন করছেন না। মানুষ দুঃখী, কিন্তু সে জানুক সে-দুঃখী ; মানুষ পাপী, কিন্তু সে জানুক সে পাপী ; মানুষ রুগ্ন, কিন্তু সে জানুক সে রুগ্ন ; মানুষ মুমূর্ষু, এবং সে জানুক সে মুমূর্ষু ; মানুষ অমৃতাকাঙ্ক্ষী, এবং সে জানুক সে অমৃতাকাঙ্ক্ষী : বোদলেয়ারের সমগ্র কাব্যে, যেমন ডস্টয়েভস্কির উপন্যাসে, এই বাণী নিরন্তর ধ্বনিত হচ্ছে। সকলে জানবে না, জানতে পারবে না বা চাইবে না ; কিন্তু কবিরা জানুন। এই জ্ঞানেই আধুনিক সাহিত্যের অভিজ্ঞান।

* ব্যতিক্রম শুধু নারীরা, কিন্তু নারী তো 'স্বাভাবিক', অর্থাৎ মনোহীন। 'ফ্লর দ্যু মাল' ও 'প্যারিস-স্প্লীন'-এ নারীদের উদ্দেশে বা বিষয়ে অনেক কবিতা আছে, কিন্তু নারীর কোনো স্বগতোক্তি নেই; একমাত্র '[illegible]' নামক গদ্যকবিতাটিতে ছাড়া, কোথাও নারীকে আমরা চিন্তা করতে শুনি না।

দুটি চিঠি

১ : বুদ্ধদেব বসুকে অমিয় চক্রবর্তী

বস্টন এয়ারপোর্ট
৯ই এপ্রিল ১৯৫৯

প্রিয়বরেষু,

টেকসাস-এর দিকে চলেছি,—আপনাকে তার আগে আমার গভীর হৃদয়-জাত সেদিনকার একটি কবিতা পাঠিয়ে দিই। কিছু ছন্দের পরীক্ষা লক্ষ্য করবেন, কিন্তু এই কঠিনসাধিত অথচ বিস্রস্ত বাক্যের ধ্বনি-প্রতিধ্বনিময় কুহকে যদি সমস্ত জীবনের অগ্নিকণা হঠাৎ না দেখা দিয়ে থাকে তাহ'লে রচনা ব্যর্থ হল। U. N.-এ যাতায়াতের পথে বৃষ্টিবাদলের শহরে থেমে-থেমে লিখেছিলাম, তারপর রোদ্দুরে-ধোওয়া ঈস্ট নদীর ধারে পাথরের সাঁকোতে ব'সে মিছিল-যাত্রার ক্ষুদ্র কাব্য শেষ করেছি।* ন্যুইয়র্কের আলোয় মনে-পড়া সেই আমার পৃথিবীর দিন।

আপনি ঠিকই লিখেছেন, সাহিত্যের বিচার তার অন্তর্গত মতামত বা রাষ্ট্রিকতা যাচাইয়ে সম্পন্ন হয় না। আমিও সেই কথাই বলতে চেয়েছিলাম 'কবিতা'র ঐ চিঠিতে। অথচ কোথাও একটি গভীর যোগ আছে, তাও মেনে নিতে হয়। সেই যোগ মতামতের উৎসে পৌঁছিয়ে ধরা যায়। "গোরা" উপন্যাসে যদি রবীন্দ্রনাথ হিন্দুসমাজের ইতর দিককে উঁচু দামে পূজো করতেন তাহ'লে গল্পের শিল্পমূল্যও হ্রাস হ'তো বৈকি—কোথাও ধরা পড়তো শিল্পীর মাত্রাবোধের অভাব। সমগ্র দৃষ্টিতেই ক্ষুদ্র জিনিষকেও দেখা যায়, ভগ্নদৃষ্টিতে নয়। তাই রবীন্দ্রনাথের বাংলা সমাজে আনন্দময়ী আছেন ; পানুবাবুর পাশাপাশি পরেশবাবু ; অভিমানী নতুন বাংলার দৃশ্য। অথচ কেবলমাত্র যথার্থের জন্য কবি ক্রমাগত ভারসামঞ্জস্য দেখাতে অগ্রসর হন নি, গোরা-

* 'কবিতা', বর্ষ ২৩, সংখ্যা ৩-এ প্রকাশিত 'পৃথিবীতে'।—সম্পাদক

স্বচরিতায় প্রাণের স্বচ্ছ ভাবণে তিনি স্বভাবতই মাত্রা রেখেছেন,—সামনে চেয়ে দেখেছেন। সমাজের উজ্জল নিষ্প্রভ, জীর্ণ উদ্ধত দুই দিককেই বেদনায় বিশ্বাসে বীর্যে তৌল করেছেন—মতামতের তাগিদে নয়, সেই প্রাণশিল্পের আগ্রহে যা অতিমমত্বে ক্ষুণ্ণ নয়, কামুকতায় দুর্বল নয়, স্বাধীনতার নামে যা উচ্ছৃঙ্খল ঔদাসীন্যকে কখনো মানেনি।

পাস্টেরনাক-এর মতো কবির কাছ থেকেও রাশিয়ার, অর্থাৎ তাঁর গভীর-জানা সামাজিক জীবনের, আরেকটু প্রশস্ত দৃষ্টিসম্পন্ন পরিচয় পাবো আশা করেছিলাম। তার জায়গায় পেলাম অতি আশ্চর্য্য গভীর রচনা যা কখনো হঠাৎ ভেঙে গেছে শিল্পীর আত্মজীবনের বিরুদ্ধতায়, শিল্পের প্রসাদগুণের অভাবে। একেবারে শেষ প্যারাগ্রাফে এবং মধ্যে মধ্যে অন্যতর ইশারা আছে। কিন্তু গল্পে তার জায়গা এত কম যে অত বড়ো দিগন্তজোড়া দৃশ্য হঠাৎ দিগন্তহীন রুদ্ধতায় অলীক এবং সংকুচিত হয়ে বিশ্বাসবোধকে ঠেকিয়ে রাখে। সব মিলে কোথায় যেন অসংগতি আছে। অত আশ্চর্য রচনাও পাঠকের মনে প্রশ্ন তোলে লেখকের শৈল্পিক বিচার সম্বন্ধে। এইখানে জিভাগো পৌঁছলো না টলস্টয়, তুর্গেনিভ, চেখভের কাছে, যদিও অন্য নানাদিকে এই বই তাঁদের লেখার সমকক্ষ এমন কি শ্রেষ্ঠ।

সমাজ বা ইতিহাসের ধারার সঙ্গে কাব্যের যোগ প্রাণধারায়, জীবনের ভিতর দিয়ে। ঔদার্যের সাহসে, শিল্পীর চৈতন্যে সেই প্রাণ ধরা দেয়, ছন্দে-বর্ণে তাঁর জীবন থেকে রচনায় চারিয়ে যায় সমগ্র সত্যের বোধান্বিত কম্পনে। জিভাগো উপন্যাসে মহাসৃষ্টিশীল প্রতিভা হঠাৎ কোনোখানে অপ্রতিভ হয়ে দেখা দিলে আমরা ক্ষুব্ধ না হ'য়ে পারি না। যদি তাঁর দেশের লোক হতাম, তাঁরই মতো দুঃখ তীব্রতার মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকতাম তাহ'লে আমাদের এই ক্ষুব্ধতা আরোই দারুণ হতো। যে-সব তথ্য আজ বিশ্বপ্রতীতির ক্ষেত্রে সকলে স্বীকার করতে রাজি—এখানে রাষ্ট্রিক তর্ক বা পক্ষের কথাই ওঠে না—এবং যা তিনি নিজেও ভিতরে-ভিতরে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন তাকে ফুটিয়ে তুলতে তাঁর অধিকারে বা অভিমানে বাধল। তাঁর দ্বিধা গল্পের কাটলে যেখানে দেখা দিয়েছে

সেখানে সেই পরিমাণে শিল্পীর নির্ভীত সত্য দৃষ্টি প্রচ্ছন্ন হয়েছে। অথচ তাঁর
বেদনায় আমরা ব্যথিত, যেখানে তাঁর শিল্প নৈরাশ্যের অতিভারে ভেঙে পড়েছে
আমরা চিত্ত দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে তা খুবই বুঝে নিতে পারি। কিন্তু এই সম-
হৃদয়তার ফলে গল্পের অসম দৃষ্টিকে মূল্য দেওয়া চলে না। স্নায়বিক আক্রোশের
অতি প্রকাশ বাধা হয়ে উঠল,—দুর্যোগের তলে-তলে নবযুগসৃষ্টির সত্যকে
জিভাগো দেখতে পেল না। সাংঘাতিক ঐ আত্মবন্দীদশার ক্রিয়া পাঠককে
আহত করে যখন জিভাগো একেবারে নিছক গুণ্ডার হাতে জেনে-শুনে প্রাণতুল্য
লারিসাকে তুলে দিল। রাত্রে ঘরে ব'সে ভডকা খেলে কী হবে, ঐ মানবত্বহীন
অবস্থায় লেখা কবিতার দৌড়ও তথৈবচ। বোঝা যায় রীতিমতো শিল্পবিরুদ্ধতা,
চারিত্রিক ভগ্নবিলাসিতা লেখককে এবং তাঁর রচনাকে বারে বারে প্রতিহত
করেছে। নতুন গ'ড়ে-ওঠা তাঁর দেশে অন্য যে-সব বিষম দুর্বিচার অন্যায়
থাকুক না কেন, তাঁর সমসাময়িক এবং পরবর্তীকালে সাম্প্রতিক লেখক,
কবি, চিত্রী ঐ বই প'ড়ে কেন যথার্থ আঘাত পেয়েছে তা বোঝা যায়। মূর্খ
রাষ্ট্রিক ভাড়া-করা বীরদের কথা বলছি না, সব দেশেই তারা আজ ঘৃণ্যতায়
জর্জরিত, পরুষবাক্যের কৌশলী খেলোয়াড় ওরা উভয়পক্ষেরই চরম লজ্জার
বিষয়। অর্থের লালসায় এবং মিথ্যার উত্তেজিত তামাশায় তারা তমসাবৃত।
তা ছাড়া স্বাধীন মতাবলম্বী অন্যদের বিরুদ্ধতা অবশ্য "সার্বিক" রাষ্ট্রেও
বরাবরই আছে, অন্য দেশেও তাই। কিন্তু তাদের সুর একটু অন্য।
পাস্টেরনাক সবই জানেন এবং সম্ভবত নতুন বইয়ে অতিমাত্রায় ধার-শোধ
করতে গিয়ে আবার তাঁর শিল্পকে অন্য ভাবে আহত করবেন। আমরা যারা
তাঁকে চরম শ্রদ্ধা করি, তাঁর বিভক্ত জীবনের উপর জয়ী তাঁর কবি-মানসকে
চিনেছি, আমাদের কাছে তাঁর আশ্চর্য উপন্যাসের মহিমাই চিরন্তন বিস্ময়ের
ব্যাপার। অথচ মণিমালায় যেখানে গ্রন্থনের শিথিলতা, অথবা যেখানে হঠাৎ
মণির বদলে কাঁচের তীক্ষ্ণ টুকরো জায়গা পেয়েছে দরদের সত্যভাবিতায় সেই
আত্যন্তিক ত্রুটিগুলোকেও ঢাকা দেবো না। কেননা আসল প্রসঙ্গ মানব-
জীবনের সর্বত্তম সূক্ষ্মতম বোধকে নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের "রাশিয়ার চিঠি"তে ঐ

দেশ সম্বন্ধে যে সকল স্পষ্টদর্শিতা আছে সমগ্র অন্দোলনের একটি "বড়ো" দিক সম্বন্ধে জিভাগোতে সেই দৃষ্টি নেই।

দান্তের Divine Comedy বহুস্থানে নকল ধার্মিকতার দোষে রীতিমতো নিম্নতাদুষ্ট তা আমরা তাঁর কাব্যের পূজারি হয়েই ব'লে থাকি। উগ্র ক্যাথলিকরূপে তিনি মুসলমান ধর্ম এবং ধর্মাবলম্বীদের "নরকে" পাঠিয়ে তৃপ্ত হলেন না, মহম্মদকে লাঠি মারিয়ে তেলে পুড়িয়ে অপমান ক'রে আপনাকেই এবং আপন শিল্পকে অপমানিত করলেন। Divine Comedy কাব্য হিসাবে এই প্রসঙ্গের দ্বারাই বিচারিত হবে না, ঊর্ধ্বে উঠে গিয়েছে কবির দৃষ্টি যেখানে তিনি যথার্থ জ্যোতির্দৃষ্টিময় – কিন্তু শিল্প জিনিষটা অনেক সূক্ষ্ম তন্তুর সমবায়ে গড়া, তাই যেখানে কোনো সুতো ছিঁড়েছে বা তা কৃত্রিম বা মিথ্যা—সেখানে শিল্পের দিক থেকেই ক্ষতি ঘটেছে স্বীকার করব। Divine Comedy-র অনেকখানি আজ তাই শিল্পাগ্রহীর কাছে বর্জনীয়; কী আর করা যাবে।

পাস্টেরনাক অতদূর যান নি, বেঁচে গিয়েছেন। কিন্তু জিভাগো যত জোরেই জাহির করুন না কেন যে "সমস্ত মানুষের ইতিহাসের উৎপত্তি যীশুখ্রীষ্টে"—এ-রকম অদ্ভুত অতিধার্মিকতার উৎপাত বইয়ে কিছু রয়েছে এমন কি খৃষ্টীয় পাঠকের কানেও তা বাধবে। যদি পাঠক যথার্থ সাহিত্যিক হন, যাই হোক না কেন তাঁর "ধর্ম"। সাধারণ নীতি রক্ষার দিক থেকেও নব-দীক্ষিত পাস্টেরনাক এখানে ইহুদি ধর্ম পরিত্যাগ ক'রে খাঁটি খৃষ্টানী প্রচার করেন নি। আবার ফিরে আসতে হয় অপ্রত্যাশিত চারিত্রিক ভগ্নতার প্রসঙ্গে। একদিকে ধার্মিক গোঁড়ামি অন্যদিকে জিভাগোর চরিত্র মানবিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে উদ্‌ভ্রান্ত বা ক্লান্ত ঔদাসীন্যে ক্ষয়শীল। "মরালিটি"র দরিদ্র আখ্যা নিয়ে তর্ক করব না, চিত্তধর্মের অভাব যেখানে মানবধর্মের প্রকাশে বাধা দিয়েছে সেখানে আপত্তি জানিয়ে রাখব। সেই আপাত্ত শিল্পরুচির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

সবাই যদি লামা ধর্মাবলম্বী হয়ে প্রার্থনাচক্র ঘোরাই তাহ'লে এত সব সমস্যার কথাই ওঠে না। ধর্মের নামে মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অবজ্ঞা তিব্বতী ছায়ায় ঢাকা প'ড়ে যাবে। কিন্তু সাহিত্যধর্ম লামাধর্ম নয়, যা অনায়াসে

শিশুহত্যা, জুয়াখেলা, পবিত্র কুসংস্কারের বিরাট চক্রাস্তে আবর্তিত হয়ে চলেছে, অর্থাৎ অচল হ'য়ে রয়েছে। লামায়িত হবার বিরুদ্ধে, যে চৈনিকতা উদ্যত তার সঙ্গে সাহিত্যিক চিত্তের যোগ প্রায় শূন্য—যদিও তাদের মূল উদ্যোগ হয়তো কিছু পরিমাণে উজ্জ্বল—কী জানি। ভাগ্যের কথা, আমাদের অনেকের ধর্ম বা পাস্টেরনাক-এর খৃষ্টধর্ম, লামাপূজার স্তরে নামেনি, (লামা-বিচ্ছেদ যজ্ঞেরও নয়), তাই রাশিয়ান কবির সঙ্গে ধর্ম এবং ধার্মিকতার আলোচনা আমরা নির্ভয়ে চালাবো। ভরসা আছে তাঁর গোঁড়ামি কিছু কমে যাবে বৃহত্তর জগতের যোগে।

.. এখন ট্রেন ধরবার সময় হলো—চলি।

আমাদের প্রীতি জানবেন।

—অমিয় চক্রবর্তী

পুঃ—আপনাদের প্রতিবাদী কোনো পত্রের সঙ্গে এই চিঠি ছাপালে সুখী হবো। যতদিক থেকে আজকের সাহিত্য এবং সমাজসমস্যার বিশ্বজোড়া আলোচনা হয় ততই ভালো।*

কবিতাভবন
২০২ রাসবিহারী এভিনিউ
কলকাতা ২৯
১০ মে ১৯৫৯

২ : অমিয় চক্রবর্তীকে বুদ্ধদেব বসু

প্রিয়বরেষু,

এই 'প্রতিবাদ' লিখবো না ভেবেছিলাম। আপনার ও আমার মধ্যে, কিছুদিন ধ'রে, যে-ব্যবধান ধীরে-ধীরে গ'ড়ে উঠছে, যা আমরা দু-জনেই মাঝে-মাঝে অনুভব করেছি কিন্তু কেউই এ-যাবৎ প্রকাশ করিনি, তাকে

* এই প্রসঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীর প্রথম পত্র 'কবিতা' বর্ষ ২৩ সংখ্যা ২-এ প্রকাশিত হয়েছিলো।—সম্পাদক

নিঃশব্দে এড়িয়ে যাওয়া আমার অভিপ্রায় ছিলো। ভুলে থাকা নয়, নিজের মনে অস্বীকার করা নয় (কেননা সেটা অসম্ভব) : শুধু এড়িয়ে যাওয়া। সাযুজ্যের একটি তো সূত্র আছে : আপনি মাঝে-মাঝে বাংলা ভাষায় কবিতা লেখেন, এবং আমিও কথঞ্চিৎ চেষ্টা ক'রে থাকি ; অনেক, অনেকবার এই 'কবিতা' পত্রিকায় অংশী ও সঙ্গী হয়েছি আমরা ; 'এক পয়সায় একটি' গ্রন্থমালা প্রকাশ থেকে এজরা পাউণ্ডের 'পুনরুজ্জীবন' পর্যন্ত বহু সাহিত্যিক প্রচেষ্টায় যুক্ত থেকেছি। আর শুধু কি তা ই? আলাপে আলোকিত কত ঘণ্টার পর ঘণ্টা, এই রাসবিহারী এভিনিউর ফ্ল্যাটে মধ্যরাত-পেরিয়ে-যাওয়া স্তব্ধতায়, কখনো মার্চ মাসের কনকনে ঠাণ্ডায় বস্টনে, কখনো বা নিউ ইয়র্কের পথে ঘুরতে-ঘুরতে ড্রাগ-স্টোরের অবকাশে। আমি কি কখনো ভুলতে পারবো যে নিউ ইয়র্কের এয়ার-পোর্টে নেমেই আপনার একটি বার্তা পেয়েছিলাম, হোটেলে পা দিয়েই আর-একটি, হোটেলের ঘরে পৌঁছনোমাত্র আপনার টেলিফোন—আর তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই, সাক্ষাৎ আপনাকে? কোনোরকমে সময় ক'রে নিয়ে আপনার কর্মস্থল থেকে চ'লে এসেছিলেন সেদিন, যেমন আবার এসেছিলেন আমার বিদায় নেবার দু-দিন কি তিন দিন আগে, সেই একই নিদ্রাহীন নিউ ইয়র্কে। রাত বারোটার ট্রেনে আপনি বস্টনে ফিরে যাচ্ছেন, গ্র্যাণ্ড সেণ্ট্রাল স্টেশনে আপনার সঙ্গে ব'সে আছি। সামনে কফির পেয়ালা, কিন্তু আপনারটি অস্পৃষ্ট। কথা চলছে, কিন্তু আমি প্রায় নীরব ; আপনার আশ্চর্য শিল্পিত মৌখিক বাংলা ভাষা অবিরলভাবে ঝ'রে ঝ'রে কফিতে সর ফেলে দিলে ; কথার বিষয় কবিতা, রবীন্দ্রনাথ, বিদায়ের মুহূর্ত, রবীন্দ্রনাথের কচ ও দেবযানীর কবিতা—সেবারেও, অন্য অনেকবারের মতো, আমার মনে হয়েছিলো যে অন্য সব কাজ কিছুদিনের মতো বন্ধ রেখে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে একটি বই লেখা আপনার কর্তব্য—আর তারপর হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আপনি উঠে দাঁড়ালেন, আমার হাতে আস্তে একবার হাত রেখে বললেন, 'চলি। এই রকমই ভালো।' ব'লে আর এক মুহূর্ত দেরি না-ক'রে বাইরের ভিড়ে মিলিয়ে গেলেন। তখন ট্রেন ছাড়ার মিনিট পাঁচেক বাকি ; অনেক হেঁটে, অনেক সিঁড়ি ভেঙে, আবার

বহুদূর হেঁটে তবে পৌঁছনো যাবে ট্রেনে। কিন্তু আমি জানি সে-রাত্রের বস্টনের ট্রেন আপনাকে ফেলে যাত্রা করতে পারেনি।

এ-সব কথাই মনে পড়ছে আমার, আজ আপনাকে লিখতে ব'সে ; আর তার ফলে আরো বেশি কঠিন হ'য়ে উঠছে আমার পক্ষে কলম চালানো, এই পত্র শেষ করার সব ইচ্ছা উবে যাচ্ছে। এই যে কুড়ি বছরের সংসর্গ আমাদের, তা-ই কি যথেষ্ট নয়, তা কি এমন কিছু নয় যার প্রতি শ্রদ্ধাবশত কোনো-কোনো বিষয়ে নীরব হ'য়ে থাকতে পারি আমরা? তা-ই চেয়েছিলুম আমি, আর সেইজন্যে পাস্টেরনাক বিষয়ে আপনার দ্বিতীয় পত্রটি আমাকে বিষাদে ব্যাকুল ক'রে তুলেছে। আট বার কি দশ বার চিঠিখানা পড়েছি আমি, এবং যত বার পড়েছি তত বার গভীরভাবে ব্যথিত হয়েছি—ক্ষুব্ধ নয়, তর্কের দিকে উদ্বুদ্ধ নয়, শুধু ব্যথিত। কী দরকার ছিলো এই বিতর্কের, এবং কে এই পাস্টেরনাক যে আপনার ও আমার মধ্যে এসে দাঁড়াতে পারে? কিন্তু কথাটা পাস্টেরনাককে নিয়ে নয়, 'ডাক্তার জিভাগো' উপন্যাসটি নিয়েও নয়, ও-সব উপলক্ষ মাত্র ; আসল কথাটা আমাদের মনের সেই গভীরতম স্তরকে স্পর্শ ক'রে আছে, সেই ভূমি ও ভিত্তি, যেখান থেকে উৎসারিত হচ্ছে ডাল, পাতা, মঞ্জরী ও ফলের মতো আমাদের সব কথা ও নীরবতা, সব চেষ্টা ও প্রতীক্ষার প্রহর। পাস্টেরনাক আমাদের পক্ষে কিছুই না-হ'তে পারেন, কিন্তু তিনি আজ যে-প্রশ্নের প্রতীক হ'য়ে উঠেছেন সে-বিষয়ে কিছু অনুভব করবো না এমন সাধ্য আমাদের নেই। অনুভব ক'রেও নীরব থাকা যেতো না তা নয়, কিন্তু আপনি আপনার পত্রখানা 'কবিতা'য় প্রকাশ করার ইচ্ছে জানিয়েছেন, এবং আপনার আদেশ আমার পক্ষে অবশ্যমান্য। কিন্তু—আর সেটাই সবচেয়ে দুঃখের কথা আমার পক্ষে—ওটি প্রকাশ করতে হ'লে আমাকেও কিছু বলতে হয়, আর আমি কিছু বলতে গেলেই আপনার সঙ্গে আমার ব্যবধান সোচ্চার হ'য়ে পড়বে।

কিন্তু গদ্য ক'রে বলার কি প্রয়োজন আছে? যে-কোনো বুদ্ধিমান পাঠক, যিনি আপনার কবিতার সঙ্গে পরিচিত, এবং আমারও কিছু রচনা যাঁর চোখে

পড়েছে, তিনি কি অনায়াসে ব'লে দিতে পারবেন না যে জগতের নানাবিধ ব্যাপারে আপনার ও আমার ধারণা শুধু মুখোমুখি হ'তে পারে, পাশাপাশি দাঁড়াতে পারে না? শ্রীযুক্ত যামিনী রায় বলেন যে কোনো-একটা ঘটি-বাটি দেখলেই সেই বিশেষ জাতির সমগ্র মানসতা ও জীবনধর্মের বিবরণ ব'লে দেয়া যায়; তা কতদূর সম্ভব জানি না, কিন্তু এটুকু জানি যে কোনো-একজন কবিকে তাঁর রচনা থেকেই রচনা ক'রে নেয়া যায়, কবিতা যে-পরিমাণে খাঁটি ঠিক সেই পরিমাণেই কবির ব্যক্তিত্ব ধরা পড়ে তার মধ্যে; সাহিত্য, রাজনীতি, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে কবিতা যদি ভাষার দ্বারা একটি কথাও না বলে, তবু প্রচ্ছন্নভাবে, কিংবা নীরবতার দ্বারা, কিংবা শুধু ভঙ্গির সাহায্যে, সব কথাই ব'লে দেয়। আপনার কবিতার প্রতি দুবার আমার অনুরাগ, অথচ আমি জানি যে আপনার আর আমার পথ প্রথম থেকেই ভিন্ন হ'য়ে গেছে; আপনি যোগ দিয়েছেন মিছিলে আর আমি স্বভাবত বিবরবাসী; আপনি ঘোষণা করেছেন মিলন আর আমি বিচ্ছেদবেদনায় সন্তপ্ত; আপনি ইতিমধ্যেই অতিথিকে প্রাণলক্ষ্মীর পঞ্চব্যঞ্জন সাজিয়ে দিয়েছেন, আর কিমিয়া-ক্লান্ত আমার দ্বার থেকে আজকের দিনের আগন্তুকেরা ফিরে যাচ্ছে। এবং এ-সব কথা আপনিও জানেন, তরুণতর বাঙালি সাহিত্যিকেরাও জানে না তা নয়। অতএব, আমাকে এখন যা বলতে হচ্ছে তা নতুন কথা নয়, বুদ্ধিমান পাঠকের মনে তা অনেক আগেই প্রতিভাত হ'য়ে থাকবে: সে-কথা এই যে সাহিত্য বলতে আপনি যা বোঝেন আমি ঠিক তা বুঝি না, ধর্ম বলতে আপনি যা বোঝেন আমি ঠিক তা বুঝি না, এবং সাহিত্যব্যাপারে রাজনীতিকে আপনি যে-আসন দিয়ে থাকেন আমি তা দিতে প্রস্তুত নই।

এই স্বীকারোক্তির পর তর্কের অবকাশ কোথায়? জিভাগোর প্রতি যে সব বিশেষণ আপনি নিন্দার অর্থে প্রয়োগ করেছেন—'আত্মকেন্দ্রিক', 'চৈতন্যসাধক', 'আত্মবিভক্ত', 'জটিল'—আমি সেইগুলোই প্রশংসার অর্থে ব্যবহার করবো। আপনার আপত্তি, জিভাগো এমন মানুষ হননি, 'লোকেরা' যাঁর 'যশোগান' করতে পারে; আমার মতে, 'লোকেরা' তাঁর যশোগান করলে

তাঁর বিষয়ে উপন্যাস লেখা নিষ্প্রয়োজন হ'তো, কিংবা কেউ লিখলেও
সে-উপন্যাস পাঠযোগ্য হ'তো না। 'খৃষ্টধর্মের ব্যাখ্যাতা'রূপে জিভাগোর ব্যবহার
আপনার 'বিচিত্র' ব'লে মনে হয়েছে; কিন্তু আমি দেখছি জিভাগো ধর্মের
'ব্যাখ্যাতা' নন, তিনি এক ধর্মপ্রবণ ব্যক্তি, যাঁর বিশেষ ও ব্যক্তিগত খৃষ্টের
সঙ্গে ডস্টয়েভস্কি ইতিপূর্বে আমাদের পরিচয় ঘটিয়েছেন। যদি আপনাকে ভুল
বুঝে থাকি তো ক্ষমা করবেন; কিন্তু আমার মনে হয়েছে যে লৌকিক
সাধুতাকে আপনি ধর্মপ্রবণতা বা আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে এক ক'রে দেখেছেন;
কিন্তু আমার ধারণা, ও-দুই বস্তু পরস্পর-সম্পৃক্ত হ'লেও সব সময় সহবাসী
হয় না। রবীন্দ্রনাথের পানুবাবু 'সাধু' ব্যক্তি সন্দেহ নেই; কারো কাছে চার
আনা ধার নিয়ে তিনি তা ফেরৎ দিতে ভুলে যাবেন এমন কথা কল্পনাতীত,
কিন্তু তবু—অথবা সেইজন্যেই—তিনি হীন আত্মার মানুষ, তাঁর চরিত্রে বহু
সামাজিক গুণ বিরাজ করলেও আধ্যাত্মিকতা অসম্ভব। পক্ষান্তরে, ডস্টয়েভস্কির
উপন্যাসে যারা চোর, প্রতারক বা কামমোহিত (আপনার ভাষায় 'কামুকতায়
দুর্বল'), বা এমনকি হত্যাকারী, তাদের মধ্যেই সবচেয়ে তীব্র হ'য়ে ফুটেছে
ঈশ্বরের জন্য আকাঙ্ক্ষা, তাদের তুলনায় সাংসারিক সজ্জনেরা, কৃতী হ'লেও, সুখী
হ'লেও, জীবনের প্রধান প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে অচেতন অথবা নির্বোধ। যারা
'খারাপ লোক', তাদের উঁচু ও উজ্জ্বল ক'রে তুলে ধ'রে ডস্টয়েভস্কি যে পাপের
সমর্থন করছেন না তা না-বললেও চলে, কিন্তু এই ভাবে যে-সত্যের মুখোমুখি
তিনি আমাদের দাঁড় করিয়ে দিচ্ছেন তা প্রায় সহনাতীত। 'অমুক ব্যক্তি
খারাপ'—এই উক্তির মধ্যেই অন্য একটি কথা প্রচ্ছন্ন থাকে—'আমি কিন্তু
ভালো'; অন্যকে উন্মাদ বা অপরাধী ব'লে ঘোষণা ক'রে নিজেদের আমরা
প্রকৃতিস্থ বা সাধু জেনে নিশ্চিন্ত হই: এই আত্মপ্রসাদের জন্যই নিন্দা অথবা
পরচর্চা মানুষের পক্ষে অন্তহীনরূপে তৃপ্তিকর, আইনকানুন ও সামাজিক বিধান—
যার সাহায্যে অঙ্ক ক'ষে 'অপরাধ' নির্ণয় করা যায়—নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এবং
এই আত্মপ্রসাদ ধ্বংস ক'রে দিয়ে ডস্টয়েভস্কি জাগিয়ে তোলেন আত্মজিজ্ঞাসা;
এক বিস্ফোরক মুহূর্তে আমরা উপলব্ধি করি যে আমরা, সাংসারিক ভালো-

২

মানুষের দল, আমরাও পাপী অথচ নিজেদের সাধু ব'লে জেনেছি, কিন্তু ডস্টয়েভস্কির পাপীরা নিজেদের পাপী ব'লেই জানে, তা জানে ব'লেই পুণ্যের জন্য আকাঙ্ক্ষা তাদের জলন্ত, এবং সেই হিশেবে তারা আমাদের চাইতে উন্নত মানুষ, চৈতন্যে উন্নত, এবং চৈতন্য মানেই আধ্যাত্মিকতা। যারা সামাজিক বিধিবিধানের অনুগত হ'য়ে কোনোরকমে ভদ্রভাবে জীবনটা কাটিয়ে দেয়, যারা স্বার্থসিদ্ধির কারণে বাধা না-হ'লে অন্যের কোনো ক্ষতি করে না এবং অহমিকার কণ্ডূয়ন ব্যতীত অপরের জন্য কড়ে আঙুলটি তুলতে হ'লেও ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে, তারা আসলে না-ভালো না-মন্দ না-কোনোকিছু, যদিও সংসারে তারাই অধিকাংশ এবং তারাই সজ্জন ব'লে পরিচিত। দুর্লভ, অতি দুর্লভ সেই সাধুতা, যা সচেতন, সদর্থক ও সকর্মক, যা কতগুলো নিষেধপালনের সমষ্টিমাত্র নয়, মানুষের অন্তঃস্থিত অকল্যাণ ও বৈনাশিকতা বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে সজ্ঞান, এবং সর্বমানবের দুঃখভার নিজের মধ্যে বহন করা যার তপস্যা। সত্যকার সাধুতা—যাকে পুণ্যময়তা বলা যায়—তার অর্থ আমরা বুঝতে পারি যখন যুধিষ্ঠির নরকবাসীদের আর্তি দেখে নিজেও চান নরকবাসী হ'তে, কিংবা ফাদার জসিমা দ্মিত্রি কারামাজভের আসন্ন ও বিপুল দুঃখকে লুণ্ঠিত হ'য়ে প্রণাম করেন। এখন কথাটা এই যে যুধিষ্ঠির বা ফাদার জসিমা কোটিতে একজন মেলে না, কিন্তু কোটি-কোটি সাধারণ, স্বভাবী, অজ্ঞান ও সামাজিক হিশেবে নিরপরাধ মানুষের তুলনায় অনেক বেশি বরেণ্য সেই ইভান ও দ্মিত্রি কারামাজভেরা, যারা আইনের অর্থে অপরাধী না-হ'য়েও নৈতিক অর্থে অপরাধী ব'লে জানে নিজেদের, এবং সেই জ্ঞানের ফলে বরণ করে শাস্তি, বরণ করে দুঃখ, মাথা পেতে তুলে নেয় আমাদের সকলের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত।

কিন্তু আপনি, আমি লক্ষ করছি, দুটি পত্রের কোনোখানেই ডস্টয়েভস্কির নাম করেননি, যদিও টলস্টয়, টুর্গেনিভ ও চেখভের উল্লেখ একাধিকবার ঘটেছে। এই বর্জনকে আপনার অভিপ্রেত ব'লে ধ'রে দিচ্ছি, তা না-নিলে আপনার মনীষিতাকে অসম্মান করা হবে। রাশিয়া বলতেই আমার যাঁকে মনে পড়ে আপনি রুশ সাহিত্যের আলোচনাপ্রসঙ্গে তাঁকে এড়িয়ে চলেন, এই তথ্যটিতেই

আপনার ও আমার ব্যবধানের মূলতত্ত্বটি লুকোনো আছে। জিভাগোর 'সাংঘাতিক আত্মবন্দী দশা' আপনাকে আহত করে যখন সে একেবারে নিছক গুণ্ডার হাতে জেনে-শুনে প্রাণতুল্য লারিসাকে তুলে দিল', কিন্তু আমার কাছে এই ঘটনা শুধু বোধগম্য নয়, ইঙ্গিতময়, কেননা এ থেকে আমার মনে প'ড়ে যায় আরো ভয়ংকর এক ঘটনা, 'দি ইডিয়ট' উপন্যাসে নায়িকার হত্যাকাণ্ড, যার সম্ভাবনা প্রথম থেকে জেনেও, এবং চরিত্রের আশ্চর্য সাধুতা সত্ত্বেও, প্রিন্স মিশকিন যা নিবারণ করতে পারেননি। জিভাগোর সামনে অন্য একটিমাত্র বিকল্প ছিলো ; লারিসাকে (তার কন্যাসমেত) নিজের কাছে রেখে সমবেত মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হ'তে পারতো সে ; কিন্তু সে বেছে নিলে সেই পথ, যেটা তার নিজের পক্ষে বেশি দুঃখের। সেই দুঃখের মহিমা যে-পাঠককে স্পর্শ না করে, তিনি মিশকিনের অক্ষমতাকেও ক্ষমা করতে পারবেন না, এবং ওফেলিয়াকে যে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিলে, সেই হ্যামলেটকে তাঁর মনে হবে 'স্নায়বিক আক্রোশ'পূর্ণ 'বাক্যশীল বিলুব্ধ মননজীবী'।

আপনাকে জিগেস করতে ইচ্ছে করে : 'ডাক্তার জিভাগো' উপন্যাসটির কী-রকম পরিণতি ঘটলে আপনার মনঃপূত হ'তো। যদি শেষ পরিচ্ছেদে জিভাগোকে দেখা যেতো লারিসার বিবাহিত স্বামী এবং সম্ভ্রান্ত নাগরিকরূপে প্রতিষ্ঠিত—তাহ'লে ? কিন্তু স্থিতি ও পারিবারিক সুখের প্রধান পুরোহিত টলস্টয়ও আনা কারেনিনার সঙ্গে তার স্বামীর অশ্রুপ্লুত ও ক্ষমাসুন্দর পুনর্মিলন ঘটাতে পারেননি, বরং আমাদের সব অনুকম্পা টেনে নিয়ে গেছেন অন্যায়ভোগী স্বামীর দিক থেকে অন্যায়কারিণী অসতী স্ত্রীর দিকে, তার আত্মহত্যারূপ মহাপাপের জন্যও নিন্দার সম্ভাবনা লুপ্ত ক'রে দিয়েছেন। এমনকি রামায়ণও নায়ক-নায়িকার পুনর্মিলনে শেষ হ'তে পারলো না, পুনরায় এক চরম বিচ্ছেদ ঘটিয়ে কবি তাঁর রাম ও সীতাকে ক'রে তুললেন চিরকালের মতো স্মরণীয়। নিষ্ঠুরতা আর্টের একটি মূলসূত্র ; 'জীবনে'র মানদণ্ডে তার কিছুই বোঝা যাবে না। সত্য, জীবনে আমরা চাই সুখ, শান্তি ও স্থিতি ; 'আমরা' অর্থ অধিকাংশ মানুষ ; কিন্তু প্রত্যেক মানুষই তা চায় না, মানুষের মধ্যেই জন্মায়

বীর ও শহীদ, বৈরাগি ও সন্ত ; এবং এই বীর, শহীদ ও সন্তদের প্রতি আমাদের হৃদয়ের আকর্ষণ যে দুর্বার তাতেই প্রমাণ হয় যে আসলে, এবং মনের গভীরতম স্তরে, আমরাও সুখ, শান্তি ও স্থিতির উপরে অন্য কিছুকে মূল্য দিয়ে থাকি, আমরাও চাই কোনো-এক পরম ও নামহীন সুখ, কোনো-এক চরম ও নামহীন দুঃখ ; এবং যা জীবনে আমরা পাই না, কিংবা যা চাইবার সাহস হয় না আমাদের, সেই সব অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাই 'জীবনের বাইরে' খুঁজে বেড়াই আমরা, কেউ ধর্মে কেউ দর্শনে কেউ সাহিত্যে। যারা নিছকভাবে বাঁধা রাস্তায় জীবন কাটায়, পায়ে-পায়ে সব নিয়ম মেনে চলে ; বেআইনি, যুক্তিরহিত, অকথ্য ও অনির্বচনীয়ের দ্বারা কখনো আক্রান্ত হয় না, শুধু তাদের নিয়ে সাহিত্য রচিত হ'লে সাহিত্যের কোনো প্রয়োজন থাকতো না।

'ডাক্তার জিভাগো' উপন্যাসটির বিরুদ্ধে, যতদূর বুঝতে পেরেছি, আপনার প্রধান অভিযোগ এই যে তাতে 'ইতিহাসের ব্যাপকতর জ্ঞান' প্রকাশ পায়নি, যে পাস্টেরনাক 'আপন দেশের অপরাজেয় কল্যাণশক্তির পরিচয় দেননি', দেখতে পাননি 'দুর্যোগের তলে-তলে নবযুগসৃষ্টির সত্যকে'। অর্থাৎ রুশীয় বিপ্লব বিষয়ে তাঁর শ্রদ্ধা বা সমবেদনার অভাব আপনাকে পীড়িত করেছে, কিংবা আপনি ক্ষুব্ধ হয়েছেন 'শত-শত অবর্ণনীয় অমার্জনীয় পাপ সত্ত্বেও' তিনি আশাবাদী উপসংহার করেননি ব'লে। ধ'রে নিলে বোধহয় ভুল হয় না, যে পাস্টেরনাক, যাঁর বয়স সত্তর এবং যিনি যৌবনের পরে আর বিদেশে যাননি, তিনি রুশীয় বিপ্লব বিষয়ে তাঁর বাঙালি অথবা বিদেশী সমালোচকদের চাইতে কিছুটা বেশি জানেন, এমনকি তাঁর বয়োকনিষ্ঠ রুশ সমালোচকদের তুলনাতেও তাঁর জ্ঞান 'ব্যাপকতর' না-হবার কথা নয়। 'রোমক সাম্রাজ্যের পতনের পর এত বড়ো ঘটনা জগতে আর ঘটেনি—' এই ছিলো বিপ্লব বিষয়ে জিভাগোর প্রথম রোমাঞ্চময় অনুভূতি, কিন্তু তারপর ধীরে-ধীরে, যে-ধূসর মোহভঙ্গ সেই উষাকালকে আচ্ছন্ন ক'রে দিলে, সে কি জিভাগোর একলার ? ব্লক যেমন বিপ্লবকে ভ'রে তুলেছিলেন রুশীয় খৃষ্টধর্মের সারাৎসারে (সম্পূর্ণ তাঁর নিজের 'মন-গড়া' ব্যাপার), তেমনি পাস্টেরনাকের সমকালীন কবিরাও বিপ্লবকে

অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন তাঁদের নিজ-নিজ প্রবণতা অনুসারে, প্রত্যেকে তাঁর নিভৃত ও ব্যক্তিগত আদর্শকেই তার মধ্যে মূর্ত করতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ, বিপ্লবের কাছে তাঁরা এমন কিছু প্রত্যাশা করেছিলেন যা কোনো বিপ্লব কখনো দিতে পারে না। স্মরণ ক'রে দেখুন এই শতকের রুশীয় লেখক ও শিল্পীদের মধ্যে আত্মহত্যা, দেশত্যাগ ও রহস্যময় অন্তর্ধানের তালিকাটি : এসেনিন, আত্মহত্যা ; মায়াকভস্কি, আত্মহত্যা ; মারিনা স্বেতে-টাইয়েভা, আত্মহত্যা ; বরিস পিলনাইক ও আইজাক বাবেল, অন্তর্হিত ; বুনিন, মেরেজকভস্কি ও জিনাইডা হিপ্পিয়াস, দেশত্যাগী ; ইউজীন জামিয়াণ্টীন, নির্বাসনে মৃত ; এবং অবশেষে, ১৯৫৪ সালে, সেই ফাডাইয়েভ-এর আত্মহত্যা, যিনি মাত্র কয়েক বছর আগে এলিয়ট-প্রমুখ 'পশ্চিমী'দের রচনাকে বানর-হায়েনার চীৎকারের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। বিপ্লবের অব্যবহিত পরে মনে হয়েছিলো আধুনিক পশ্চিমী চিত্রকলার মস্কো একটি পীঠস্থান হ'য়ে উঠবে, কিন্তু সে-আশাও চুরমার হ'তে দেরি হয়নি। কাণ্ডিনস্কি ও শাগাল দু-জনেই সোৎসাহে স্বদেশে ফিরে যান, সরকারি কর্মভারও গ্রহণ করেন, কিন্তু কিছুদিন পরে আবার আমরা তাঁদের দেশান্তরী দেখতে পাই। উল্লেখ্য, উপন্যাসে স্ট্রেলনিকভকেও আত্মহত্যা করতে হ'লো ; মোহভঙ্গ কোনো অর্থেই জিভাগোর একলার নয়।

আর-একটি কথা আমি প্রসঙ্গত ব'লে নিতে চাই। সমকালীন কবি ও বন্ধুরা আত্মহত্যা করলেও পাস্টেরনাক তা করেননি ; দেশত্যাগর সুযোগ থাকা সত্ত্বেও একান্তভাবে স্বদেশেই বাস করেছেন ; সব দুর্যোগের মধ্য দিয়ে শুধু যে দৈহিক অর্থে জীবিত থেকেছেন তা নয়, সৃষ্টিশীলতাকেও রুদ্ধ হ'তে দেননি। এ থেকে আমি অন্তত এটুকু বুঝেছি যে 'কামুক', 'সুবিলাসী', 'অভিমানী' প্রভৃতি যে-সব বিশেষণ আপনি জিভাগো বা তার স্রষ্টার বিষয়ে ব্যবহার করেছেন, পাস্টেরনাকের আসন তার অনেক উর্ধ্বে। স্বাধীনভাবে সাহিত্যরচনায় প্রতিহত হ'য়ে যিনি বিনীতভাবে অনুবাদকর্মে আত্মসমর্পণ করেন, তাঁকে কি 'অভিমানী' বলা যায় ? বরং এক অবিকল ও অবিচল কবিচরিত্র কি উদ্ভাসিত

হচ্ছে না তাঁর মধ্যে, আমরা কি আভাস পাচ্ছি না সেই নিস্তাপ হীরক-দ্যুতির, বাইরে ঝড় উঠলেও যা বিস্রস্ত হ'তে শেখেনি ?

বলা বাহুল্য, পাস্টেরনাক তাঁর জীবৎকালের রুশীয় ঘটনাবলিকে যে-ভাবে নিজের মনে অনুভব ও উপলব্ধি করেছেন, 'জিভাগো' উপন্যাসে ও জিভাগোর কবিতাগুচ্ছে তা-ই তাঁর লেখনীকে চালিয়ে নিয়েছে, ভাষাকে দিয়েছে প্রাণ এবং ঘটনাকে বিশ্বস্ততা। সেই বিশেষ দৃষ্টি তাঁর পক্ষে নিতান্ত সত্য ; আপনাকে বা আমাকে খুশি করবার জন্য সেই দৃষ্টিকে বিকৃত বা ব্যাহত করলেই তিনি নিন্দনীয় হতেন। এই একই কথা সব লেখকের পক্ষেই প্রয়োজ্য ; কেননা সাহিত্য কখনো নিরপেক্ষ সত্যের বাহন হবার দাবি করে না ; নাস্তিক হ'য়েও 'গীতাঞ্জলি'র দ্বারা মুগ্ধ হওয়া সম্ভব, জাতিভেদ বা জন্মান্তর না-মেনেও ভাগবদ্গীতাকে সত্য ব'লে স্বীকার করা যায়। সত্য ব'লে অ নু ভ ব ক রা নো ই কবির কাজ, তার বেশি সাহিত্যে আর সত্য নেই। বিপ্লবের প্রতি পাস্টেরনাক সুবিচার করেছেন কি করেননি, এই প্রশ্নটাই আমার অবান্তর ব'লে মনে হয় ; তিনি অন্য কোনো দেশের লেখক হ'লে এই প্রশ্ন উঠতো কিনা সন্দেহ। এই সহজ কথাটা মেনে নিতে দোষ নেই যে মানুষ, দাম্পত্য থেকে রাষ্ট্রচালনা বা দেবার্চনা পর্যন্ত, তার সমবায়জীবনে যা-কিছু করে তাতে এমন কোনো আদর্শ নেই যা ভাবনা থেকে বাস্তবে অবতীর্ণ হবার প্রক্রিয়াটিতে ক্লান্ত হ'য়ে, বিক্ষত হ'য়ে, এমনকি বিধ্বস্ত হ'য়ে না পড়ে। কীটেরা অন্ধভাবে যে-বল্মীক রচনা করে তার মতো নির্ভুল মানুষের সংসারে কিছু হ'তে পারে না, কেননা মানুষ 'মন' নামক মহারিপুর দ্বারা আক্রান্ত, এবং সে-মন জনে-জনে ভিন্ন ও পরস্পরে দ্বন্দ্বময়। মানুষ শুদ্ধতার দিকে নিয়ে যেতে পারে শুধু নিজেকে ; অন্য সকলের মনের উপর মহাপুরুষেরও কর্তৃত্ব নেই ; আর সেইজন্যে মানুষ সংঘবদ্ধ হ'য়ে যা-কিছু করে তাতেই কলুষের সংক্রাম অনিবার্য। আদর্শের শুদ্ধতারক্ষার কথা সেখানেই শুধু কল্পনীয়, যেখানে একলা-মানুষ নিভৃতে ব'সে সৃষ্টি করে ; কবিতা লিখতে আর কারো সাহায্য নিতে হয় না ব'লেই কবি পণ করতে পারেন কিছুতেই আপোশ করবেন না ; কিন্তু 'দশজনকে নিয়ে'

কাজ করতে হ'লে শেষ পর্যন্ত যা দাঁড়ায় তা খুবই মোটা অর্থে মোটামুটি রকমের ব্যাপার। মহৎ ঐতিহাসিক কর্মও এই লক্ষণ থেকে মুক্ত নয়। ফ্লোবেয়র, তাঁর 'সেন্টিমেণ্টাল এডুকেশন' উপন্যাসে, ১৮৪৮-এর প্যারিস-বিপ্লবকে হিম বিদ্রূপে বিদ্ধ করেন, রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' ও 'চার অধ্যায়' বাংলার স্বদেশী আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদকে বেদনাময় ভর্ৎসনা জানায়, কিন্তু সেজন্য ফ্লোবেয়র বা রবীন্দ্রনাথকে দেশদ্রোহী আখ্যা শুনতে হয় না। পাস্টেরনাককে তাঁর স্বদেশীয়দের কাছে তা শুনতে হ'লো, তার কারণ বর্তমান রুশ সাহিত্যের এমন একটি অবস্থা, যা আমাদের কাছে অতিশয় অদ্ভুত ব'লে মনে হয়। 'আসল কথাটা এই যে কোনো-কোনো বিষয়ে আমরা লেখকেরা সকলেই একমত', প্রধান সোভিয়েট লেখক আলেক্সী সুরকভ-এর এই ঘোষণাটিতে আমরা দেখতে পাই এক মর্মঘাতী স্বীকারোক্তি, যা তিনি উচ্চারণ করেছিলেন ভাবতেও আমাদের অবাক লাগে। সব লেখকেরা একমত ?···কিন্তু উনিশ-শতকী রুশ সাহিত্য যে সারা জগৎকে সম্মোহিত ক'রে রেখেছে তার কারণই এই যে পুশকিন থেকে চেখভ পর্যন্ত লেখকবৃন্দ প্রত্যেকেই ভিন্ন-ভিন্ন ভাবে জগৎটাকে অনুভব করেছেন ও প্রকাশ করেছেন। উদাহরণ বাড়ানো নিষ্প্রয়োজন ; এটুকু বলাই যথেষ্ট যে যেখানে লেখকেরা সকলেই 'একমত', সেখানে থাকতে পারে শুধু কোটি-কোটি ছাপানো অক্ষর, কিন্তু সাহিত্য সেখানে জন্মাতে পারে না। আপনার ও আমার মধ্যে আজকের এই মতভেদের কথাই ভেবে দেখুন না— আসলে এটা মানসতার তফাৎ, আসলে যাতে এসে যায় তা 'মতামত' নয়, তা আমাদের ভিন্ন-ভিন্ন চিৎপ্রকৃতি—যদি আজ যে-কোনো পক্ষকে বাধ্য করা হ'তো অন্যের সঙ্গে গলা মেলাতে অথবা মূক হ'য়ে যেতে, আপনি কি তাহ'লে তার মধ্যেও 'নবযুগসৃষ্টির সত্য'কে দেখতে পেতেন ? অন্ততপক্ষে 'আমরা যারা এমন সব দেশে বাস করছি যেখানে বহু বিভিন্ন ও বিরোধী মানসতার বিকিরণ থেকে মানুষের মন তার প্রার্থিত সম্পদ ছেঁকে তুলতে পারে—আমরা কী ক'রে ব্যথিত না-হ'য়ে পারি পাস্টেরনাকের উপর তাঁর স্বদেশীয়দের আক্রমণে, যার আসল কারণ এই যে

তিনি 'সকলের সঙ্গে একমত' হ'তে পারেননি ?—কিন্তু তিনি যে একমত হ'তে পারেননি এতেই প্রমাণ হচ্ছে যে সুরকহুব-এর কথা নির্ভুল নয়, এবং এইটুকুই, আমার মনে হয়, আশার কথা।

চিঠিটা এখানেই শেষ ক'রে দেবো ভেবেছিলাম, কিন্তু অন্য একটা প্রসঙ্গ মনে পড়ছে যার উল্লেখ আমার পক্ষে কষ্টকর হ'লেও এড়িয়ে যাওয়ার সাধ্য আর নেই আমার। 'পাস্টেরনাক আসলে কবি।...গদ্যেও যেখানে তিনি কবির যথার্থ অবসর পেয়েছেন সেই সব মুহূর্তেই তিনি জয়ী।' আপনার প্রথম চিঠির এই কথাগুলিতে আমার মন পূর্ণ সম্মতি জানিয়েছিলো: কেননা প্রথমে জিভাগোর কবিতাগুচ্ছ প'ড়ে আমি পাস্টেরনাককে যতখানি ভালো-বেসেছিলাম, উপন্যাসটি প'ড়ে উঠে তার চেয়ে বেশি ভালোবাসিনি। কবির লেখা একটি উপন্যাস, 'জিভাগো': এই হ'লো ওর সবচেয়ে খাঁটি বর্ণনা; কবি, নিছক কবি, একান্তভাবে কবি—এই হলেন পাস্টেরনাক। কিন্তু এখন আমি ভেবে পাচ্ছি না যে কেমন ক'রে, মাত্র কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানে, সেই কবিতার বিষয়েও আপনার মন বিতৃষ্ণ হ'য়ে উঠলো। 'রাত্রে ঘরে ব'সে ভডকা খেলে কী হবে, ঐ মানবতহীন অবস্থায় লেখা কবিতার দৌড়ও তথৈবচ'—এই কথাটির আমি কী অর্থ করবো, এর ভাব ও ভাষাকে কেমন ক'রে আপনার প্রতিভা ও চরিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে নেবো, তার কিছুই ভেবে পাচ্ছি না। 'ভডকা খাবার জন্যেই কবিতা খারাপ হয়েছে', 'ভডকা খাওয়া সত্ত্বেও কবিতা খারাপ হয়েছে'—এই দুটো প্রস্তাবই সমান অর্থহীন; কেননা জল ও বিশুদ্ধ গোদুগ্ধ ছাড়া অন্য কিছু যাঁরা পান করেন না এবং যাঁরা তীব্র সুরায় আসক্ত, এই উভয় শ্রেণীর মানুষই ভালো এবং খারাপ কবিতা রচনা করেছেন ও ক'রে থাকেন, কখনো বা একই মানুষ উভয় প্রকার; আমি যতদূর জানি, কবির পানীয়-সংক্রান্ত অভ্যাসের সঙ্গে তাঁর কবিতার দোষগুণের কোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্বন্ধ নেই। এবং জিভাগোর কবিতাও 'তথৈবচ', অর্থাৎ 'মানবতহীন', এ-কথা বলতেই বা কী বোঝায়? ধ'রে নেয়া যাক জিভাগো 'অমানুষ', অর্থাৎ 'লোক ভালো নয়'; কিন্তু লোক ভালো না-হ'লে ভালো

কবিতা লেখা যায় না, এমন কোনো প্রমাণ কি আমরা পেয়েছি? আপনি শেলির উল্লেখ করেছেন, কিন্তু শেলির অবিবেচনায় তাঁর প্রথম স্ত্রীকে জলে ডুবে মরতে হয়েছিলো; আপনি গ্যেটের উল্লেখ করেছেন, যে-গ্যেটে সজ্ঞানে দগ্ধ করেছিলেন বহু নারীর জীবনযৌবন, এবং বহুকাল পর্যন্ত রক্ষিতাকে পত্নীর মর্যাদা দেননি। যে-সব জীবনী স্কুলের ছেলেদের পড়ানো যায় তা সাহিত্যিকদের মধ্যে না-ই বা আমরা সন্ধান করলাম; আপাতত শুধু এটুকু দেখা যাক—আর সেটাই বোধহয় বেশি জরুরি—কবিতা তাঁরা কে কেমন লিখেছেন। আর সেদিক থেকে বিচার করতে গেলে যেমন গেটেকে নড়ানো যাবে না, এবং শেলিকেও মানতেই হবে, তেমনি পাস্টেরনাক বা জিভাগো নামক কবির রচনাও অপ্রতিরোধ্য, তর্কাতীত ও তুমুল। অবশ্য এটা অনুভূতির কথা, কোনো যুক্তির কথা নয়; শুধু যদি আপনি বলেন—'না, আমার তেমন মনে হয় না', যদি বলেন, 'জিভাগোর কবিতা স্ববিলাসী, বাক্‌শীল ও বিলুব্ধ', তাহ'লে আমি তেমনি ভাবে চুপ ক'রে থাকবো যেমন চুপ ক'রে থাকি টলস্টয়ের সামনে, যখন তিনি 'কিং লিয়র'কে হাস্যকর ও অপাঠ্য ব'লে ঘোষণা করেন। কিন্তু একটি অনুরোধ আপনাকে: একবার ভেবে দেখবেন টলস্টয়কে জগতের লোক কেন মনে রেখেছে—তাঁর সাধু মতামতের জন্য, না তাঁর উপন্যাসরূপী 'পাপাচরণে'র জন্য?

প্রীতিনমস্কারান্তে,

বুদ্ধদেব বসু

তিনটি কবিতা

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

কুয়োতলায়

আরবার তুমি দাঁড়াবে কুয়োতলায় ?
শহরে যাবে না,
বাজি পোড়ানো দেখবে না,
বিদেশী কবির
কৌতূহলের শখ মেটাবে না।

কে যে আমায় এখনো কথা বলায়,
নিশ্বাসে প্রশ্বাসে
ভীষণ মাঘে একান্তে
প্রখর জ্যৈষ্ঠেও
হরবোলার কর্তব্যের ভান।

সকলি বাঁধা অটুট শৃঙ্খলায়,
একটাও খড়কুটো
নড়াতে আমি পারবো না,
একটিও চড়ুই
অধীন করা আমার সাধ্য নয়।

বুক যদিও পাহাড়, তাকে টলায়
আজানু প্রার্থনা—
অল্প কথাও ভাঙতে পারে
পাহাড় দিয়ে পাহাড়,
আর-একবার দাঁড়াবে কুয়োতলায় ?

একটি কথার মৃত্যুবার্ষিকীতে

তুমি যে বলেছিলে গোধূলি হ'লে
সহজ হবে তুমি আমার মতো,
নৌকো হবে সব পথের কাঁটা,
কীর্তিনাশা পথে নমিতা নদী !
গোধূলি হ'লো।

তুমি যে বলেছিলে রাত্রি হ'লে
মুখোশ খুলে দেবে বিভোর বিভা,
অহংকার ভুলে অরুন্ধতী
বশিষ্ঠের কোলে মূর্ছা যাবে।
রাত্রি হ'লো॥

মাতৃভূমি

পাঞ্চেন লামা যা-ই বলুন
বাধা দিন কি না দিন,
আমি এখন ঢেউয়ের মতো স্বাধীন,
আর হবো না অনূদিত মুরারি ত্রিভঙ্গ।

তুমিও নিঃশঙ্ক,
চুড়ি খুলে হ'তে পারো মসৃণ করুণ,
মায়ের বাক্সে পুনর্বাসন লভুক তব কঙ্কণ
নিষ্কলঙ্ক।

দুর্ঘটনা ঘটে ঘটুক হ্-য-ব-র-ল,
পঞ্চ ইন্দ্রিয়েরে বলি : 'কলকাতা চলো'।
সার বেঁধে তিব্বতের ঘণ্টা টানাই বারান্দায়,
হাওয়ায়-হাওয়ায় বাজুক জলতরঙ্গ ॥

তিনটি কবিতা

আলোক সরকার

অনিকেত

এই যে-সম্পন্ন ফুল কোনখানে কুঁড়ি ছিলো, কোনখানে গাছ ?
সারাদিন খুব বৃষ্টি হ'য়ে গেছে যেন।
ঈশ্বর, তোমারই মতো একা, অন্যমন নিরুদ্ধ নিশ্বাস
বিকশিত হ'য়ে আছি। অথচ প্রণত হাওয়া কোন লাল বারান্দার শাদা।
তুমিও কি এ-রকম ভেবেছো কখনো ?

আমার শরীর ভ'রে ছায়া নামে। আমি বেশ বড়ো ঘরে আছি।
ওই দেবদূত, জানি, কাল ভোরবেলা শান্ত উঠে
আবার একটি ফুল পাবো, সে আমাকে দেবে, আমি তাকে ভালোবাসি।
কবে যে আমরা পরিচিত, সে কোন পার্কের ধারে, ভিড়ের রাস্তার দ্রুত বাঁকে
মনেই পড়ে না। তবু খর আলো. না কি নীল ঘাস ? ভাবি যাবো একছুটে ?

কিছু কি সম্ভব হয় সহসা ? আমার চিন্তা কাঁপে।
ঈশ্বর, তোমার মতো আমিও নন্দিত উদ্ভাসিত একটি দিঘির।
বিমূর্ত সৌরভী ফুল গন্ধ-আলো একান্ত সংলাপে
আমার প্রিয়ার মতো। এই সব সার্থকতা, সম্পূর্ণতা, তবু কেন, কেন
অভিমানী বেলাশেষ, মেঘের আনম্র দূর, অনিকেত মলিন নদীর।

মন্দার

প্রতিটি সিঁড়ির সঙ্গে তবু আজো পরিচিত নয়। এই বাড়ি
এই সিঁড়ি অথচ সতেরো মাস স্নিগ্ধ আত্মীয়তা।
খুব যেন স্বাভাবিক। দোতলার জানালার সমৃদ্ধ আকাশ
করো সমর্থন করো। ঘুমিয়ে পড়বো আমি, স্বপ্নে বালিয়াড়ি

পার হবো—জ্যোৎস্নায় একক মূর্ত নীল সম্পূর্ণতা।
কেন যে কুকুর ডাকে সারা রাত প্রভুভক্ত নীরক্ত বিশ্বাস
বুঝতে পারি না। আমি বুঝতে পারি না কারা প্রেতের মতন
সমস্ত দেয়ালে হাঁটে, ফুলদানি ভাঙে, শান্ত পর্দার কাপড়
ছিঁড়ে কুটিকুটি করে—আর কী তুমুল শব্দ অন্ধ প্রতিবাদ।
আমি কি কখনো তবে ঘুমোবো না? তুমি মন্দার ভীষণ
বছরে-বছরে রুগ্ন রক্ত জেলে, ফের জেলে, স্থবির সংবাদ
প্রচারিত ক'রে তুমি আমাকে কি ব্যঙ্গ করো, তোলো হিংস্র ঝড়?
জানি না আমার গান কোনখানে! সমস্ত বিছানা
সাপের সাম্রাজ্য, ছাখো দন্তিল পশুর, যেন আদিম জননী
ভয়ার্ত, পুত্রের দৃষ্টি কৃতজ্ঞতাহীন, স্বার্থপর, কামনা-কুটিল
আর সমুদ্রের আর বর্বর পাথর, রক্ত, দাবদাহ বীভৎস অজানা।

দেয়াল-ঘড়ি

যখন ঘুমিয়ে থাকি দেয়াল-ঘড়িটা বন্ধ হ'য়ে যাক, এমন চাই না।
খুব আলো হয়েছে আকাশে।
ছু-চোখে আলস্য এক দাবি যেন, ধূপকাটি জলার মতন
একাগ্র। মালতীফুল, তোমার বিশ্বাসে আমি নদী হ'তে কখনো পারি না
এই সব কথা মনে আসে।

অন্ধকারে উদ্ভাসিত নীল ছবি, নীল ছবি, অথবা জানি না।
যখন ছিলেম জেগে
আমার চোখের তাপে কুঁড়ি থেকে ফুল হয়েছিলো।
এখন নিমগ্ন দীপ্তি মন দিয়ে কাজ করে? প্রতিশ্রুত সংহত আবেগে
দূরে নৌকো যায়, নৌকো ফিরে আসে, নৌকো দূরে পারি দিলো?

গোরুর গাড়ির চ'লে-যাওয়া, জীর্ণ চাকা, শবদেহ বহন করার রাত্রি—
ব্যাধিমুক্তি কবে যে সম্ভব।
জানি না দেয়াল-ঘড়ি শব্দ করে কিনা। অন্ধকার, অন্ধকারে নন্দিত সকাল
আমি স্পষ্ট দেখি যেন সব জানলা খোলা, আলো, দীর্ঘ কলরব
পাখির ওড়ার গতি, ধান কেঁপে-ওঠা, ছেলেটি-মেয়েটি,
ছু-টি হাত, আংটি, উজ্জ্বল প্রবাল।

আর্তুর র‍্যাঁবো-র চারটি কবিতা

ভোর

আমি এ গ্রীষ্মের ভোর ধরেছি আশ্লেষে।
তখনও নড়েনি কিছু হর্ম্যের ললাটে। জলখণ্ড স্থির মৃত। বনপ্রান্তরেখা
থেকে ছায়াদের তাঁবুগুলি গোটায়নি কেউ। জীবন্ত চঞ্চল উষ্ণ শ্বাসগুলি
জাগাতে-জাগাতে আমি চলি। মিনারে হীরকখণ্ড চেয়ে দেখল, জেগে উঠল
ডানারা নীরবে। ঠাণ্ডা লঘু ধূসর আভায় যেন কখন ভরেছে পথখানি;
আমি ওই পথ ধরি প্রথমে—একটি ফুল, সে আমায় বললে তার নাম।
ঝর্নাটি অর্জুনবনে চুল বাঁধে দেখে হেসে মরি : রূপালি শিখরে আমি
ঈশ্বরীকে দেখে চিনলাম।
পথে হাত নেড়েছি, এবং পরে একটি-একটি ক'রে তাঁর খুলেছি গুণ্ঠন;
দূর সমতলবাসী কুক্কুটের কাছে আমি ঘোষণা করেছি তাঁর কথা। তিনি
কিন্তু পালালেন নাগরিক মিনারে গম্বুজে, আর আমি কাঙালের মতো
ছুটি তাবৎ মর্মরমঞ্চে, তাঁর অনুগামী।
শীর্ষে পথের প্রান্তে ছাতিমবনের কাছাকাছি বিশাল বরাঙ্গখানি আমি তাঁর
স্তূপাকার উত্তরীয়ে আচ্ছাদিত ক'রে, পেলাম ঈষৎ স্বাদ শরীরের। ভোর
সেই বালকের সঙ্গে বুঝি ঝ'রে পড়লো অরণ্যানীমূলে।
ঘুম ভেঙে যেতেই—দুপুর।

রাজেন্দ্রানী

চমৎকার সকালবেলা কোনো এক ভদ্রলোকের দেশে দুজন যুবক-যুবতী
এসে উপস্থিত; সাধারণ্যে দাড়িয়ে ওরা চিৎকার ক'রে উঠলো, 'বন্ধুগণ,
ইনি রাজেন্দ্রানী হোন, আমার বাসনা!' 'আমার বাসনা রাজরাজেশ্বরী হ'তে!'
যুবতী খুশিতে কাঁপছে। সব বিকাশের কথা, সমাপিত অভিজ্ঞতা যুবক
শোনালো বন্ধুদের। অভিভূত, ওরা ঢ'লে পড়ে পরস্পরে।

এক পরিপূর্ণ সকাল ওরা রাজত্ব করেছে বাস্তবিক—ঘরে-ঘরে লাফিয়ে
উঠেছে লাল উজ্জ্বল পতাকা। আর এক সম্পূর্ণ বিকেল, যখন উভয়ে ওরা
তালীবনপ্রান্তে ফিরে গেলো।

বিদায়

ঢের দেখলাম। দৃশ্যেরা সজ্জিত বহুরূপে।
অনেক পেলাম। নাগরিক কোলাহল, রাত্রি, আর রৌদ্রে—প্রাত্যহিক।
কত জানলাম। জীবনের যতিচিহ্নগুলি—হায় কোলাহল, লোচনবিলাস।
এবার বিদায় নবপ্রণয় নূতন কলরোলে।

অধস্তন

বিশাল ব্যক্তিত্ব রাখি, বাস্তব নিরতিশয় বিপদসংকুল,—তথাপি
শ্রীমতী-সন্নিধানে যেতে হয়, যেমন ধূসর-নীল একটি পৃথুল
পাখি শূন্যে ধাই ছাদের কার্নিশে, যেন সন্ধ্যালোকে ছায়াগুলি
ডানায় ছিঁড়েছি।
চন্দ্রাতপমূলে বসি, মুগ্ধ, দেখি চমৎকার অলংকারশোভা—তিলোত্তমানিন্দিত
শরীর; আমি এক স্থূল জরদ্গব, নীলাভ-রক্তিম দন্তমূল,
এবং পলিত রোম, ঘোর দুঃখে—উন্মীলিত চেয়ে দেখি
শিলাস্তম্ভে উজ্জ্বল রজতখণ্ড সূর্যকান্তমণি।
সব ছায়া হ'য়ে যায়, সব কিছু রুদ্ধ জলাধার।
এবং প্রভাতে—আহা আশ্বিনের প্রখর প্রভাত—ছুটে মরি দিগ্বিদিক,
তারস্বরে শানাই নালিকা; না জানি সে কতক্ষণ পরে মূর্খ
রাসভের বক্ষোমূলে ঝ'রে পড়লো বিশল্যকরণী।

অনুবাদ : শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

৩

না

কবিতা সিংহ

না আমি হবো না মোম
আমাকে জালিয়ে ঘরে তুমি লিখবে না
হবো না শিমূল-শস্য সোনালি নরম,—বালিশের কবোষ্ণ গরম।

কবিতা লেখার পর বুকে শুয়ে ঘুমোতে দেবো না!
আমার কবন্ধ দেহ, ভোগ ক'রে তুমি তৃপ্তমুখ
জানলে না কাটা মুণ্ডে ঘোরে এক বাসন্তী অসুখ

লোনা জলে ঝাপসা হয় চুপিসাড়ে চোখের ঝিনুক।

অন্ধকার আছে ব'লে হ'তে পারি চমৎকার দুই
আমি জানি প্রতিমার মতো এই নীল মুখ তুমি দেখবে না
তোমার বাঁ পাশে তাই নিশ্চিত পুতুল হয়ে শুই।

যন্ত্রণা আমাকে কাটে, যেমন পুঁথিকে কাটে উই।

দুটি কবিতা

তারাপদ রায়

ঈশ্বরের নিকট নিবেদন

প্রভু, তুমি ত্রিকালজ্ঞ; তুমি জানো
পঙ্গু মূক কিছু আমি নই,
তথাপি আমাকে কেন বাচাল করেছো,
পরমানন্দ হে, মাধব আমার?

নিজের বাক্যের বানে সতত অস্থির আছি, প্রভু,
প্রতিবেশী বন্ধুদের কথা ভেবে মনে দুঃখ পাই:
কী ক'রে যে সহ্য করে তারা
আমার বাক্যের জ্বালা;
আমাকে বাচাল যদি করেছো, মাধব,
সঙ্গীদের ক'রে দিয়ো কালা॥

শোক-সংবাদ

জাঁতিকলে, ক্রুশবিদ্ধ পৌরাণিক যীশুর মতন,
ঘন দূর্বাদলশ্যাম কোনো-এক তরুণ ইঁদুর,
সামান্য শস্যের লোভে প্রাণ দিলো শানিত কাঁটায়।
শিশিরবিন্দুর মতো স্নিগ্ধ দুই চোখে
মুগ্ধ প্রেমনিবেদন করেছিলো সে-ও
পরিচিতা প্রতিবেশী কোনো সঙ্গিনীকে,
ঠাণ্ডা এক ঘনিষ্ঠ সন্ধ্যায়।

এক কণা শস্যখণ্ডে, এক বিন্দু জলে
আর-কোনো তৃপ্তি নেই প্রেয়সীর নিবিড় প্রণয়ে।
শীতের বিষণ্ণ রোদে, উঠোনের অস্পৃশ্য কোণায়
নোংরা আবর্জনা শুধু; কাকের কর্কশ কোলাহলে
সেই মুগ্ধ প্রেমিক এখন
উপাদেয় খাদ্য এক রক্তে-মাংসে মাখানো যৌবন।

দিল্লির উপকণ্ঠের একটি দুপুর

বিকাশ দাশ

চেতনার মাঠ জুড়ে বুভুক্ষু ছায়ারা ঘোরে
ইতস্তত ছড়ানো দুপুর;
আচ্ছন্ন শূন্যতা ধূ ধূ—ঝিমোনো রেলের সাঁকো
রোদে ক্লান্ত দিগন্তের দূর।
অস্তিত্বের ডাঙা ধ'রে ম্রিয়মাণ প্রাণগুলি
ধুঁকে মরে দুঃস্বপ্নের চরে,
ম্লান হাসপাতালে শুয়ে মুমূর্ষু রোগীর মতো
যন্ত্রণার পাণ্ডুর প্রহরে।

স্নায়ুর তিমিরে জ্বলে ধিকিধিকি সারাক্ষণ
তীব্র বিষ—নীলকণ্ঠ জ্বালা;
অবচেতনায় ডোবে যমুনার বালুচর
জনপদবধূ শঙ্খমালা।
হলুদ ধুলোর ঝড়ে মুছে যায় মাঠ ঘাট—
কাৎরে ওঠে বন্দী মানবক।
মসজিদে গম্বুজে হাঁটে প্রেতমূর্তি অহরহ
জানালায় মৃত্যুর কুহক।

রক্তে গাঢ় অন্ধকারে নামে তবু ঝাঁকে-ঝাঁকে
আফিমের নেশা-লাগা ঘুম;
অস্পষ্ট প্রাণের সাড়া বুকে নিয়ে জনপদ
অলৌকিক নীরব নিঃঝুম।

বাতাসে ফুলের ঘ্রাণ, ঘুঘু-ডাকা দুপুরের
সুরে বাজে ঝাউয়ের সেতার ;
স্নেহ, দুঃখ, ভালোবাসা নিয়ে তবু ইতিহাস
ডিঙোয় কালের ভাঙা পাড় ।

দুটি কবিতা

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

একটি স্বপ্নের জন্য

(শ্রী রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী-কে)

'অলৌকিক জাদুবলে সব কিছু স্পষ্ট হ'য়ে যাবে'
এ-রকম মনে হয়, এক ভিড় রাস্তা ঠেলে এসে—
স্বচ্ছবাস মেয়েদের ততো কি রঙিন লাগে, যদি মাথা ধরে,
কতোটা সহ্য হয়, যদি সব বুদ্ধিমান জ্ঞান বিলি করে—
তবু এই তর্ক, ঘাম, জটিল জটিল সব শব্দ থেমে গেলে
'যেন, কে আসবে' ভেবে, প্রতিটি রাস্তার মোড় ঘুম ভেঙে ওঠে ।

নইলে, কে মেয়ে নিয়ে কোথায় গিয়েছে, কার প্রেমিকাটি ভালো—
এতে কি এগোয় কিছু, অথবা পেছোয়, কিংবা বারোটা-পঁচিশে
ভাড়াটে গায়ক তাঁর গান ভুলে যান কোনো রেডিও-স্টেশানে ।
জীবন, শাস্ত্রের মতে, একদিন তর্কাতীতভাবে
নিজেকে প্রমাণ করে সুখদুঃখ-কাঁটাতার হঠাৎ ডিঙিয়ে,
কিন্তু সেই নীল ঘোড়া, তোমার নিজের, কিংবা তোমার আমার
কোনো বান্ধবীর আছে ? আছে কি আমার ?

দাম না-দিয়েই, যদি বেঁচে থাকবার এক ঝাঁঝালো আরক
আমরা গলায় ঢেলে প্রতিদিন ব্যস্ত হ'য়ে থাকি,
সময়, সুযোগ, কিংবা মাথার খুলির কোনো বিশেষ আকারে
আমরা কামুক, কবি, পাঁচতলা বাড়ির মালিক,
তাহ'লে, হিসেব ভুলে, একদিন জ্বরের তাড়সে
হঠাৎ চ্যাঁচাই কেন ? কেন ভাবি—বৃষ্টি নেমে এলে,

কিছু দৈব দয়া যেন গাছের পাতার ছলে শব্দ ক'রে ওঠে,
কেন, সব পারি, শুধু পারি না কেবল সেই স্বপ্ন ভুলে যেতে :
বাইরে কুয়াশা, তবু ভেতরে নক্সা যার স্পষ্ট জ্ব'লে ওঠে।

ঘরে ফেরার পর : একটি স্বপ্ন

যেন কাউকে স্পষ্ট নিয়ে এসে
ঘরে ঢুকলে ; বললে—আহা, বসুন,
তেতে-পুড়ে এলেন রোদে, বাড়িয়ে দিই পাখা—
দেখুন, ঐ কার্পেটটা জলের দামে কিনেছিলাম কবে
আজও কেমন ঝকঝকে, উজ্জ্বল ;
যেন কাউকে স্পষ্ট নিয়ে এলে।

যেন কাউকে স্পষ্ট নিয়ে এসে
ড্রেসিং-টেবিল, দেয়াল, পাশে বারান্দার টবে
ফুলের তোড়া, অন্যদিকে শেলফে একরাশ
বই দেখিয়ে, আপ্যায়নের রীতিতে ঘাড় গুঁজে
ব'লে উঠলে : এই তো বেশ, এখানে থাকবেন—
কিন্তু সেও নাছোড়, যেন মৃদু হাসির পরেই এক ফাঁকে
উঠে যেতে চাইবে, তুমি দু'হাত-পায়ে ধ'রে
বলবে, 'কেন, থাকুন', সেও 'অনেক কাজ' ব'লে
উঠে পড়বে, তুমি পেছন-পেছন গিয়ে
'শুনুন, আহা শুনুন' ব'লে হঠাৎ টাল খেয়ে
নিজের কোনো দেয়াল ধ'রে ত্রস্তে জেগে যাবে—

ঘরের চার দেয়াল জুড়ে ছায়ার তাঁত বোনা ;

জেগে উঠেও তোমার যেন স্পষ্ট মনে হবে
তোমার পাশে যিনি ছিলেন, তাঁকে তুমি থাকতে বলেছিলে॥

দুটি কবিতা

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

দ্বৈত ভাষণ

প্রগল্‌ভ গ্রন্থের ভিড়ে, জীবিকায়, আত্মসমর্পণ।
সময়ে রূপসী ভার্যা, সুসন্তান, নৈতিক উন্নতি,
সংগত প্রতিষ্ঠা, যশ, আকাঙ্ক্ষার বিচূর্ণ দর্পণ,
পরিতৃপ্ত কানে বাজে ক্লান্তিকর সামাজিক স্তুতি।

চতুর্দিকে গার্হস্থ্যের সুকঠিন ক্রূর চক্রব্যূহ
তোমাকে নিহত করে অর্থ কিংবা সমৃদ্ধির ছুরি,
মর্ফিয়ার মতো এক সাংসারিক বিষের সন্দেহ
রক্তের কুটিল কক্ষে ধ'রে ফ্যালে সমস্ত চাতুরী।

চোখ বুজে শুয়ে থাকো কলুষিত আনন্দের পাঁকে
ঘর্মিল মোষের মতো কর্দমাক্ত শান্তির কবলে,
তারপর ম'রে যাবে : আক্ষরিক মৃত্যু বলে যাকে,
পাড়ায় সুখ্যাতি পাবে নির্ভেজাল ভদ্রলোক ব'লে।

কেউ-কেউ বেঁচে থাকে সঙ্গীহীন রক্তাক্ত সম্রাট
অখ্যাতির সিংহাসনে উচ্ছৃঙ্খল, ঋজু, দুর্বিনীত ;
কাঙ্ক্ষিত নারীর বুক, পৃষ্ঠদেশ, গ্রীবা ও ললাট

যন্ত্রণার যৌবরাজ্য চূর্ণ করে খেলেনার মতো।
অসমাপ্ত আলিঙ্গনে নির্বাসিত শরীর, সময় ;
সত্তার সপ্তর্ষি তার রক্তস্রোত আলোকিত করে ;

শোণিতাক্ত শিল্পলোকে সে-ই একা আত্মঘাতী হয়
মৃত্যুর দক্ষিণ বাহু সংকুচিত শেষ কণ্ঠস্বরে।

অসামাজিক

"ভদ্রলোক দেখে-দেখে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি। কারণ
তারা অসহায় কীট।"

—জানালেন কৃষ্ণকান্তবাবু।

অবশ্যই অতি ধৃষ্ট অর্থহীন এ-নেতিবাচন,
আমরা সকলে নাকি নির্দোষ লাম্পট্যে নিত্য খাই হাবুডুবু।

"বিনময়ে সকলেই ছদ্মবেশী আত্মপ্রতারক
সোনার শিকলে বাঁধা সামাজিক রীতিনীতি বোধ,
ভিখারি ও সম্রাটেরা আন্তরিক মূল্যে সমার্থক
গোপনে ভাবের ঘরে সিঁদ কেটে সেজেছে নির্বোধ।"

উক্তিতে অপ্রতিপন্ন কৃষ্ণকান্ত আমার আত্মীয়।

মধ্যরাত্রে ঘরে ফিরে বাড়ান নিরীহ স্ত্রীর শোক
অথচ এ-হেন ব্যক্তি কলঙ্কিত রক্তে শোচনীয়
কোনো মৌল প্রশ্নবোধে জ্বেলেছেন আগুনের শ্লোক।

অধুনা যদিও তিনি অখ্যাতির সর্বশেষ স্তরে
বিচিত্র, বিশিষ্ট, ক্লান্ত, সামান্যের সংঘর্ষে কাতর ;
আগ্নেয় সুরায়, ঠাণ্ডা অবসন্ন নারীর শরীরে—
নিমগ্ন অস্তিত্বে তাঁর শোনেন নিজেরই কণ্ঠস্বর।

স্বচ্ছ পানপাত্র থেকে চৈতন্যের নৈঃশব্দ্যের দেশে
অলৌকিক ট্রেনে চেপে রোজ রাত্রি বারোটার পর
নক্ষত্রের রক্তে ভেজা আদিগন্ত রাত্রির আকাশে
চাঁদের লণ্ঠন হাতে পার হন নগর প্রান্তর।

স্পর্ধিত শোণিতে তাঁর পরিণামে মৃত্যুহীন বোধ
অবচেতনার স্তরে ক্রমান্বয়ে কাজ ক'রে যাবে,
আকাঙ্ক্ষাকে হত্যা ক'রে রাত্রি নেবে শেষ প্রতিশোধ,
সময়ের ঢেউগুলি আলোকিত সাগরে ঘুমাবে ॥

তিনটি কবিতা

রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী

সূর্যাস্ত

জন্ম দিয়ে, জন্ম দিতে-দিতে হয়তো বা ক্লান্ত হ'য়ে,
ন্যুব্জ লাল সূর্যের শহরে একদিন
পৌঁছে গেলো ; একটি কাক তখনো আকাশে,
আয়ত্ত সুন্দরী হাতে শালপ্রাংশু আলোয় রঙিন।

তখনো পৃথিবী ভ'রে মৃত গাভী, তেজস্কর সোনা।
ক্লান্তি হানে গ্রন্থিরস, দশমূল, পারা ;
কী চেয়েছে এ-লোকটি শান্তিহীন জীবনের কাছে,
অর্থ, যশ, হিতৈষণা কিংবা কিছু অসামান্য এ-সকল ছাড়া ?

আমাদের অনেকেই প্রেম নয়—কামজ সন্তান।
এ-কথাই ব'লে গেলো নিভে শুয়ে পড়বার আগে ;
যাকে নিয়ে ঘুমিয়েছি সে-দিব্যতা ক'দিনেই হ'য়ে গেলো ম্লান,
দেখেছি পিতার মুখ—বংশগতি—রক্তের সংরাগে।

স্বাতী তারা

'ফিরে যাও ; সন্তান, গাজর, মুরগি উৎপাদন করো—
মেয়েদের লক্ষ্য ক'রে একজন বিদেশী পণ্ডিত ;
আপ্তবাক্য মেনে নিয়ে আমিও তো স্থির হ'তে চাই
দূর কোনো গ্রামে গিয়ে—সূর্যকরে যেখানে সংবিৎ
বেড়ে ওঠে ঘর বেয়ে আরতির প্রসন্নতায়।
যেমন ধবল হাওয়া ফেরে তার আরক্ত সন্ধ্যায়,

হ'তে চাই তারই মতো কিন্তু কোনো বান্ধবীর হাতে হাত দিয়ে,
নগরের দীপ্ত মাছ তবু যার আত্মার সৌরভ
ছড়িয়ে পড়তে জানে—আর সঙ্গ দেয় ভাবনায়
উজ্জ্বল জলের মতো সহক্রীড় শান্ত মনীষায়।
অথচ যেহেতু আমি জানি সেটা খুব অসম্ভব,
(কে করেছে গৃহস্থালি স্পর্ধাতুর স্বাতী তারা নিয়ে ?)
আপ্লুত পাখির মতো আঁধারের কানে-কানে বলেছি এ-কথা,
প্রেম, তুমি ভালো নও—পরাস্ত নৌবহর যে-অন্তহীনতা—
যদিও গভীর রাতে জাগিয়ে পবিত্রতর মন,
আলো আর মধু দেয় মৌমাছির অশান্ত গুঞ্জন।

ফিরে আসি

বিভক্ত কলসির মতো এ-নগর হবে স্তূপীকৃত।
তবে কেন এত সূর্য অবিরল রক্ত মানোয়ার,
বাতুলের হাত যেন নীলাকাশে দিব্য দরজার
আঘাতে বিষিয়ে গেলো—'ঘর-বাড়ি ভূ-সম্পত্তি হোক,
দূতাবাসে বড়ো চাকরি—' এ-সকল যদি একদিন,
আর তাকে না-পেয়েও অন্নজলে হই পুলকিত ?
একমাথা টাক নিয়ে ধূমপান করে ভদ্রলোক,
যেন সে নির্ব্যূঢ় স্বত্ব নিয়ে আছে কিংবা কোনো ঋণ
নেই তার ; কালের নিয়মে সবই শান্ত হ'য়ে আসে—
সন্তান মরেছে যার সে-মেয়েও কামের উচ্ছ্বাসে
জেগে ওঠে কোনো রাত্রে—ভোর হ'লে ভালো লাগে তার
উনুনের আঁচ, পাখি, রুপোলি আলোর টুকরো গাছে ;
আমরা সব ফিরে আসি বার-বার জীবনের কাছে,
কিছু শুভ্র ক'রে দেয় ক-দিনের সেই অধিকার।

পিতা

শামসুর রাহমান

প্রাণে গেঁথে সূর্যমূখী-উন্মুখতা খুঁজি আজো তাঁকে
সর্বত্র অক্লান্ত শ্রমে। স্বপ্নের মৃণালে মুখ তাঁর
জ্যোতির্ময় কল্যাণের মতো ফুটে অভ্র-শুভ্রতার
অতল সমুদ্রে ডোবে—খুঁজি আজো বিদেহী পিতাকে।
অজ্ঞাত, বিরূপ এই রুক্ষ দেশে মৌন বাসনাকে
নক্ষত্রের মতো জ্বেলে চাই তাঁকে চাই দুর্নিবার
আতঙ্কের মুখোমুখি, যেমন সে মৃগতৃষ্ণিকার
নিঃসঙ্গ পথিক চায় পান্থপাদপের মমতাকে।

তিনি নন জন্মদাতা, অথচ তাঁকেই পিতা ব'লে
জেনেছি আজন্ম, তাই মুমুক্ষু কালের অন্তরাগে
সমর্পিত তাঁরই কাছে। জীবনের সব মধুরিমা
করেছি নিঃশেষ শুধু অশেষ সন্ধানে জ্ব'লে-জ্ব'লে।
তিনি নন বিধাতা অথচ ব্যাপ্ত সত্তার পরাগে—
তবে কি উপমা তাঁর চৈতন্যের ভাস্বর নীলিমা ?

ওরা

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

পাশের বাগান থেকে কোনো দৃশ্য চেয়ে না, জানালা,
কেউ তৃষ্ণা—সুখী হবে, হবে মুগ্ধ চিত্রিত চেতনা,
হায়, দুঃখ! তুমি তাকে দর্পণের গভীরে ঢেকো না,

ওরা কেউ সুখী নয়; পাখি, ফুল, গ্রহণের মালা।

রক্তে রাখি বিষণ্ণতা; সব ছবি কে অমন ভাঙো!
কেউ প্রেম, সুখী হবে, তোমার চিতার বুকে জ্ব'লে
শ্মশানের অগ্নি···আহা, স্মৃতি বৃথা অনুরাগে রাঙো
এখনো রজনী এলে নিষিদ্ধ ফলের বৃক্ষ সতীদেহে দোলে;
তবু তৃষ্ণা বুক থেকে নেমে গিয়ে হোয়ো না জানালা—

ওরা কেউ সুখী নয়; পাখি, ফুল, গ্রহণের মালা।

অথচ সম্রাট কেউ ব্যর্থতার অগ্নি থেকে ছাই তুলে আনে
দু-হাতে দু-মুঠো স্পর্ধা কী স্বরাট ছুঁড়ে দিয়ে সাজায় আকাশ,
স্বপ্নের কবর খুঁড়ে অবিচল সে বসেছে নিজের ছায়ায়,
পাশে, সঙ্গী ভালোবাসা; দাহ মদ; কণ্ঠহীন বীণা
যে আর বাজবে না, যাকে মৃত্যু তার অনাহত গানে
জাগাতে পারবে না আর; এখনো সম্রাট কেউ পাশে যার কণ্ঠহীন বীণা!

তখনো বাগান থেকে কোনো দৃশ্য চেয়ো না, জানালা,
হয়তো নিঃসঙ্গ কেউ বুকে যার ফুটে আছে ফুল,
হয়তো তৃষ্ণার তুমি, প্রেম তুমি, সত্তার মুকুল
ফোটাই, করুণ ঝরে; ফোটাই, রক্তাক্ত ঝরে,—তবু, হে নিরালা,

ওরা কেউ সুখী নয়; পাখি, ফুল, গ্রহণের মালা।

দুটি কবিতা

পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য

কোনো ভীরুর ভাবনা

সে-কথা ভাবতে ভয় লাগে, ভয় লাগে!
দুই চোখে ছানি বরং পড়ুক আগে,
পেশীগুলি যাক শুকিয়ে ঘাসের মতো,
ফুটো ফুসফুসে ক্ষত হোক একশত,
কিছুতেই যেন এ না হয় তার আগে
যে-কথা ভাবতে ভয় লাগে, ভয় লাগে।

পদ্মপাতায় শিশিরের মতো আয়ু,
তত্ত্ব শোনায় এ-দেশের জলবায়ু;
আবেগী চোখের আর্দ্রতা যৌবন,
কখন সে এসে মিলায় জানে না মন;
ঘরে বাতি যদি নিবে যায় তারও আগে,
সে-কথা ভাবতে ভয় লাগে, ভয় লাগে।

দু' ভরি সোনার সুখাতুর সংসার,
এক রতি তার খসলেই মার-মার!
মেহেদি-বেড়ার এক কোণে নিরিবিলি,
সবুজ চারায় ফোটাই কোমল লিলি;
তা-ই যদি ঝরে বিকেল যাওয়ার আগে,
ভাবতে পারি না, ভয় লাগে, ভয় লাগে॥

৪

দুপুরে

সে এখন পরবশ : বিকিয়ে দিয়েছে স্বাধীনতা।
কেউ তো বলেনি তাকে প্রতীক্ষার প্রদাহ এমন!
সেই রৌদ্রে মাটি ফাটে, চৌচির নিটোল হৃদয়।
বিকেলের শান্ত নদী সেথানে সুদূর ; তার ঢেউ
এই পোড়া মাটি ছোঁয় না। কাঠঠোকরা তাই ডেকে যায়,
অনন্ত কালের কানে সমাচার পাঠাবে, যেথানে
গিনিপিগ খেলা করে জুনিপার গাছের ছায়ায়॥

পোল এলুয়ার-এর তিনটি কবিতা

দৃষ্টান্ত

চিরদিন এমনিই কি হ'য়ে আসছে না
দিনগুলো কাটছে ভালোবাসার স্পর্শটুকু না-পেয়ে
প্রতিটি প্রত্যুষ অক্ষমণীয়
প্রতিটি সোহাগই অশোভন
আর প্রাণখোলা হাসিমাত্রই অভিশাপ।

আমি নিজে শুনছি আর তোমাদের শোনাচ্ছি
আমাদের নির্জনতার বিরুদ্ধে
পথ-হারানো কুকুরের মতো চীৎকার করে
ঘাসের যেমন বৃষ্টিধারার
তার চেয়ে আমাদের ভালোবাসার
ঢের বেশি প্রয়োজন ভালোবাসা পাওয়ার।

শান্তির বৃত্ত

আমি পার হয়ে এসেছি অনাদরের তোরণগুলি
আমার তিক্ততার তোরণগুলি
তোমার কাছে আসতে তোমার ওষ্ঠে চুম্বন এঁকে দিতে
নগরী পরিণত হয়েছে আমাদের ঘরের কুঠুরির মাপে
সেখানে অমঙ্গলের অসম্ভাব্য জোয়ার
রেখে যায় পুনরায় নিশ্চিতির ফেনা

আমার শান্তির বৃত্ত তুমি
তুমি আবার আমাকে শিখিয়ে দাও
মানুষের কী কাজ আমি হতাশ হই
আমার মতো কেউ আছে কিনা জানতে গিয়ে।

দেহ

এ-অঞ্চলটায় এখন গ্রীষ্মকাল
পাখিদের খাঁচা থেকে উঠছে গান
পাখিদের প্রাসাদ থেকে কাকলি
জাদুকরীর নদী
যার প্রবাহ পুড়ছে আমার দুই করতলে

সে কি তমস্বিনী
কঠিন রক্তমাংসে গড়া
নীল রেখায় চিহ্নিত
গতিবেগে কঠিন সোনালি
একটি দোপাটি
সন্ধ্যাটা আঙুরের আদরে মাখানো

সে কি শুভ্রা
কোমল লাল কমলার আভা
যাকে উষ্ণতা দুর্বল ক'রে ছায়
পরিষ্কার ঘাস নিশ্চল মুক্তো
এক একান্ত সৈকত
কাপাস-রং আকাশ থেকে ঝ'রে পড়ছে

কোনো খেলাই বিভ্রান্ত করে না আমাদের
আমাদের অস্ত্রের সামান্যই অবসর
এই মনোরম নির্মেঘ নিদাঘ
গ্রীষ্মের কতো কাজ।

অনুবাদ : গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

শববাহী

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

বৃষ্টিপড়া পথের উপরে সন্তর্পণে পা ফেলে চলেছি আমরা—
প্রতি মুহূর্তে পা পিছলে যাবার ভয়।
বৃষ্টি ঝ'রে পড়ছে আমাদের মাথায়, মুখে, বুকে,
আমাদের গা থেকে গড়িয়ে তলার কাদায়।
আমরা সন্ত্রস্ত, ভীত,
—আমাদের কাঁধে হাজার বছরের এক মৃতদেহ।
তার ভারে আমরা অবসন্ন,
বৃষ্টিপিছল পথে আমরা ক্লান্ত,
এবং শ্মশান এখনো অনেকদূর।

বৃষ্টিঝরা মাঠ আমাদের দু'পাশে প'ড়ে রইলো—
আমরা এগিয়ে চলেছি। আর তখন
সবুজ মাঠ কুমারী মেয়ের মতো ব্রীড়াবনত মুখ লুকিয়ে
চুরি ক'রে দেখতে লাগলো আমাদের।
কয়েকটি ঘাসফুল সেই কুমারীর উদ্গত যৌবনের মতো
শঙ্কায় নিজেকে লুকিয়ে রাখলো,
যেন মৃদু প্রত্যাখ্যানের ভান ক'রে ডাকতে লাগলো আমাদের।
আমার সমস্ত অন্তরাত্মা বললে, যাই।
এই হাজার বছরের মৃতদেহকে নামিয়ে রেখে
তোমার সলজ্জ বুকে এক আগামী সম্ভাবনার দায়িত্ব নিই,
যাই, যাই, যাই।
সঙ্গীদের আমি চেঁচিয়ে বললাম,
এই ভার আর বহন করতে পারছি না,
বিশ্রাম নেওয়া যাক কিছুক্ষণ।

বৃষ্টির শব্দে তারা আমার কথা শুনতে পেলে না,
তেমনি সন্তর্পণে পিছল পথে পা ফেলতে লাগলো—
শ্মশান এখনো অনেকদূর।

বহুক্ষণ সেই শবের সান্নিধ্যে থেকে
আমাদের চোখ তারই মতো অপার্থিব, বিস্ফারিত।
আমাদের একদিকে এক ধূসর পাহাড়
তার ওপার থেকে সমুদ্রকল্লোল ভেসে আসছে।
আরেক পাশে দিগন্ত-সীমায়িত অরণ্য
তাতে শ্বাপদের স্বর।
বিস্ফারিত চোখ সমুখে ঠেলে রেখে আমরা এগিয়ে চললাম—
বুকের মধ্যে তোলপাড় ক'রে ডাক দিতে লাগলো সমুদ্রকল্লোল।
তার ধ্বনি আমার বুকের মধ্যে প্রতিধ্বনি তুলে ডাকলে,
উদ্বেল ক'রে তুললে আমার রক্তস্রোতকে।
সঙ্গীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখলাম,
মৃতদেহের আড়ালে তাদের মুখ দেখা গেলো না।
তারা শুধু সামনে পা ফেলছে—
শ্মশান এখনো অনেকদূর।

অবাক চোখ মেলে এই বৃষ্টির মাতামাতি দেখলে এক নিটোল সরোবর,
তার একশো সাতটি নীলপদ্মের কণ্ঠহার দুলতে লাগলো।
আমার বুকের খাঁচার মধ্যে এক মহাপাগল বললে—
ওঠো মাঠ, পাহাড়, সমুদ্র, আর পাগল সরোবর,
আমি তোমাদের,
মৃত্যুতেও নিজেকে মেলে দিয়ে আর ছড়িয়ে দিয়ে
আমি তোমাদের।

বিশ্বাস না-হ'লে
রামভক্তের মতো আমিও বুকের খাঁচা ভেঙে দেখাতে পারি
সেখানে তোমাদেরই প্রতিচ্ছবি।
যদি বলো, তাহ'লে
আমার একটি চোখ উপড়ে সম্পূর্ণ করি তোমার নীলপদ্মের কণ্ঠহার।

সেই হাজার বছরের মৃতদেহের চাপ দিয়ে
আমার সঙ্গীরা তবু আমায় যন্ত্রচালিতের মতো সামনে নিয়ে চললো—
শ্মশান এখনো অনেকদূর।

একচক্ষু

গোপাল ভৌমিক

বনের মালিক ছিল না সে :
ছোটো একটি গাছেই
সকল প্রেম উজাড় ক'রে
হয়তো বা সে বাঁচেই।
আমরা দেখি শুধুই খোলা চোখে ;
ধোঁকার মতো তাই তো মনে হয় :
যেহেতু যাকে সে ভালোবাসে,
যাকে দেয় সকল সঞ্চয়
প্রতিদিন সে শুধু শুকোয়।
অথচ সাধনা তার অবিরাম চলে,
প্রাণ-ক্লোরোফিল দিতে
রোদে পোড়ে, ভেজেও সে জলে।

শ্রম তার কম নয়,
নিষ্ঠাও নয় সাধারণ ;
অথচ সে ব্যর্থ হয়
দ্বারে দেখে মৃত্যুর শ্রমণ।
সে যাকে চেয়েছে তাকে
দিয়েছে সে জল ও জীবন,
সেখানে গোপনে কবে
বাসা বেঁধে ছিল যে মরণ
সে-কথা ছিল না জানা :
পীতাভ পাণ্ডুর মুখে
নানা প্রশ্ন তাই দেয় দানা।

গাছ মৃত।
বন আছে,
আছে সে নিজেও :
হয়তো বা রোদে পুড়ে
বৃষ্টিতে ভিজেও
বনে-বনে ফেরে সে একাকী ;
হয়তো পেয়েছে বন,
গাছ তাকে দিয়ে গেছে ফাঁকি।

তিনটি কবিতা

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

শয়িত বিষাদ

স্তিমিত সাগরে দীর্ঘ ভেসে আছো, শীতল প্রতিমা।
প্রবল তৃষ্ণার জ্বালা, কিন্তু জলস্পর্শের অরুচি
ললাট কুঞ্চিত রাখে ; ভাসে ফল লক্ষ্যহীন স্রোতে।
কে চুম্বন করে ওষ্ঠে চোখ খুলে দেখে না কামিনী,
কেশরাশি নেমে যায় নিরুৎসুক গভীর পাতালে।

কামার্তের মতো স্মৃতি বক্ষের রেশম বস্ত্রে ছিন্ন করে মুখ
সব দেহ খুলে-খুলে অবিরাম খোঁজে প্রিয়তমা।
বড়ো অন্ধকার লাগে ; কারা যেন ধীর রক্তে গুপ্ত আলো ফেলে
বিস্ফোরক প্রাণকণা নিরন্তর হরণ করেছে।
জঙ্ঘায় বিপুল শীত শুয়ে থাকে তুষারপ্রান্তর।

কোনো শব্দ করো নাই শুধুমাত্র স্ফুরিত অধরে
আমাকে দু'চক্ষে দেখে কণামাত্র হেসেছো, প্রতিমা।
দুই পাশে ভাসমান বাহুলতা—দুটি মৃত পরীদের দেহ ;
কেশরাশি নেমে গেছে নিরুৎসুক গভীর পাতালে।

নীল পাখি

সেই চক্রাকার ঘোরা, বিশাল আকাশে কোনো বৃক্ষ নেই
ডালে বসি। চঞ্চু নীল, অবিরাম মেঘের পাথরে
করুণ ঘর্ষণ লেগে। মাঝে-মাঝে জটিল বিদ্যুৎ
সোনার খোলস ছেড়ে তাড়া করে আকুল সর্পিণী!

মনে পড়ে, মুখে মৃদু উদাসীনতার আলো
করতল থেকে জলে ভাসায়েছো সোনার খাঁচাটি।

কত পুষ্প নিরাকার ; কেউ মৃত আকস্মিক বসন্তপ্রভাতে…
বিপুল শূন্যের ক্ষোভে ধ্বনি জাগে, হে বৃন্ত আমার,
কী অদ্ভুত মুকুলিত হৃদয়ের সুগন্ধ, বয়স
ফুটেছিলো নেত্রপাতে ; কে যেন আমার মুখ ঊর্ধ্বে ধরেছিলো—
লঘু বৃন্ত, করতল ঝ'রে গেছে হলুদ আঘাতে!

সেই চক্রাকার ঘোরা ; বিশাল আকাশে কোনো বৃক্ষ নেই
ডালে বসি। হে নিশ্চল, মুখে মৃদু উদাসীনতার আলো
কিছুকাল বন্দী রাখো করযুগে, ওষ্ঠে, বুকে ; যুগ্মতা আমার,
সমস্ত আকাশ, দ্যাখো, নীল পাখি সোনার খাঁচায়।

মুখের বর্ণনা

ভেসে যেতো মুখখানি রূপে লোভে উন্মাদ প্লাবনে
তীক্ষ্ণ নাক সুমধ্যমা রক্ষা করে তটভূমি উন্নত শিলায় ;
দুই পাশে ধ'রে রাখে উজ্জ্বল ঝটিকা,
দ্বিখণ্ডিত করে লোভ ; নম্র হয় মুখে ব্যাপ্ত বিপুল গর্জন।

বামে চক্ষু সুবিস্তৃত ; সন্নিকট দক্ষিণ অঞ্চলে
অন্য সহোদরা থাকে, কর্ণে বৃন্তচ্যুত তারা উজ্জ্বল লুব্ধক।
একটি হৃদয় নিয়ে বাস করে দীর্ঘ কাল মিলিত যুবতী।

নিম্নে ওষ্ঠ। চিবুকের রমণীয় ঢালুর শিখরে
স্ফুরিত রক্তিম ফল ; ঈশ্বরের জান্তব নখরে চিরে আছে।
উড়ে পড়ে বহু পক্ষী, প্রাণী, চঞ্চু ; বিপুল আহার
ফুরাবে না। যদি হয়, শুষ্ক হবে ; ততক্ষণে বহু বীজ
ফুটে উঠবে গ্রীষ্মে, শীতে মন্থর শাখায়।

পার্শ্বে গণ্ড বৃত্তাকার। বহু অশ্ব তৃষ্ণাতুর, শ্লথ ভগ্নপদ
এই বৃত্তভূমি ঘ্রাণে, ভাবে সরোবর ;
ডোবায় অসংখ্য মুখ ঝাড় তুলে পৃষ্ঠে ও গ্রীবায়।
কিংবা ভাবো এই ত্বকে খেলা ক'রে ঘুমিয়েছে মাতৃহীন বালকেরা—
শাদা-শাদা কোমলতা সব।

মায়া ভোলো, ঘুরে ওঠো চন্দ্রাকার উর্ধ্বের ললাটে
বিপুল জ্যোৎস্নার ভূমি, কত রমণীয় খেলা, মসৃণ বিষাদ !
ক্বচিৎ দু-একটি রেখা প্রখর বালিতে জ্বলে কামার্ত সাপিনী।
দুটি পক্ষী চিরন্তন ডানা মেলে চক্ষের সীমায়
কোনোকালে ফেরেনি কুলায়ে।

প্লাবিত শিখরে নিশা—নির্ঝরিণী গাঢ় অন্ধকার
তরঙ্গে দোলায় কেশ। বহু গন্ধ অদ্ভুত জাহাজে
ঐ অবিন্যস্ত কালো ভেদ করে ঘূর্ণিত চাকায়।
প্রবল বাষ্পীয় শব্দে তৃষ্ণা আসে, জলে নড়ে মত্ত কোলাহল ;
তটভূমি মুখখানি অবিচল, আলো জ্বালে পাহাড়ে, পর্বতে।

নীরব আকাশ

কমলেশ চক্রবর্তী

ঘরেতে আছি ঘরেই র'বো ক্লান্ত একা আমি
বাইরে জল অঝোর ঝরে আকাশ ভরে মেঘে
আমার কবি রচেছে গীত হয়তো কোনো সুধা
হৃদয় তার কণ্ঠে ঢেলে শোনাতে পারে আজ।

বিরহ কিসে, বিরহে গান, বাদলে ভরা রাত
বিরহগীত বন্ধ রাখো প্রণয় হোক মনে
পাতার জলে সবুজ কাঁপে মমতাময় হাতে
জানালা-খোলা জগৎ এসে উপচে ঢোকে ঘরে।

ঘরেতে আছি ঘরেই র'বো ক্লান্ত একা আমি
মরমে বাজে পুরোনো সুর পুরোনো ছবি মাঠ,
তুমি কি এলে ছায়ার মতো নীরব তনু ঢেকে
আঁধার এত এনেছো সাথে কেমনে দেখি বলো :

পুরোনো দিন বাদল-রাতে ঘরের কোণে-কোণে।

তবুও কখনো যদি

অর্চন দাশগুপ্ত

তবুও কখনো যদি আরো আসো কাছে,
ঝিনুকের স্বপ্ন চিরে ছাখো কোন মুক্তো জ'মে আছে,
আরো ছাখো দিগন্তের জলন্ত বলয়ে
সূর্যাস্ত উঠেছে লাল হ'য়ে :
রক্তের উদ্ধত ডালে বাসনার কৃষ্ণচূড়াগুলি
ওর চেয়ে আরো বেশি লাল,
জীবনের আদিগন্ত তুমি ছেয়ে আছো
আকাশের চেয়েও বিশাল।

হয়তো বা মনে হবে ভাষা নেই : রবীন্দ্রনাথের
অতলান্ত গানে ভর সে-শূন্যতা আসন্ন রাতের,
রোমাঞ্চিত মাঠে শোনো ঘাসের সবুজে
লুব্ধ হাওয়া কাকে খুঁজে-খুঁজে
সময়ের প্রান্ত থেকে ছুঁড়ে দেয় আমাদের দিকে
প্রাথমিক ঘাসের শীৎকার—
চেতনার বিন্দু ঘিরে গাঢ় হ'য়ে আসে
বাতাসের অসহ্য বিস্তার।

রাত্রি যদি নামে আর চিহ্নহীন পৃথিবীর সীমা,
একান্তের দেশকাল হারায় দ্রাঘিমা,
অতীন্দ্রিয় অন্ধকারে শরীরের শেষ নেই আর,
সমস্ত স্নায়ুতে কাঁপে বেদনা ব্রহ্মার,
ক্ষণিকের স্রস্ত নীবি অন্তহীন কালের মুঠিতে,
তুমি আমি আর এই সব
কিছুরই অস্তিত্ব নেই : শুধু এক লক্ষ্যের উপায়—
একটি সার্বিক অনুভব।

দুটি সনেট

শামসুর রাহমান

গোষ্পদ এবং মন

এখানে সমুদ্র নেই, আছে শুধু অন্ধ এঁদো ডোবা,
উঁইঢিপি সগৌরবে রয় জুড়ে পর্বতের স্থান,
আর ক্ষিপ্ত বায়সের গণ্ডগোলে কোকিল থামিয়ে দেয় গান
অকস্মাৎ ; দূরে নষ্ট চাঁদ একমাত্র শোভা।
এবং জ্ঞানীর পাঠে মূর্খ ভাঁড় কুড়োয় বাহবা
প্রতিদিন দ্বিধাহীন ; নিমেষেই সাধের বাগান
ভ'রে ওঠে সকণ্টক ফণিমনসায়, শুধু অফুরান
দুঃস্বপ্নের প্রেত করে আনাগোনা ; চেয়ে থাকি, বোবা।

অর্থাৎ কিছুই নেই, র'য়ে গেছে একখানি মন—
যেখানে গহ্বর আর অতল সমুদ্র জেগে রয়
পাশাপাশি, হাঙরে-প্রবালে দ্বন্দ্বময়। কী ফসল
ফলবে সেখানে কল্পনার মন্বন্তরে ? সারাক্ষণ
জপেছি প্রথম পাঠে জীর্ণ টোলে—জেনো সুনিশ্চয়,
আত্মার মৃণালে জ্বলে জীবনের সুবর্ণ কমল।

তিনশো টাকার আমি

আখেরে হলাম এই ? আর দশজনের মতন
দৈনিক আপিশ করা, ইস্ত্রিকরা কামিজের তলে
তিনশো টাকার এই পোষমানা আমিকে কৌশলে
বারো মাস ঝড়ে জলে ব'য়ে চলা যখন-তখন ?

আষাঢ় ১৩৬৬

এই আমি ?   এবং প্রভুর রক্তনেত্র সারাক্ষণ
জেগে রয় ঘানিটানা জীবনের চৌহদ্দিতে ; ফলে
ঠাণ্ডা চোখে ঠুলি এঁটে দশটা-পাঁচের জাঁতাকলে
অস্তিত্বকে চেয়ে দেখি নিখুঁত গোলাম, নিশ্চেতন।

আমিও নিজেকে দেখি করেছি ঢালাই মাঝারির
স্পষ্ট ছাঁচে।   যদি না অকালে ফস্কে যায় কিস্তি বিনে,
জীবনবীমাই জানি হে পান্থপাদপ মরুপথে।
তাহ'লে আমিও শেষে এই ?   ছা-পোষা বিজয়ী বীর
টেরিকাটা ?   হরলিক্স মিল্ক আর হাক্সলির নয়া বই কিনে
সাধের মানবজন্ম ধন্য করি তবু কোনোমতে।

বর্ষ ২৩, সংখ্যা ৪

শিশিরকুমার, ভাদুড়ী

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

দীর্ঘ দুই বাহু মেলি' আর্তকণ্ঠে ডাক দিলে : সীতা, সীতা, সীতা—
পলাতকা গোধূলি-প্রিয়ারে,
বিরহের অস্তাচলে তীর্থযাত্রী চ'লে গেল ধরিত্রী-দুহিতা
অন্তহীন মৌন অন্ধকারে।
যে-কান্না কেঁদেছে যক্ষ কলকণ্ঠা শিপ্রা-রেবা-বেত্রবতী-তীরে
তারে তুমি দিয়াছ যে ভাষা,
নিখিলের সঙ্গীহীন যত দুঃখী খুঁজে ফেরে বৃথা প্রেয়সীরে
তব কণ্ঠে তাদের পিপাসা।
এ-বিশ্বের মর্মব্যথা উচ্ছ্বসিছে ওই তব উদার ক্রন্দনে,
ঘুচে গেছে কালের বন্ধন,
তারে ডাকো, ডাকো তারে—যে-প্রেয়সী যুগে-যুগে চঞ্চল চরণে
ফেলে যায় ব্যগ্র আলিঙ্গন।
বেদনার বেদমন্ত্রে বিরহের স্বর্গলোক করিলে সৃজন,
আদি নাই, নাহি তব সীমা,
তুমি শুধু নট নহ, তুমি কবি, চক্ষে তব প্রত্যূষ স্বপন,
চিত্তে তব ধ্যানীর মহিমা॥

প্রকাশকাল : ১৩৩২
দীনেশরঞ্জন দাশ-সম্পাদিত 'বিজলী' সাপ্তাহিকে
প্রথম প্রকাশিত

৫

শিশিরকুমার ভাদুড়ী

(১৮৮৯-১৯৫৯)

তিরিশ বছর, পঁয়ত্রিশ বছর আগে আমরা 'কল্লোলে'র দল এই কলকাতায় দাপাদাপি ক'রে বেড়াচ্ছিলাম। ছাপার অক্ষরে সবেমাত্র বেরিয়েছি আমরা—কেউ-কেউ কলেজের ছাত্র, কেউ বা অবজ্ঞাভরে কলেজ থেকে ফেরার, কেউ ভ্রাম্যমাণ, কেউ বিবাহিত। সারাক্ষণ আমরা উৎসাহে উদ্বেল হ'য়ে আছি, সেই উৎসাহের বিষয়গুলি বিচিত্র, পরিবর্তনশীল, অসংখ্য এবং অনেক সময়ই ঐকাহিক। তবু তারই মধ্যে কয়েকটি স্থায়ী বিষয় ছিলো না তা নয়: য়োরোপীয় মহাদেশে এমন কয়েকজন সাহিত্যিককে আমরা আবিষ্কার করেছি যাঁদের রচনার অনবরত পশ্চাদ্ধাবনে আমরা প্রতিশ্রুত, এবং মাতৃভাষায় যাঁরা নতুন লিখছেন তাঁদের দিকেও বিরামহীন আমাদের মনোযোগ। ঠিক সাহিত্য নয় অথচ সাহিত্যের সংলগ্ন, এমন কোনো-কোনো বিষয়েও আমরা উচ্ছ্বসিত ছিলুম: যেমন নজরুল ইসলামের কণ্ঠসংগীত ও শিশিরকুমার ভাদুড়ীর অভিনয়।

কিন্তু কলকাতার, সারা বাংলার, শিক্ষিত সমাজে কেউ কি ছিলেন যিনি শিশিরকুমারের অভিনয় বিষয়ে উচ্ছ্বসিত নন? মনীষীদের মধ্যে এমন কেউ, যাঁর অন্যতম গন্তব্য নয় নাট্যমন্দির? ইতিমধ্যেই, মাত্র কয়েকবছরের মঞ্চ-জীবনের পরে, শিশিরকুমার প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছেন, প্রায় একটি রূপকথায়; আমরা তাঁকে যখনই গল্পের মানুষের মতো দেখছি, যেন তিনি সমালোচনার ঊর্ধ্বে, সাংসারিক আইন-কানুনের পরপারে। পণ্ডিত ব'লে যশস্বী তিনি, আলাপশিল্পে সুদক্ষ ব'লে; আর তাঁর অভিনয়প্রতিভা এমন স্পষ্ট, প্রোজ্জ্বল ও তর্কাতীত যে তাকে অভিনন্দন জানাবার জন্য অচিন্ত্যকুমারকে কবিতা লিখতে হ'লো। তাঁর কণ্ঠের 'সীতা' ডাক শুনে পুলকবেদনায় আপ্লুত হ'লো কলকাতা।

যেমন তিনি অভিনয়ে অনন্য, তেমনি তাঁর আশ্চর্য ক্ষমতা অভিনেতা সৃষ্টি ক'রে নেবার। তাঁকে কেন্দ্র ক'রে আর যাঁরা বিকশিত হলেন: যোগেশচন্দ্র

চৌধুরী, শৈলেন চৌধুরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, শ্রীমতী প্রভা, শ্রীমতী চারুশীলা, শ্রীমতী কঙ্কাবতী—এই সব মৃত মানুষের নাম, আজকের তরুণদের কাছে যার কোনো অর্থ নেই আর, সেই সব নাম কৃতজ্ঞ বেদনায় স্মরণ করা আমাদেরই কর্তব্য, আমরা যারা সেই সময়ে তরুণ ছিলাম। এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন রঙ্গমঞ্চে নতুন, কিন্তু শিশিরকুমারের এক-একটি প্রয়োজনায় প্রথম থেকে শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত কোথাও ছিলো না আড়ষ্টতা বা ছন্দপতন; আদ্যন্ত ছিলো এক সুরে বাঁধা, একই সামঞ্জস্যের অন্তর্ভূত, এক পরিকল্পনার অনুগামী। 'সীতা', 'আলমগীর', 'ষোড়শী'—এই তিনটি নাটক অভিনীত হবার পরেই এই সত্যটি অনুভূত হ'লো যে নাট্যমন্দির একটি রঙ্গমঞ্চমাত্র নয়, নয় কোনো প্রমোদভবন যা থেকে বেরিয়ে এলে তার কথা আর বেশিক্ষণ মনে রাখতে হয় না; তা আমাদের জীবনের মধ্যে স্থান ক'রে নিয়েছে, হ'য়ে উঠেছে এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যার সঙ্গে সংযোগ রেখে চলা বুদ্ধিজীবী প্রতি বাঙালির অবশ্যকৃত্য।

অথচ নাট্যমন্দির টিকলো না। কেন টিকলো না তা নিয়ে ঐতিহাসিকেরা আলোচনা করবেন, আমরা এর পরে তাঁকে দেখতে পাচ্ছি রংমহলে: 'বিরাজ-বৌ', 'রমা' ('পল্লীসমাজ') ও 'বিজয়া'র ('দত্তা') অভিনয়ে। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে যেন এক রহস্যময় আত্মিক যোগ আছে তাঁর; কী জীবানন্দ, কী রমেশ, কী বিরাজের স্বামী—প্রত্যেকটি চরিত্রকে তিনি যেন ঠিক সেইভাবেই মূর্ত ও সজীব ক'রে তোলেন, যে-ভাবে বাংলাদেশের পাঠকরা তাদের বহুকাল ধ'রে কল্পনা ক'রে এসেছে। শুধু 'বিজয়া'তে তাঁর রাসবিহারী আমাদের ম্লান ক'রে দিলে; আমরা বইতে যার কথা প'ড়েছিলাম সে-ব্যক্তি এক গৃধ্নু, কপট ও চক্রান্তকারী ব্রাহ্ম, আর রঙ্গমঞ্চে যাকে দেখলাম সে এক প্রহসনের স্থূল বিদূষক।

বলতে ইচ্ছে করে, শিশিরকুমারের স্বাভাবিক উন্মুখতা ছিলো বীরত্ব ও কারুণ্যের দিকে; যা আবেগে আর্দ্র বা বীর্যে উদ্ধত তার বাইরে তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য ছিলো না। তাঁকে কল্পনা করা যেতো ম্যাকবেথ অথবা ওথেলোর ভূমিকায়, কিন্তু ইয়াগো অথবা শাইলকের নয়। হাস্যরসও যে তাঁর অধিকারভুক্ত নয়,

এ-কথা বুঝেছিলাম তাঁর 'শেষ রক্ষা' দেখে। পুরোনো স্টার থিয়েটারের প্রধান কৃতি 'চিরকুমার সভা'র যখন গৌরবের চরম ক্ষণ, তখন তার প্রতিযোগী-রূপে শিশিরকুমার 'শেষ রক্ষা' অবতীর্ণ করলেন। কিন্তু দর্শকদের উপর তাঁর ব্যক্তিগত সম্মোহনও এ-নাটকটিকে ধ'রে রাখতে পারলে না; স্পষ্ট বোঝা গেলো যে তিনি চন্দ্রবাবু নন।

তবু—কী আশ্চর্য—এই শিশিরকুমারই 'সধবার একাদশী'তে এক তুলনাহীন সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ সময়ে এই নাটকটি দেখার সুযোগ ঘটেনি আমার; আমি দেখেছিলাম শ্রীরঙ্গমে, তাঁর অপরাহ্নকালে; কিন্তু আমার সৌভাগ্যবশত যোগেশ চৌধুরী, শৈলেন চৌধুরী ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, এই তিন জনেই জীবিত ছিলেন তখনও, এবং এঁদের প্রণীত ডেপুটি, অটল ও বাঙালটিকে আমার মনে হয় না আমি কখনো ভুলতে পারবো। যদিও লোকপ্রিয়তায় 'সীতা' সর্বাগ্রগণ্য, তবু শিশিরকুমারের সৃষ্টির তালিকায় 'সধবার একাদশী'কে আমি প্রথমে স্থান দিতে চাই; অমন একটি সর্বাঙ্গসুন্দর রূপকর্ম তিনিও আর পরিবেশন করেননি।

আরো আশ্চর্য এই যে নিমচাঁদের ভূমিকায় যিনি অপ্রতিরোধ্য, সেই তিনি মধুসূদনকে রূপ দিতে গিয়ে ব্যর্থ হলেন। যেমন 'যোগাযোগে'র মধুসূদন, তেমনি কবি মধুসূদনকেও তাঁর আকারে আমরা যেন চিনতেই পারলাম না; বিশ্বাস করা দুরূহ থেকে দুরূহতর হচ্ছিলো যে ইনিই কুমুদিনীর স্বামী বা মেঘনাদ-বধ কাব্যের প্রণেতা। তার উপর এই নাটক দুটির বিন্যাস ছিলো অত্যন্ত শিথিল, বিদ্যাসাগর-ভূমিকায় শৈলেন চৌধুরী ছাড়া পরিপোষক অভিনেতারা ছিলেন দুর্বল, আর অভিনেত্রীরা শোচনীয়;—সব মিলিয়ে এ-দুটি যেন প্রমাণ ক'রে দিয়েছিলো যে শিশিরকুমারের স্রোত এবার শুকিয়ে এলো। আমরা, যারা তাঁকে দীর্ঘকাল ধ'রে ভালোবেসেছি, আমরা সেদিন গভীরভাবে ব্যথিত হয়েছিলাম।

ইতিহাসরচনায় এখনও অভ্যস্ত হইনি আমরা; শিশিরকুমারের নটজীবনের কতটুকু চিহ্ন আজ খুঁজে পাওয়া যাবে জানি না। সমকালীন তথ্য, আলোচনা,

ছবি, পত্রিকাদির কর্তিকা—সব একত্র পাওয়া গেলে তাঁর কীর্তিশালা পুনরায় নির্মিত হ'তে পারে; আমাদের উত্তরপুরুষের অজানা থাকে না প্রথম-বিশ-শতকের বাঙালি জীবনে শিশিরকুমারের অবদান কত বিপুল। কিন্তু আমাদের দেশে সে-রকম সম্ভাবনা ক্ষীণ ব'লেই ধ'রে নিচ্ছি; আজকের দিনে যারা বৃদ্ধ বা প্রৌঢ় তাদেরই স্মৃতিতে তিনি জীবিত থাকবেন যতদিন-না কালপ্রবাহে তারাও একে-একে মিলিয়ে যায়। তাই আজই, এই মুহূর্তেই, আমরা এই কথা লিখে রাখতে চাই যে আমাদের কাছে তিনি ছিলেন প্রিয়তমদের অন্যতম, যে-আনন্দ তাঁর কাছে পেয়েছি তা রত্নের মতো আমাদের মনে গ্রথিত হ'য়ে আছে, এবং তা আছে ব'লেই, আমরা ঈর্ষা করি না আমাদের সন্তানদের, যারা বাংলা রঙ্গমঞ্চ থেকে নতুনতর সম্পদ আহরণ করছে ব'লে শুনতে পাই।

('গল্প-ভারতী'র সৌজন্যে)

বু. ব.

পরপৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় বিজ্ঞপ্তি দেখুন

গ্রাহকদের প্রতি নিবেদন

'কবিতা'র এই আষাঢ় সংখ্যার সঙ্গে আপনার ত্রয়োবিংশ বর্ষের চাঁদা নিঃশেষিত হ'লো। চতুর্বিংশ বর্ষের প্রথম সংখ্যা (আশ্বিন, ১৩৬৩) আগামী সেপ্টেম্বর মাসের শেষ ভাগে প্রকাশিত হবে। আমাদের বিশেষ অনুরোধ এই, ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে আপনারা নতুন বছরের চাঁদা (চার টাকা, রেজিষ্টার্ড ডাকে ছয় টাকা) মনি-অর্ডারযোগে অনুগ্রহ ক'রে পাঠিয়ে দেবেন। যাঁরা গ্রাহক থাকতে আর ইচ্ছুক নন, তাঁদের নিষেধাজ্ঞাও ঐ তারিখের মধ্যে পৌঁছনো দরকার। চাঁদা বা নিষেধাজ্ঞা যাঁরা পাঠাবেন না তাঁদের প্রত্যেকের কাছেই আশ্বিন সংখ্যাটি বার্ষিক মূল্যের ভি. পি. ডাকে আমরা পাঠিয়ে দেবো; মাশুলসমেত খরচ পড়বে পাঁচ টাকা, যাঁরা রেজিষ্টার্ড ডাকে পত্রিকা নেন তাঁদের পক্ষে সাত টাকা। ভি. পি. ডাক ব্যবহার করতে হ'লে আপনাদের ব্যয় ও আমাদের পরিশ্রম অনেকটা বেড়ে যায়, উপরন্তু ভি. পি. ফেরৎ এলে আমাদের যা আর্থিক ক্ষতি ঘটে তা তুচ্ছ নয়; অতএব পুনশ্চ অনুরোধ জানাই যে কোনো কারণে চাঁদা যদি যথাসময়ে পাঠাতে না পারেন, অন্ততপক্ষে ভি. পি. প্যাকেটটি ফেরৎ দেবেন না। মনি-অর্ডারে চাঁদা পাঠাবার সময় নিম্নোক্ত নিয়মগুলি অনুগ্রহ ক'রে মনে রাখবেন:

(১) কূপনে নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর স্পষ্টভাবে উল্লেখ্য।

(২) নতুন গ্রাহকেরা "নতুন গ্রাহক" কথাটি কূপনে লিখে দেবেন।

(৩) যদি ইতিমধ্যে ঠিকানার বদল হ'য়ে থাকে, নতুন ঠিকানাটি কূপনে বা স্বতন্ত্র চিঠিতে লিখে জানাবেন। পুজোর ছুটিতে অল্প দিনের জন্য হ'লে স্থানীয় ডাকঘরে ব্যবস্থা করাই বাঞ্ছনীয়।

নমস্কারান্তে,

বুদ্ধদেব বসু
সম্পাদক, 'কবিতা'
কবিতাভবন
২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৯

কবিতাভবন, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৯ থেকে প্রকাশিত ও ১৪১ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-১৩, মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস প্রাইভেট লিমিটেড-এ মুদ্রিত।
সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রক: বুদ্ধদেব বসু

KAVITA

(*Poetry*)

Vol. 23, No. 4

Serial No. 98

Yearly Rs. 4/-, or 6s. 6d. or $ 1. 50

Rupee one per copy

এক টাকা

Published quarterly at Kavitabhavan, 202 Rashbehari Avenue, Calcutta 29, India

Editor & Publisher : BUDDHADEVA BOSE

স্বাস্থ্যসম্মত ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত

লিলি বার্লি মিলস্ প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৪

কবিতা

বর্ষ-২৩

আশ্বিন-আষাঢ়

১৩৬৫-৬৬

প্রতিভা বসু